ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান প্রকাশিত
ব্যাঙাচি
নবম সংখ্যা
জানুয়ারি ২০২১। পৌষ-মাঘ ১৪২৭
বাংলার জীবজগৎ

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান

বাঁচতে হলে ভাবতে হবে

জানুয়ারি ২০২৬, পৌষ-মাঘ ১৪২৭

দ্বিতীয় বর্ষ • সংখ্যা ০৯

প্রকাশক: নাঈম হোসেন ফারুকী, সমুদ্র জিত সাহা
তারিখ: ১৮/৫/২৬
টিম ব্যাঙাচি, ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান কর্তৃক

ফেইসবুক গ্রুপে জয়েন করতে লগইন করুন:
https://www.facebook.com/groups/bcb.science/
ইমেইল: info@bangachi.com
ওয়েব: https://bangachi.com
ফেইসবুক: https://facebook.com/bcb.bangachi
ব্যাঙাচি ডাউনলোড: https://download.bangachi.com

আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছেই বিজ্ঞান আর দেশের জীববৈচিত্র্য দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। টিভিতে সুন্দর সুন্দর সব ডকুমেন্টারিতে দেখতে পাই আফ্রিকার ঘাসভূমি, অ্যামাজন জঙ্গল বা অ্যান্টার্কটিকার বরফ। এসবের ঘোরে নিজের আশেপাশে যে কী চমৎকার জীববৈচিত্র্য আছে তা আমাদের চোখেও পড়ে না। কেনই বা পড়বে? ছোটো থেকেই তো সব দেখছি, নতুন কী আছে?

এমন ধারণা কমবেশি সবারই আছে, কিন্তু যখনই আপনি দেশের জীববৈচিত্র্য নিয়ে জানা শুরু করবেন এই ধারণা সম্পূর্ণ পালটে যাবে। বুঝতে পারবেন দেশের জীববৈচিত্র্য কতটা চমৎকার। আপনার দেশের জীবেদের প্রতি মানসিকতা পালটানোর প্রয়াস নিয়েই এবারের সংখ্যা বাংলার জীবজগৎ।

সাথে ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞানের ২ বছর এবং ব্যাঙাচির ৬ বছর পূর্তিতে আমাদের পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।

সমুদ্র জিত সাহা

সম্পাদকীয়

"সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ", এই ধরনের লাইনগুলো বোধহয় সবারই হাজারবার শোনা হয়ে আছে। এই সম্যক স্বীকার্য টাইপ লাইনগুলোর পেছনেও যে গূঢ় অর্থ লুকিয়ে আছে সে বিষয়ে খুব কম সময়ই আমাদের ভাবা হয়। যান্ত্রিকতা আর স্মার্টফোনের বর্ণিল জগতে সাদামাটে প্রকৃতি কেন জানি আমাদের আকৃষ্ট করতে পারে না। নিসর্গের সাথে তার মাঝে বেঁচে থাকা হাজারো অপূর্ব জীবেরাও একইসাথে ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়।

আমাদের এই ছোট্ট সবুজ দেশেও একসময় ছিল (এখনও কোথাও আছে হয়তো) নীলগাই, নীল রঙের এই অপরূপ সুন্দর অ্যান্টিলোপের থেকে চোখ ফেরানো ভার ছিল। সবুজ ময়ূর তার মায়াময় বাঁধনে আটকে ফেলতো সবাইকে। এরকম আরো হাজারটা জীব আমাদেরই জন্য হারিয়েছে তাদের অস্তিত্ব, আজ তারা নেই আমাদের মাঝে। তারপরও যারা বেঁচে আছে তারাই বা কম কীসে? এখনও সুন্দরবনে হাঁটতে বের হলে শোনা যায় রাজকীয় বাঘের হুঙ্কার। সূর্যশিশিরের জাদুময়ী রূপে এখনও নেশা ধরে যাওয়ার জোগাড় হয়। রেমা কালেঙ্গাতে একবার তাবু খাটালে সবুজ মেশানো সোনালি আলোর জালে আটকাবে না সে সাধ্যি কার! তারই মাঝে আছে হাজারটা ফুল আর বনফুলের মিষ্টি সুবাস, পাখির কলকল ধ্বনি আর ব্যাঙের ছাতার ভালোবাসা। নিয়ম অনিয়মের বেড়াজালে এই বাংলাতেও আমরা এআই ল্যাবে আশার আলো দেখতে পাই।

ছোট্ট (!) এই ব্যাঙাচি আমাদের সবার ভালোবাসার ফসল। ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞানের সকলের আদরে আদরে আজ সে ৯ বছরে পড়ল, সেইসাথে বিসিবির বয়সও হলো ২। এই আনন্দের দিনে আলাদা করে কিছু বলা বা ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছে না, ধন্যবাদ দেওয়াটা উচিতও না হয়তোসবার জন্য শুধু একরাশ ভালোবাসা। বাংলার , জীবজগত ব্যাঙাচি আগমনকালে টিম ব্যাঙাচির অনেককেই প্রচুর প্যারা দিয়েছি, তাদেরকেও ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করতে চাই না, অনেকখানি কৃতজ্ঞতা জানাই শুধু।

অনেক কথা হলো, আপাতত প্রকৃতি কন্যা এই রূপসী বাংলার অনিন্দ্য সুন্দর জীবজগতে সবাইকে স্বাগত!

মুস্তফা কামাল জাবেদ
সম্পাদক, ব্যাঙাচি

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিমাসে আমরা ব্যাঙাচি আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারি।

সম্পাদক: মুস্তফা কামাল জাবেদ, জয়শ্রী রায় পূজা

সহ-সম্পাদক: রওনক শাহরিয়ার
লেআউট: রিয়াদ, রওনক শাহরিয়ার
প্রচ্ছদ: মেহরাব সাবিত সিদ্দিকী

সংগ্রহ, নির্বাচন ও তথ্য যাচাই:
প্রজেশ দত্ত
মুস্তফা কামাল জাবেদ
জয়শ্রী রায় পূজা

চিঠিপত্র সম্পাদনা: তানভীর রানা রাব্বি, জয়শ্রী রায় পূজা, রিজুফা জামান শোভা

প্রশ্নোত্তর সংকলন ও সম্পাদনা: নুপুর দেব

ফ্যাক্ট সংকলন: রওনক শাহরিয়ার, মুস্তফা কামাল জাবেদ

সূচীপত্র

আবার আসিব ফিরে

জীবনানন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক: আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে–

বাঘকথন

তাজউদ্দীন আহম্মদ

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

বাংলাদেশ।

শব্দটি শুনলেই যে কারো মনে ভেসে আসে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে থাকা ছোটো একখন্ড দেশ, যেখানে রয়েছে প্রকৃতির অপার লীলা। রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, সুন্দরবন। যে বনে আছে বাঘের গর্জন। বিশ্বের বুকে যা কিছুর জন্য পরিচিত এই দেশ, তার মধ্যে অন্যতম হলো সুন্দরবনের বাঘ। বল, ক্ষিপ্রতা ও শক্তিতে যার সমকক্ষ কেউ নেই।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ, আমাদের জাতীয় পশু। হারিয়ে যেতে বসেছে এদেশ থেকে। বিলুপ্তির পথে সুন্দরবনের রাজারা। এক সময় মধুপুর এবং গাজীপুরেও মিলত বাঘের দেখা। এখন শুধু সুন্দরবনে পাওয়া যায় বাঘ। কয়েক দশকের ব্যবধানে

সুন্দরবনেও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে বাঘের সংখ্যা। Internaional Union for Conservation of Nature (IUCN) রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে EN (Endangered) ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বিপদগ্রস্ত প্রাণীতে পরিণত হয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। অথচ এই বাঘই আমাদের বাংলার গর্ব, বাংলার অনন্য জীববৈচিত্র্যের অন্যতম মুখ্য পরিচায়ক।

শ্রেনিবিন্যাস-
জগৎ : Animalia
পর্ব : Chordata
শ্রেণি: Mammalia
বর্গ : Carnivora
উপবর্গ : Feliformia
পরিবার : Felidae
উপপরিবার : Felidae
গণ : Panthera
প্রজাতি : *P. tigris*
উপপ্রজাতি : *P. t. tigris*

রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের কাছে সুপরিচিত একটি প্রাণী। এদের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি জানি। বিশ্বে সাইবেরীয় বাঘের পরে বাঘের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপপ্রজাতি হলো বেঙ্গল টাইগার। উপমহাদেশের অনেক জায়গাতেই দেখা মেলে তাদের। সুন্দরবনের বেঙ্গল টাইগারকে আদর করে ডাকা হয় রয়েল বেঙ্গল টাইগার। রাজকীয় স্বভাব, রাজকীয় হালচাল। যারা রাজত্ব করে বেড়ায় লবণাক্ত বনভূমির মাটিতে।

ডোরাকাটা দাগের বেঙ্গল টাইগার মামাকে সহজেই চেনা যায়। এদের গায়ের রং হালকা হলুদ থেকে কমলা রঙের হয়, সারা গায়ে থাকে খয়েরি-কালো ডোরাকাটা দাগ। পেট সাদা এবং লেজে রয়েছে কালো আংটির মত গোল গোল দাগ। চোখে হিংস্র স্থির দৃষ্টি। মজার ব্যাপার হলো, প্রতিটি বাঘ তাদের ডোরায় অনন্য। দুটি বাঘের ডোরা একই হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। জেনেটিক বা অন্য কোনো কারণে কোনো বাঘের গায়ে ডোরা নাও থাকতে পারে। লেজসহ একটি পুরুষ বাঘের দৈর্ঘ্য ২৮০-৩১০ সে.মি. এবং স্ত্রী বাঘের দৈর্ঘ্য ২৪০-২৬৫ সে.মি. হয়ে থাকে। স্ত্রী বাঘের চেয়ে পুরুষ বাঘ আকারে বড়ো হয়।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার পুরো বিশ্বের বাঘসমুহের মধ্যে হিংস্রতায় অনন্য। এদের দাঁতের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ সেন্টিমিটারের মত। এর সাথে রয়েছে ধারালো নখরযুক্ত থাবা। শিকারকে কামড়ে বা খামচে ধরলে সহজে পালাবার জো নেই। এরা বেশ ভোজনরসিক। মোষ, বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ, বুনো শুকরসহ বড়ো আকারের প্রাণীরা তাদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

সুন্দরবনের রাজাদের উপযুক্ত পরিচয় মেলে শিকারের সময়। তারা বেশ কৌশলী। ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকে এবং সুযোগ বুঝে খপ করে শিকার ধরে ফেলে। শক্তিশালী থাবার চাপে শিকারের হাড়গোড় পিস্ট করে দেয়, ঘাড়ে বসায় মরণঘাতি কামড়। সহজে পালাতে পারে না শিকার। সাধারণত একা একাই শিকার ধরে এবং একাই সাবাড় করে দেয়। শিকার ধরার পর টেনে ডেরায় নিয়ে গিয়ে আয়েশ করে সারে ভোজন পর্ব। এরা খুব ভালো সাতারু। অনেক সময় শিকারকে নিয়ে নদীও পাড়ি দেয় তারা। খাবারের অভাবে লোকালয়েও আক্রমণ করতে দেখা যায় তাদের।

রয়েল বেঙ্গল টাইগারের স্বভাব-চরিত্র খুবই ভয়ানক। অন্য প্রাণীদের প্রতি একেবারেই বন্ধুত্বসুলভ আচরণ প্রদর্শন করে না তারা। একাকী থাকতে পছন্দ করে। গাছগাছালি মুড়িয়ে নিজের এলাকা চিহ্নিত করে রাখে। অন্য বাঘেরা সেই চিহ্ন দেখে সাবধানে চলে। কারো সীমানা মাড়ালেই লেগে যায় তুমুল যুদ্ধ।

এক সময় একাকী বাঘের জীবনে সঙ্গী হয়ে আসে বাঘিনী। প্রজননকালে সাধারণত একসাথে থাকে তারা। বাঘিনী সাধারণত ২-৪ টি শাবকের জন্ম দেয়। ততদিনে পুরুষ বাঘ আবার আলাদা হয়ে যায়। জন্ম নেয়া শাবকের প্রায় অর্ধেকই কোনো না কোনো কারণে মারা যায়। শাবক জন্ম নেয় অন্ধ হয়ে। ১০ দিনের মাথায়

চোখ ফোটে তাদের। সাধারণত ছয় মাস পর্যন্ত দুগ্ধপান করার পর মায়ের কাছে শিকারী জীবনের হাতেখড়ি ঘটে শাবকের। দু বছর পর্যন্ত সাধারণত মায়ের সাথে থাকে, এর মধ্যেই শিকার করা শিখে যায়। এরপর আবার শুরু হয় একাকী জীবন। এভাবেই চলতে থাকে বাঘের জীবনচক্র।

আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। অনেক।

ঐতিহ্যগত বস্তুর সাথে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাঘ। ক্রীড়া দলগুলোকেও ডাকা হয় বাঘের নামে।

বাঘ যেন সাহস আর উদ্যমের প্রতীক। বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী সম্পদ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক দশকে বিপুল হারে কমে এসেছে বাঘের সংখ্যা। চোরা শিকারীদের দাপটে বাঘের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে। বাঘের চামড়া, দাঁত ইত্যাদি চড়া দামে বাজারে বিক্রি করা হয়। তাই শিকারীরা নিধন করছে বাঘ। বাঘের প্রধান খাদ্য হরিণকেও নির্বিচারে শিকারীদের কবলে পড়তে হচ্ছে। ফলে দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব এবং লোকালয়ে হানা দিচ্ছে বাঘ। মানুষের হাতে মারা পড়ছে। গত শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের ৯৭ শতাংশ বাঘ হারিয়ে গিয়েছে। বাকি বাঘগুলোও দ্রুতই হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আমাদের জাতীয় পশু, জাতির গৌরবের প্রতীককে এভাবে হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। বাঘকে রক্ষা করতে হবে আমাদের। রক্ষা করতে হবে সুন্দরবনের আসল সৌন্দর্য।

বাংলার সাহস আর উদ্যমের প্রতীক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের গর্জনে প্রকম্পিত হয়ে উঠুক সুন্দরবনের আকাশ-বাতাস। বেঁচে থাকুক সুন্দরবনের রাজারা

মেছোবাঘ/মেছোবিড়াল

বাঘের মাসি বিড়াল।
শান্ত, আদুরে আর কোমল হলেও তর্জন-গর্জনে মাঝেমধ্যেই মাসিত্বের জানান দেয়। বন্যবিড়ালরা এই কাজে বেশি পটু। বাঘের মতোই শিকার ধরে আহার করে তারা। মেছো বিড়াল যাদের মধ্যে একটি পরিচিত শিকারী। মাছ, হাঁস বা মুরগি শিকার করতে গিয়ে প্রায়ই মারা পড়ার খবর শোনা যায়। মানুষ বা বড়ো প্রাণীকে কখনো আক্রমণ করে না তারা, তবুও মানুষ তাদের ভয় পায়। তবে তাদের উপর হামলা করলে বা আটকে রাখলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ক্ষেপে গেলে মানুষকেও আক্রমণ করে তারা। গ্রামেগঞ্জে মেছো বিড়াল দেখতে পেলেই পিটিয়ে মারা হয়।

মেছো বিড়াল প্রতিনিয়ত বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে বর্তমানে দশ হাজারেরও কম মেছো বিড়াল রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে International Union for conservation of nature কর্তৃক এদেরকে Red list এ বিপন্ন প্রাণী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭৪ ও ২০১২ এর তফসিল ১ অনুযায়ী মেছো বিড়াল একটি সংরক্ষিত প্রাণী। ছোটোখাটো বাঘের মতো দেখতে বিড়াল পরিবারের এই সদস্যটি আমাদের দেশে বিলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে।

শ্রেণিবিন্যাস-
ইংরেজি নাম : Fishing cat.
বৈজ্ঞানিক নাম : *Prionailurus viverrinus.*
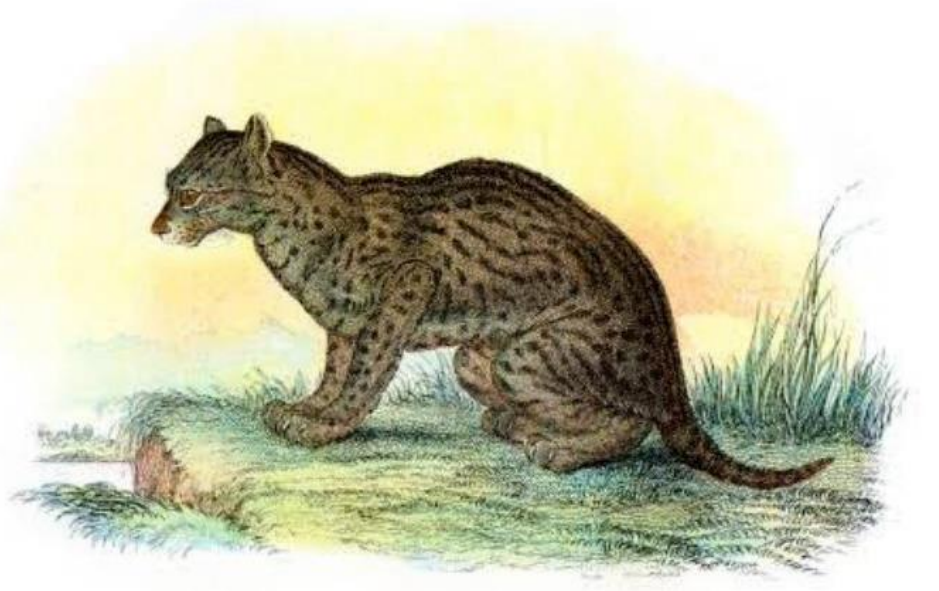
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Carnivora
Suborder: Feliformia
Family: Felidae
Subfamily: Felinae
Genus: Prionailurus
Species: P. viverrinus

দেখতে বিড়ালের মতো হলেও সাধারণ বিড়ালের সাথে মেছো বিড়ালের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। মাঝারি গড়নের বিড়ালগুলো সাধারণত পাশাপাশি দৈর্ঘ্যে ৫৭-৭৮ সে.মি. এবং উচ্চতায় ২০-৩০ সে.মি. এর মত হয়। তাদের পেছনে লম্বা একটি লেজ থাকে। ধূসর-বাদামি পশমে ঢাকা দেহে ছোপ ছোপ দাগে ভর্তি। মুখে লম্বা গোঁফ, স্থির বাদামি চোখ। দেখতে ছোটোখাট বাঘের মতোই মনে হয়। দূর থেকে দেখে চিতাবাঘের ছানা মনে হতে পারে।

অনেকে এদের বাঘের সাথে মিলিয়ে ফেলে। নামের পেছনে বাঘ শব্দটিও লাগানো হয়েছে, যা তাদের প্রতি ভীতি ও আক্রোশের একটি প্রধান কারণ। মানুষ তাদের সত্যিকার বনের বাঘ মনে করে। মেছোদের প্রধান খাদ্য মাছ। মাছ শিকারে তারা ভীষণ পটু। তীরে নিঃশব্দে হেঁটে বেড়ায়, কাছাকাছি কোনো মাছ এলে ক্ষিপ্রগতিতে ধরে ফেলে। এছাড়া ছোটো সরীসৃপ, পাখি বা হাঁস-মুরগিও এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে। একসময় বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে মেছো বিড়ালের দেখা পাওয়া যেত। হাঁওড়-বাওড়, বিল, নদীতীরে বিচরণ করত তারা। হাকালুকি হাওড়, টাঙ্গুয়ার হাওড়, বাইক্কা বিল সহ বিভিন্ন জলাভূমি অঞ্চলে প্রচুর মেছো বিড়ালের দেখা মিলত। এখনও মাঝেমধ্যে তাদের খবর পাওয়া যায়, তবে মৃত্যুর। বিপন্ন এই প্রাণীটিকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। দিন দিন তাদের সংখ্যা কমে আসছে। এভাবে নিধন চলতে থাকলে একসময় পুরোপুরি বিলুপ্ত প্রাণীর খাতায় নাম লেখাবে মেছো বিড়াল।

মেছোবিড়াল মেরে অনেক সময় মৃত বিড়ালের ছবি প্রকাশ করা হয়। পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠতে দেখা যায় হত্যাকারীদের। নিরীহ প্রাণীটিকে মারার মধ্যে কতটুকু গৌরব ও কৃতিত্ব জাহির হয় তা আমাদের জানা নেই, তবে তাতে যে আমরা ক্রমাগত জীববৈচিত্রের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসছি, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

চালতা

আবু রায়হান

আমি চলে যাব বলে
চালতা ফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?"

চালতা।
চালতার কথা মনে হলেই জিভে জল এসে যেতে পারে।
তাই শব্দটি সতর্কতার সাথে উচ্চারণ করবেন নয় কিন্তু স্ক্রিন লালায় ভিজে যেতে পারে।
চালতার আচার আমার অন্যতম প্রিয় আচার। আর এর ফুল, পাতাও বেশ প্রিয় আমার কাছে। বাড়িতে এ কারণে চালতার গাছ লাগিয়ে দিয়েছি তিন বছর আগে।
এটা কিন্তু অপ্রকৃত ফল। ভেতরে মূল ফল থাকে।

আমরা জানি,
কোনো ফুলের শুধু গর্ভাশয় ফলে পরিণত হলে তাকে প্রকৃত ফল বলে, যেমন—আম, কাঁঠাল। আর গর্ভাশয় ছাড়া ফুলের অন্যান্য অংশ পুষ্ট হয়ে যখন ফলে পরিণত হয়, তখন তাকে অপ্রকৃত ফল বলে।

চালতা সে হিসেবে একটি অপ্রকৃত ফল। প্রকৃতপক্ষে ফল বলতে এর পুষ্ট মাংসল অংশটুকু খাই আমরা। মাংসল বাহ্যিক পাপড়ির (অনেকেই বৃতি বলে) আড়ালে প্রকৃত ফল লুকিয়ে থাকে।
ফল বাঁকানো নলের মতো, ভিতরে চটচটে আঠার মধ্যে বীজ প্রোথিত থাকে।
চালতা গাছের সবচেয়ে সুন্দর অংশ হলো এর ফুল।
ফুল বেশ বড়ো ও সুগন্ধযুক্ত হয়।
ফুলে পাঁচটি মোটা বাহ্যিক পাপড়ি (অনেকের মতে বৃতি) বেষ্টিত কেন্দ্রে প্রচুর হলুদ পুংকেশর (stamen) থাকে এবং তার অনেকগুলো পাতলা পাপড়ি থাকে।
বাহ্যিক মোটা পাপড়িগুলো সেসব ভেতরের ছোটো ছোটো পাপড়িকে আঁকড়ে ঘিরে রাখে। বছরের মে-জুন মাসে এর ফুল ফোটার মৌসুম।
আচার ছাড়াও ডালের সাথেও চালতা রান্না করা হয়। পাঁকা ফল লবণ-মরিচ দিয়েও খাওয়া যায়।
বৈজ্ঞানিক নাম : *Dillenia indica*
ইংরেজি নাম : Elephant Apple
এটি বনে হাতি, বানর, হরিণের খাদ্য উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফিরিঙ্গি লতা

সায়্যিদা মুবাশ্বিরা

আমি আগে প্রচুর খেলাধুলা করতাম। প্রচুর বলতে প্রচুরই। কোনোদিন বিকালে না খেললে দিনটাই অপূর্ণ মনে হতো। তো খেলার মধ্যে নরমালি অনেকবার পড়ে যেতাম, ব্যাথা পেতাম, হাত, পা, হাটুর চামড়াও অনেক সময় ছিলে যেত।

কিন্তু যতই চামড়া উঠে যাক খেলা বন্ধ হতো না। নিজেরা নিজেরাই ডাক্তারি করতাম। ভাবছেন তো কীভাবে? যে লতার ছবি দেখতে পাচ্ছেন সেটা দিয়ে। কী নাম এই লতার?

এর নাম হচ্ছে জার্মানি লতা/বিকাশ লতা/আসাম লতা/ফিরিঙ্গি লতা (আরো অনেক নাম আছে) । তবে আমাদের দেশে বেশির ভাগ জায়গায় ডাকা হয় রিফুজি লতা বা লিপুজি লতা নামে।

বনে-জঙ্গলে, ঝোপ-ঝাড়ে সহজেই এই লতা খুঁজে পাওয়া যায়।

এর সাধারণ ইংরেজি নাম:
Climbing Hempweed, Climbing Hempvine, American Rope etc
বৈজ্ঞানিক নাম:*Mikania micrantha*
রাজ্য:Plantea
বর্গ:Asterales
পরিবার:Astareceae
গণ:Mikania

মিকানিয়া গণভুক্ত প্রায় ৪৫০ প্রজাতির গাছ আছে। বাংলাদেশে সাধারণত বেশির ভাগ দেখা যায় *Mikania kicrantha* এবং *Mikania scandens* এই দুটো প্রজাতি।

এই লতার আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকায়। সাধারণত গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলোতে এরা বেশি জন্মায়।

জার্মানি লতা দিনে ৮০-৯০ মি.লি.পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দ্রুত বৃদ্ধি পায় বলে একে ইংরেজিতে 'Mile a minute' নামে ডাকা হয়।
এক ঋতুতেই এই গাছ ২০-৪০ হাজার বীজ উৎপাদন করতে পারে।
আপনারা কী ভাবছেন?

এত কিছু বললাম কিন্তু এর গুণাগুণ ফলাও করে লিখলাম না কেন? তেমন কোনো গুণাগুণ কি নেই? চলুন জেনে নেই এই সুন্দর লতাটার কিছু গুণাগুণ...

- শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে জার্মানি লতার রস লাগিয়ে নিন। প্রায় সাথে সাথে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।
- কিডনি কিংবা পাকস্থলীতে পাথর হলে দুই থেকে তিনটি জার্মানি লতার পাতা চিবিয়ে খেয়ে নিন (ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে)।
- প্রতিদিন খালি পেটে চার চা-চামচ জার্মানি লতার রস এবং এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। এতে রক্ত দূষণ ভালো হয়।
- শীতকালে হাতের চামড়া উঠে খসখসে হয়ে গেলে লাগাতে পারেন জার্মানি লতা। এতে ভালো উপকার হয়।

শ্মশানপুষ্প

নাঈম হোসেন ফারুকী

পূর্বকথা

আমি ডাক্তার কামরুজ্জামান। নিউরোলজিস্ট, ভ্রমণপ্রিয়, অ্যাডভেঞ্চারার। বয়স ৪২।
আমার স্বাস্থ্য তরতজা, দেহ সুঠাম। মাথার চুল পাকতে আরও বহু দেরী আছে।
আমাকে দেখে কেউ বলবে না যে আমার মৃত্যুর সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু আমি জানি, আমার হাতে আছে আর বড়োজোর এক সপ্তাহ।
আমার সামনে একটা ম্যাপে একটা বড়ো লাল ক্রস চিহ্ন দেওয়া আছে। প্রথমে ভেবেছিলাম এ জায়গার কথা সবাইকে জানিয়ে দিয়ে যাবো।
আরও অনেক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।
সবার সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

পরে বুঝলাম, যে শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা লড়ার কথা ভাবছি তাকে হারানো অসম্ভব।
বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় তার থেকে দূরে থাকা।
আমি যাওয়ার আগে এই ম্যাপ পুড়িয়ে দিয়ে যাবো। আমি চাই না রহস্যের সন্ধানে হোক, নেহাত কৌতুহলেও হোক এ জায়গায় আর কেউ পা রাখুক।
এই কাহিনীর শুরু অন্তত ছ'মাস আগে।

পর্ব ১

১

অসিত বাবুর বয়স হয়েছিল ৭২। জ্বর ছিল, কাশিও ছিল। আগে থেকেই হাঁপানির ভাব ছিল, শেষ দিকে তা বেড়ে গিয়েছিল অনেক।

অসিত বাবু যে রাতে দেহ রাখলেন সে রাতে ঝলমলে পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় থৈ থৈ করছে চারপাশ। রাত বারোটার বেশি হবে না, তবু চারদিকে সুনসান নিরবতা। দেশে নতুন করোনাভাইরাস ছড়িয়েছে, ভয়ে মাস্ক পরে ঘুরছে সবাই। সন্ধ্যার পর মেলামেশা একদম নেই।

হসপিটালে সময়মতো নিতে পারলে হয়তো অসিত বাবুকে বাঁচানো যেত, কিন্তু কোনো অ্যাম্বুলেন্স আসতে রাজি হয়নি। এমনকি একটা ভ্যান গাড়িও না। করোনার লক্ষণ নিয়ে মরেছেন শুনে এবার লাশ বইতেও কেউ রাজি হলো না। পুরনো খাটিয়াটায় বাবাকে শুইয়ে অগত্যা একা একাই রওনা হলেন অসিত বাবুর ছেলে সুশীল ধর। সাথে তার দুই চাচাতো ভাই মিথুন আর কমল।

বাইরে পূর্ণিমা রাত, শেয়াল ডাকছে বারবার। দোকানপাট সব বন্ধ। এমনিতেই রাস্তাঘাট সব দেখা যায়, টর্চের আলো লাগে না। সুশীলের মনে হচ্ছিল জোছনার নদীতে ভাসতে ভাসতে বাবাকে নিজ হাতে স্বর্গে পৌঁছে দিয়ে আসছে সে। এক এক করে মনে পড়ছিল হাজারো ভালোমন্দ স্মৃতি - বাবার অত্যাচার, পরীক্ষায় ফেল করায় গল্পের বই ছিড়ে ফেলা, বেতের বাড়ি খেয়ে জ্বর চলে আসা - ভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার আনন্দে সেই একই বাবার হাউমাউ করে কেঁদে ফেলা...

সুশীলের ঘোর ভাঙল চৌকিদারের হাঁকে।
কে যায় এত রাতে?
অসিত ধরের ছেলে সুশীল ধর।
কই যান? মরা পুড়াতে?

জ্বী, বাবা দেহ রেখেছেন।
উনার করোনা ছিল না?
নাহ, মোটেও না। আগে থেকেই হাঁপানি ছিল, তাতেই মারা গেছেন।
গ্রামের শ্মশানে নিতে পারবেন না। চেয়ারম্যানের নিষেধ আছে।

সুশীল অনেক আপত্তি করল। লাভ হলো না। আশেপাশে চার পাঁচজন লোক জড় করে তাদের ঠেকিয়ে দিল চৌকিদার।
সুশীলরা আশেপাশের আরও কয়েকটা শ্মশানে ঘুরল। সব গুলোতেই একই অবস্থা। কোথাও লাশ পুড়াতে দিল না।

এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে রেমা কালেঙ্গার জঙ্গলের ভেতর পুরনো ভাঙা একটা শ্মশান আছে, গত একশো বছরে সেখানে কেউ লাশ নিয়ে আসেনি। আশেপাশে কোনো জনবসতি নেই, ঠেকানোরও কেউ নেই। বাবার লাশ নিয়ে অসিতরা সেদিকেই চলল।

২

কমল মশাল জ্বালল, রাতের জঙ্গলে শুধু টর্চে কাজ দেবে না। আশেপাশের নিস্তব্ধতা আর নেই। বরং রাতের জঙ্গল এখন শব্দে মুখর। শেয়াল আর ব্যাঙের ডাক তো ছিলই, সাথে যোগ হয়েছে নানা রকম শব্দ। ক্রিক ক্রিক, চিক চিক, শোঁ শোঁ। বুনো শুয়োর দূরে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল - এদের দাঁত মারাত্মক।

হঠাৎ রক্ত হিম করে চিৎকার দিয়ে উঠল বহু দূরের কোনো অজানা জানোয়ার। অসিতরা কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল তাতে। তারপর মন্ত্র টন্ত্র পড়ে আবার হাঁটা ধরল।

ছোটো রাস্তাটার দুপাশে গাছ জড়াজড়ি করে আছে, চাঁদের আলো আগের মতো খুব একটা আসছে না। কেমন জানি গুমোট থমথমে একটা ভাব।

একটু পর তারা খেয়াল করল সব শব্দ কেমন জানি থেমে গেছে। গ্রামের রাস্তার মতো? না, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি চুপচাপ সব। পোকার ডাক থেমে গেছে। ঝিঁঝি আর ডাকছে না। ক্রিক ক্রিক ঘোঁত ঘোঁত সব বন্ধ। খালি অজানা কোন ফুলের মাতাল করা গন্ধ নাকে আসছে একটু একটু।

৩

একশো বছরের পুরনো শ্মশান। সামনে বেশ বড়ো একটা গেট, তাতে পুরনো মরচে পড়া তালা ঝুলছে। তাতে ঝুলছে বহুদিনের পুরনো সাইনবোর্ড -

ইং ১৯৩০, বাং ১৩৩৭।
আজি হইতে অত্র শ্মশানে শবদাহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
কেহ গেইট খুলিবেন না।
কেহ কোনো অবস্থাতেই শ্মশানে প্রবেশ করিবেন না।
আদেশক্রমে কর্তৃপক্ষ

গেট বন্ধ থাকলেও দেওয়ালে ফাঁটল ধরেছে, ভেঙে গেছে সেটা বহু জায়গায়। সুশীলরা আর দেরী না করে নিষিদ্ধ কাজটাই করলো। প্রবেশ করলো প্রাচীন শ্মশানে।

একশো বছরের পুরনো শ্মশান ঢেকে গেছে আগাছায় আর জঙ্গলে। জোছনা রাত, চাঁদের আলো সে জঙ্গলে থৈ থৈ করছে। তাতে ফটফট করে ফুটে আছে বড়ো বড়ো সাদা কোন অজানা ফুল। তার মাতাল করা গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা লাগছে।

নেই কোনো পুরোহিত, নেই কোনো সাহায্যকারী। ছোটোবেলায় মন্ত্র তন্ত্র যতদূর শিখেছিল - সেটাকে কাজে লাগিয়ে চিতা সাজাতে লেগে গেল তারা। একটু পর মাংস পোড়ার তীব্র গন্ধ আর অজানা ফুলের গন্ধ মিলে উৎকট বিভৎস একটা পরিবেশ তৈরি হলো পুরনো শ্মশানে।

পর্ব দুই

১

কদিন ধরেই শরীর কেমন জানি ভার ভার লাগছে মিথুনের। মাথা ঝিম ঝিম করছে। ঘুম ভালো হচ্ছে না। মাঝে মাঝে হুটহাট মাথা ব্যথা হচ্ছে খুব। আজ বিকালে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে আনল সে।

রাতে খুব অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল সে। মা দুর্গা রাতে স্বপ্নে দেখা দিলেন তাকে। অথবা, মা দুর্গাকে দেখল সে বিশেষ এক অবস্থায়, বিশেষ রূপে।

দুর্গা মহিষাসুরের সাথে লড়ছেন। কিছুতেই তাকে হারাতে পারছেন না। বারবার রূপ পরিবর্তন করছে সে। মা দুর্গা প্রচন্ড রেগে গেছেন। তার কপাল লাল হয়ে গেছে। হঠাৎ

কী জানি হলো - মিথুন ঠিক খেয়াল করতে পারল না - মা দুর্গার মাথা ফুড়ে বেরিয়ে এলেন কালি। যেন মায়ের সকল ক্রোধ, আক্রোশ পুঞ্জিভূত হয়ে জন্ম নিল শক্তির নতুন রূপ!

মিথুনের ঘুম ভাঙল। শরীর ঘামে ভিজে গেছে, মাথা ব্যথা করছে দপদপ করে। মনে হচ্ছে মাথা ফুড়ে বের হতে চাইছে কেউ।
একটা অ্যাসপিরিন মুখে দিয়ে মিথুন আবার ঘুমানোর জন্য রেডি হলো। কিন্তু পারল না। মাথার ভেতর একটা কন্ঠ তাকে বলে উঠল - চল।

পাঠক, খেয়াল রাখবেন - সে রাতে আসলে কী হয়েছিল আমার জানা নেই। এই ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী নেই, তাই অনেকখানি অনুমান করে নিতে হচ্ছে। মিথুন সুশীলকে যতটুকু বলতে পেরেছে সেটা বাদে পুরোটাই আমার অনুমান। কিন্তু আমার অনুমান সাধারণত খুব ভালো হয়, আমি মানুষকে পড়তে পারি ভালো। আর স্বপ্নের ব্যাপারটা? বাকি ঘটনা ঘটার আগে মিথুন সুশীলকে একটা ফোন দিতে পেরেছিল। কিন্তু সুশীল আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যায়।

যাহোক, মিথুনের পার্স্পেক্টিভে ফিরি।

২

মিথুন বিছানা থেকে উঠল। সে উঠতে বাধ্য।
সে রান্নাঘর থেকে পুরনো কেরোসিনের বোতল নিল। আর অনেকগুলো খড়ি একটা বস্তায় বেঁধে নিল। তারপর বের হলো ঘর থেকে।

আজ অমাবস্যা। নিশুতি রাত। মিথুন ঝোলা কাঁধে ঘর থেকে বের হলো। তার হাতে কোনো টর্চ নেই। রাস্তা হারানোর ভয়ও নেই তার। মাথার ভেতরের জিনিসটা গাইড করছে তাকে।
মিথুন মধুপুরের জঙ্গলে পা রাখল। ঘোঁত ঘোঁত ক্রিক ক্রিক বহু দূরে থাকল তার। মিথুন এবারও আলো জ্বালল না। সে জানে, বনের সব পশুপাখি এখন তাকে ভয় পায়।
মিথুন পুরনো শ্মশানে পৌঁছল। এক সাইডে এখনও ফুল হয়নি। সেখানে থামতে বলা হলো তাকে।

মিথুন থামল।
সবগুলো খড়ি জড়ো করে কেরোসিন ঢালল তাতে। তারপর নিজে যেয়ে সেখানে শুয়ে পড়ল।

এরপর আগুন ধরিয়ে দিল।
মিথুনের কাজ শেষ। তার শরীর অবশ করে দিল ওটা। মিথুন প্রচন্ড যন্ত্রনায় চিৎকার করে উঠল। কিন্তু এক চুল নড়তে পারল না।
ওটা আঁকড়ে ধরে থাকল তাকে। কোনোমতেই নড়তে দিল না।

৩

সুশীল আমার চেম্বারে আসল ডিসেম্বর মাসে। আমাদেরই গ্রামের ছেলে। কিছুদিন ধরেই মাথা খুব ব্যথা করছে তার। কিন্তু সে ব্যথায় না, ভয়ে নীল হয়ে আছে। যখন সে আমাকে পুরো ঘটনা খুলে বলে, আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছিল সে।

দুইমাস আগে মিথুন নিখোঁজ হয়। এরপর কমল। দুজনেরই মাথা ব্যথা ছিল। শরীর কাঁপত। দুজনেই হারিয়ে যাওয়ার আগে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। মিথুন ধার্মিক মানুষ, সে দেখে দেবী দুর্গাকে। কমল দেখে মার্ভেল কমিক্সের ভেনোম।

স্বপ্ন দেখার পর দুজনেই ঘর ছেড়ে বের হয়। কোথায় যায় কেউ দেখেনি। ইচ্ছা করেই এমন পথে গিয়েছে যাতে লোকজনের দেখা না মেলে। প্রয়োজনে পায়ের ছাপও মুছে ফেলে। এরপর থেকে তারা পুরোপুরি গায়েব।

সুশীলের গল্প কৌতুহলী করে তুলল আমাকে। ব্রেইনের সিটি স্ক্যান আর এম আর আই করতে দিলাম। এ ছাড়া বেশি কিছু করারও নেই।

৪

রেজাল্ট আসলো।
সুশীলের ব্রেইনে ক্যান্সার হয়েছে। ক্যান্সারটা এমনভাবে ছড়িয়েছে তার বাঁচার আশা নেই। সান্ত্বনা হিসাবে কিছু ঔষধ দিলাম তাকে। বাড়ি চলে যেতে বললাম।

সে সময় বাচ্চা-কাচ্চারও স্কুল ছুটি, কিছুদিনের জন্য এমনিতেই গ্রামে আসার প্ল্যান ছিল। এদিকে সুশীলের কেইসটাও ভাবিয়ে তুলেছিল খুব। আমি তার উপর নজর রাখা শুরু করলাম।

তারপর একদিন গভীর রাতে সুশীলের আকুতি ভরা কন্ঠে ফোন আসলো, ভয়ানক এক স্বপ্ন দেখেছে সে। তার মাথা ফুড়ে বের হচ্ছে কিলবিলে কোনো জীব। ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

বুঝলাম আর দেরি নেই। কাউকে কিছু বলার বা সাথে কিছু নেওয়ার সময় নেই। জলদি ছুটলাম সুশীলের পিছু পিছু।

৫

ঘুটঘুটে রাত, আগের মতোই সব নিস্তব্ধ। তার মধ্যে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে সুশীল - ভূতের মতোই নিস্তব্ধে।

কালেঙ্গার জঙ্গল অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। অদ্ভুত একটা গন্ধ থৈ থৈ করছে চারদিকে। তার মধ্যে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম এক অপার্থিব দৃশ্য। সুশীল চিতা সাজিয়ে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল।

বিশ্বাস করেন - সে মুহূর্তে আমি একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। সুশীলকে সাহায্য করার ইচ্ছা বা সাহস কোনোটাই আমার হয়নি। কেউ যেন জোর করে আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে বেঁধে রেখেছিল। আমি প্রায় অজ্ঞানের মতো পড়েছিলাম।
শেষ রাতে নড়ার শক্তি পাই। টর্চের আলো জ্বালি। অদ্ভুত ফুলগুলোকে দেখে কৌতুহল হয় আমার। কাছে যাই।
এগুলো ফুল না। ফুলের মতো গন্ধ আছে, কিন্তু ফুল না। মিমিক্রির চমৎকার উদাহরণ। কাছে গেলে বোঝা যায় কেমন থলথলে চেহারার জিনিস। কোনো ধরণের

ছত্রাক কি? আমার জানা নাই। কয়েকটা নমুনা সাথে নিয়ে রওনা দিলাম।
ঠিক কেন যেন মনে হলো, এ জায়গাটার কথা বেশি লোককে বলা ঠিক হবে না।

কিছুদিন পর আবার জায়গাটায় এসেছিলাম। বিকাল বেলা। যে জায়গাটায় সুশীল পুড়ে মরেছিল সেখানে ফুলের মতো জিনিসে ভরে গেছে। তার মাথা ফুড়ে গজিয়েছে অদ্ভুত কিছু জিনিস।

দূর থেকে দেখতে বেশ সুন্দর, কাছে গেলে বিভৎস।

শেষ পর্ব

জিনিসগুলো ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। এক ধরনের ফাঙ্গাস, করডিসেপ্সের কোন এক অজানা মিউটেশন। গহীন জঙ্গলে এরা পোকামাকড়দের আক্রমণ করে, দেহের কন্ট্রোল নেয়। তাকে নিয়ে যায় এমন জায়গায় যেখানে সে জন্মাতে পারে। এরপর তাদের শরীর মাথা ফুঁড়ে বের হয় নতুন ফ্রুটিং বডি।

করডিসেপ্সের জাতটা মানুষকে ধরার জন্য বিবর্তিত হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্কে বাসা বাঁধে এরা, তাকে কন্ট্রোল করে। এদের জন্মানোর জন্য আগুন খুব প্রয়োজন, রক্ত মাংসের ছাইকে এরা বড়ো ভালোবাসে।

ল্যাবে টেস্ট করতে দেওয়ার তিন মাসের মধ্যে ল্যাবের তিন জন অ্যাটেন্ড্যান্ট নিখোঁজ হয়। খেসারত কম দিতে হয়নি।

আমার ব্রেইন ক্যান্সার। হাতে একদম সময় নেই। যে-কোনোদিন ডাক পড়বে।

তার আগেই ফাঞ্জিসাইড সব জড়ো করে আমাকে যেতে হবে অভিশপ্ত শ্মশান পানে।

রামসার সাইট: ১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জৈবপরিবেশ রক্ষায় একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ‘কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস’ নামক এই চুক্তি জলীয় পরিবেশ রক্ষায় কাজ করে। বাংলাদেশে রামসার সাইট ৩টি। সুন্দরবন, টাঙ্গুয়ার হাওর আর হাকালুকি হাওর।

ম্যান্টিস: দেবতা না কি পোষ্য?

প্রান্ত দাস

আমিও জানি এটা বাংলার জীবজগত কন্টেস্ট। তাই মারভেলের ম্যান্টিস নিয়ে লেখার সুযোগ এখানে নেই। আমাদের আলোচ্য ম্যান্টিসেরা আমাদের দুনিয়ারই এলিয়েন (ভিনগ্রহীদের সাপেক্ষে)।

মারভেল ম্যান্টিসের মতো অন্য কারো মনের কথা জানার বা কন্ট্রোল করার মতো সুপারপাওয়ার আমাদের ম্যান্টিসের না থাকলেও সবার আগে উল্লেখযোগ্য কমন বিষয় হচ্ছে আমাদের ম্যান্টিসের মাথায়ও সুন্দর দুইটা অ্যান্টেনা আছে। আর কিউটনেসের দিক থেকে আমাদের ম্যান্টিসের শরীর একেকজনের কাছে একেকরকম মনে হলেও তিনকোনা মাথায় চেহারার দিক থেকে আমাদের ম্যান্টিস মারভেল ম্যান্টিসের চেয়ে কম কিছু না— সাতশো বিলিয়ন ভিন্ন রুচির কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই এমনটা মনে হবে না। মারভেল ম্যান্টিসের চোখ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন?

গোল চকচকে কালো দুটি চোখ! যেন পুঞ্জাক্ষী! পুঞ্জাক্ষী বা পুঞ্জীভূত অক্ষি জিনিসটা আসলে অনেকগুলো অক্ষির সমন্বয়ে গঠিত একটা চোখ। ইংরেজিতে বলে Compound Eye।

আমাদের ম্যান্টিসের সত্যি সত্যিই দশ হাজার ওমাটিডিয়াযুক্ত প্রশস্ত দুটি পুঞ্জাক্ষী আছে। সাথে অবশ্য তিনটা সাধারণ চোখও আছে এদের। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাঠকের মনে ধারণা জন্মে গেছে মারভেল ম্যান্টিসের দৃষ্টিনন্দিতরূপ বোধহয় আমাদের ম্যান্টিসের থেকেই অনুপ্রাণিত বা ইন্সপায়ার্ড হয়ে তৈরি। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে ছবিতে যে পোজে মারভেল ম্যান্টিসকে দেখা যাচ্ছে সেটাও আসলে আমাদের ম্যান্টিসের থেকেই অনুপ্রাণিত। ম্যান্টিসেরা তাদের সামনের লম্বা দুটি পা বিনয়ীর মতো প্রার্থনার রূপে সামনের দিকে এনে তুলে রাখে। তাই এদের প্রেয়িং ম্যান্টিসও (Praying Mantis) বলা হয়।

প্রেয়িং প্রসঙ্গে বলি, উদ্ভট শিরোনামটাতে ম্যান্টিসকে দেবতা বলার কারণ কী!

ম্যান্টিসের ১৩৫ মিলিয়ন বছর আগের ফসিল পাওয়া গেছে। বর্তমান সময়ে প্রেয়িং ম্যান্টিসের সামনের পা

দুটো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রোটোটাইপ রোবোটও তৈরি করা হয়েছে যাতে অনায়াসে হাঁটতে, উঁচু স্থানে আরোহণ করতে ও কোনো কিছু সহজে ধরতে পারে। এরা সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সাথে জড়িত। অনেক প্রাচীন সভ্যতাই ধরে নিয়েছিল ম্যান্টিসেরা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। এর কারণ অবশ্যই তাদের বিশেষ প্রার্থনার ন্যায় অঙ্গভঙ্গি। প্রাচীন গ্রিকরা ভাবত হারিয়ে যাওয়া পথিককে পথ দেখানোর মতো সুপার পাওয়ার আছে ম্যান্টিসের। (মারভেল ম্যান্টিস পিছিয়ে যাচ্ছে না তো?) আরো একধাপ এগিয়ে থেকে 'খোই' নামে আফ্রিকান সম্প্রদায় এদের 'খোইদের দেবতা' নামে ভূষিত করে তাদের আরাধ্যের আসনে বসিয়েছিল। খুবই মজার ব্যাপার হচ্ছে আফ্রিকানই আরেকটা সম্প্রদায় 'সান' ম্যান্টিসকে ভাবত 'কৌতুকের দেবতা' বা 'মজার দেবতা' যে আরো রূপ ধারণ করতে পারে যেমন সাপ, খরগোশ, শকুন প্রভৃতি। একটা জিনিস পরিষ্কার করে নিই, দেখতে অনেকটা ঘাসফড়িঙের মতো দেখালেও ঘাসফড়িং কিন্তু আর্থোপোডা বর্গের পোকা। ঘাসফড়িং তুলনামূলক মোটা হয়, পিছনের পা দুটি লম্বা হয় আর ম্যান্টিসের ক্ষেত্রে তা উলটা। ঘাসফড়িং নিরামিষভোজী। ঘাস-পাতা ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে কিন্তু আমাদের ম্যান্টিস বর্গের পোকারা অলস হলেও শিকারী মাংসাশী পোকা। অলস বলার কারণ হচ্ছে যতক্ষণ না খুব বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে ততক্ষণ এরা শিকার খুঁজতে বের হয় না। অলসতার ব্র্যান্ড এম্বাসেডররা স্থির হয়ে পাখা ছড়িয়ে (যাদের সেরকম পাখা আছে, সবার থাকে না) ছদ্মবেশে অপেক্ষা করে বসে থাকে কখন ভক্ত কাছে আসবে তাদের সেবার নিমিত্ত আর সামনের দুইটা লম্বা পা বাড়িয়ে দিয়ে গপ করে ধরে ফেলবে। এদের এক বিশেষত্ব হচ্ছে কিছু প্রজাতি ১৮০° পর্যন্ত ঘাড় ঘোরাতে পারে।

ছবিতে ম্যান্টিসের ছোটো সাইজ দেখে যারা ভাবছেন কী এমন শিকারী মাংসাশী পোকা! কী আর খাবে! খুবই ছোটো পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকবে হয়তো। তাদের বলি ছোটো প্রজাতির ম্যান্টিসেরা মাকড়সা, প্রজাপতি, ঝিঁঝিঁ পোকা ইত্যাদি ছোটো ছোটো পোকা খেয়ে বেঁচে থাকলেও বড়ো প্রজাতির ম্যান্টিসেরা গিরগিটি, পাখি, ছোটো মাছ, ছোটো ব্যাঙ পর্যন্ত খায়। হ্যাঁ, পনেরোটি গোত্রের প্রায় আড়াই হাজার প্রজাতির এই ম্যান্টিসেরা ১ ইঞ্চি থেকে ৭ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। এরা নিজেদের স্বাস্থের জন্য উপকারী নাকি ক্ষতিকর বিবেচনা না করেই যা ধরতে পারে তা-ই খাওয়ার স্বভাবে অনেক সময় এরা অসুস্থও হয়ে পড়ে। বড়ো
ম্যান্টিসেরা মাঝে মাঝে তাদেরই ভাই-বেরাদার ছোটো ম্যান্টিসদের খেয়ে ফেলে। স্বজাতি ভক্ষণ পোকামাকড়দের মধ্যে যে খুব একটা অস্বাভাবিক তা কিন্তু নয়।

খাদ্য তালিকায় স্বজাতি ভক্ষণের (ক্যানাবেলিজম) মতো আপাতদৃষ্টিতে নৃশংস এক আচরণ যেহেতু দেখলামই এই সুযোগে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এদের আরেকটা নৃশংস আচরণের উল্লেখ করি। সেক্সুয়াল ক্যানাবেলিজম। গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় নব্বই শতাংশ ম্যান্টিস এই যৌন নৃশংসয়তায় অংশ নেয়। তবে নৃশংসতার দৃষ্টান্ত বহন করে স্ত্রী ম্যান্টিসরাই। স্ত্রী ম্যান্টিসেরা যৌন মিলনের সময় পুরুষ ম্যান্টিসকে খেয়ে ফেলে। কেন? এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। যাহোক, এই প্রক্রিয়াটা শুরু হয় পুরুষ ম্যান্টিসের মাথা খাওয়ার মাধ্যমে। আর একারণে জীবন রক্ষার্থে
প্রথম মিলনের পরই প্রায় ৮৩% 'নিরীহ' পুরুষ ম্যান্টিস পালিয়ে আসে। এজন্য বাস্তুতন্ত্রে স্ত্রী ম্যান্টিসের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে সবসময়ই বেশি।

স্ত্রী ম্যান্টিসদের এই আচরণ জানার পর যারা 'বিসিবি চিরকুমার সংঘ BCS' — এ যোগদান করতে যাচ্ছেন তাদের সাবধান করে দিই চিরকুমার/কুমারীদের পোস্টে আপনার টাইমলাইন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে আর বিসিবির পোস্ট পাওয়া কমে গেলে এই লেখা, লেখক বা ম্যান্টিস কোনোভাবেই দ্বায়ী নয়। (জোক্স এপার্ট)

সবগুলো গোত্রের ম্যান্টিস অবশ্য আমাদের উপমহাদেশে নেই। তবে এরা গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশেই থাকে। বাংলায় সাধারণভাবেই অনেক প্রজাতির ম্যান্টিসের দেখা পাওয়া যায়। এরা শীতকালে ডিম পেড়েই মারা যায়, আর শক্ত খোলসে নিরাপদ থাকা ডিম বসন্তকালে ফোটে। এদের জীবনকালও প্রজাতিভেদে ভিন্ন। ছোটোরা ৪-৮ সপ্তাহ বাঁচে আবার বড়োরা ৪-৬ মাস। আবার এক বছর জীবনকালও অনেক প্রজাতির জন্য স্বাভাবিক। তবে চীনা ম্যান্টিসদের দেখা গেছে তুলনামূলকভাবে তাড়াতাড়ি বড়ো হতে এবং বেশি দিন বাঁচতে। এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে ম্যান্টিসের সর্বপ্রথম উল্লেখও চীনা অভিধানেই পাওয়া যায়!

চীনের কথা যখন এলোই তখন মার্শাল আর্টসের কথা না এসে পারে না, যেখানে চীনে দু-দুটি মার্শাল আর্ট ম্যান্টিসের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি! হ্যাঁ। কুংফুর নাম উঠলে দক্ষিণ চীনে উদ্ভাবিত 'এক পা সামনে এগিয়ে দিয়ে দুই হাত কনুই থেকে ভাজ করে সামনে আনা' যে সবচেয়ে চেনা-পরিচিত মডেলটাকে চোখের সামনে আমাদের মস্তিষ্ক এনে হাজির করে সেটা শিকারী ম্যান্টিসের থেকেই আসলে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে। ম্যান্টিসকে যথাযথ কপিরাইট দিয়ে এর নামকরণ করা হয়েছে 'সাউদার্ন প্রেয়িং ম্যান্টিস'। চীনেরই উত্তরাঞ্চলে আরেকটা মার্শাল আর্ট ম্যান্টিসের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি যার নামকরণও ম্যান্টিসের নামে 'নর্থার্ন প্রেয়িং ম্যান্টিস'। এই মার্শাল আর্টসগুলোর জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই আর বলার অপেক্ষা রাখছে না।

শিরোনামের হেরফের করা যাবে না। শুনতে আজব মনে হলেও আপনি ইচ্ছে থাকলেই আপনার বাসায় ম্যান্টিস পুষতে পারেন যদি আপনার স্থানীয় আইন একে অস্বাভাবিক পোষা প্রাণী (Unusual Pet) ঘোষণা করে না থাকে! হ্যাঁ, এরা পোষার যোগ্য। যে সকল পোকা পোষা হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে কমন হচ্ছে আমাদের আলোচ্য প্রেয়িং ম্যান্টিস। বিষয়টা খাপছাড়া মনে হলেও আসলে একদম নয়। গুগলে আপনি অসংখ্য প্রবন্ধ পেয়ে যাবেন কীভাবে ম্যান্টিসের যত্ন নিতে হয়। আমাজন শপিং এ মনোরম কভারে ম্যান্টিসের যত্নের জন্য বইও পাওয়া যাচ্ছে। 'দ্যা ডেইলি সাউথের' মতে পোষ্য হিসেবে ম্যান্টিসের যোগ্যতা ইঁদুর অপেক্ষা অধিক। আপনার বাগান থাকলে পোকামাকড়ের উপদ্রব কমাতে ম্যান্টিস পোষা আপনার জন্য উপকারীও বটে!

লেখা সম্পূর্ণ করতে ম্যান্টিসের গুগলীয় বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস–
জগৎ: Animalia
পর্ব: Arthropoda
শ্রেণী: Insecta
মহাবর্গ: Dictyoptera
বর্গ: Mantis (or Mantodea)

[বানান সংশোধন: আশরাফুল ইসলাম মাহি]
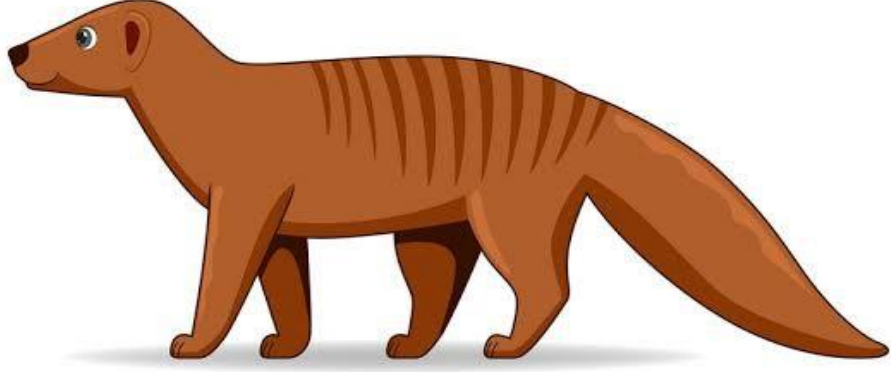
গুইসাপ

মার্ফি মেসবাহ্

নাম শুনে সাপ মনে হলেও আসলে 'গুইসাপ' কোনো সাপ নয়। এটি এক ধরনের বড় জাতের গিরগিটি (তবে গিরগিটির মত পিগমেন্ট এদের নেই)। কিন্তু সাপের মতো দ্বিখণ্ডিত জিভসম্পন্ন সরীসৃপ শ্রেণির প্রাণী। এরা মূলত গর্তবাসী। এরা গাছে উঠতে পারে আবার ভালো সাঁতারুও বটে।

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Varanus salvator*

বাংলাদেশের সবখানেই বিশেষ করে বসতবাড়ির আশেপাশে, ঝোপঝাড়ে, খালে-বিলে এদের দেখা যেত। তবে দুঃখের বিষয় আজকাল আর এই প্রাণীটিকে তেমন আর দেখতে পাওয়া যায় না। গুইসাপ ৮ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। ভয় পেলে বা রেগে গেলে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে। আত্মরক্ষার জন্য লেজ দিয়ে আঘাত করে। একসাথে ২০ থেকে ৩০টি ডিম দেয়। বাচ্চা ফুটতে ৭ থেকে ৯ মাস সময় লাগে। পৃথিবীতে মাত্র ৭৩ প্রজাতির গুইসাপ রয়েছে আর সবচেয়ে বড়ো গুইসাপ প্রজাতি কমোডো ড্রাগন। বাংলাদেশে গুইসাপের মাত্র তিনটি প্রজাতি দেখা যায়। যথা: কালো গুইসাপ, সোনা গুইসাপ ও রামগদি গুইসাপ। কালো গুইসাপ বাংলাদেশের সর্বত্র লোকালয়ের আশেপাশে বাস করে। সোনা গুইসাপ পাহাড়ি এলাকায় আর রামগদি গুইসাপ লোনাপানির সঙ্গম অঞ্চল,

উপকূলীয় অঞ্চল, নদীর মোহনা ও সুন্দরবনে বাস করে। এটি ৯০ ফুটের মতো লম্বা হতে পারে। ওজন হয় প্রায় ২৫ কেজির মতো।

আগে ছোটোবেলায় এই প্রাণীটিকে বেশ দেখা যেত আর তখন দুষ্টুমি করে বলতাম এটির খাবার হয়তো 'হাগু' তাই এরকম নাম। আসলে তা না। এর প্রধান খাদ্য কাঁকড়া, শামুক, ইঁদুর, হাঁস-মুরগির ডিম, পঁচা-গলা প্রাণীদেহ ও উচ্ছিষ্ট। তবে বড়ো গুইসাপ মাছ, সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ও পাখি, ছোট কুমির খায়।

আসলে গুইসাপ একটি উপকারী প্রাণী। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও বন্যপ্রাণী গবেষক মনিরুল এইচ খান বলেন, "গুইসাপ অতি উপকারী প্রাণী। পরিবেশ ও কৃষকের বন্ধুও বলা যায় গুই সাপকে। গুই সাপ শুধু যে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে তা নয়, গুই সাপ যে অঞ্চলে থাকে সেখানে বিষাক্ত সাপের উপদ্রবও কম হয়।"

তবে বাসস্থানের সংকোচন ও এর দামি চামড়ার কারণে আজ এটি বিপন্নের পথে। বাংলাদেশে ২০১২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনে এই গুইসাপ সংরক্ষিত। তবু অনেক অসাধু, লোভী ব্যক্তিরা এদেরকে আজও বিপন্ন করছে

গাছেরাও নিজেদের মাঝে "**কথা বলে**!

অতিরঞ্জিত হেডলাইন, ভুল ভেবে বসবেন না আবার। গাছেদের শিকড় থেকে শিকড়ে রয়েছে ছত্রাকের বিশাল জাল। এর মাধ্যমে গ্লুকোজ পরিবহনের পাশাপাশি পোকার আক্রমনের ব্যাপারে সতর্ক করতে, এমনকি আশেপাশে গড়ে ওঠা হুমকি স্বরুপ গাছকে আক্রমনও করতে পারে ক্ষেত্রবিশেষে। হাজার হাজার বর্গমিটার জুড়ে বিস্তৃত থাকতে পারে এই নেটওয়ার্ক। যদিও এর সবই গাছ করে আনকনশাস হিসেবে, চেতনা নেই যে গাছের, সে বোঝে না এর কিছুই, অনুভব করে না কিছুই। শুধুই সিম্পল কেমিক্যাল রিস্পন্স!

কমিক আর্টিস্ট: SamudraJS

নাম তার ফুলঝুরি

স্বপ্নীল জয়ধর

গ্রামের বাড়ির রাস্তা দিয়ে আনমনে হাঁটছিলাম। হঠাৎ একটা গাছের কাছে আসতেই কী মনে করে গাছের দিকে তাকালাম। দেখি একটা ছোটো পাখি অদ্ভুত শব্দে ডাকতে ডাকতে উড়ে গিয়ে পাশের গাছে মিলিয়ে গেল। আবার সে পাশের গাছে ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে গেল। আর সেই গাছ থেকে ডেকেই যাচ্ছে -

"ছিইক ছিইক ছিইক ছিইক..." বা "চিক চিক চিক চিক..."

শব্দটা একেকজনের কাছে একেক রকম লাগে। একনাগাড়ে সুন্দর, মিষ্টি গানের গলায় ডেকে যাচ্ছে। কোনো থামা নেই। যে একনজর দেখেছিলাম তাতে মনে হলো পাখিটার পেট গলা বুক একেবারে সাদা। কেমন জানি মনে হতে থাকল এটা তার আসল রং নয়।

তাই সেই সন্দেহ মেটানোর জন্য আরো কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তার কোনো দেখা নেই। ততক্ষণে অবশ্য ডাকাডাকিও বন্ধ করে দিয়েছে। যেন সে সর্তক হয়ে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। আর না হয় উড়ে অন্যকোথাও উড়ে গেছে।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। তারপরও তার দেখা নেই। মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হলাম। শেষে বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু মনে মনে বললাম,"কালও যাব সেখানে।"

পরদিন মামাতো ভাইকে নিয়ে বের হলাম। সেই পাখি দেখার আশায়। বলে রাখা ভালো আমার মামাতো ভাই একজন শখের পাখিবিশারদ। বলতে গেলে যে-কোনো পাখিকে একবার দেখলেই তার সম্পর্কে সব কথা তার মুখে ফুটতে থাকবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। বাট না পাখির দেখা পেলাম, না পাখির কোনো শব্দ পেলাম। অবশ্য তার মুখে শুনেছিলাম এখানে নাকি একজোড়া ফুলঝুরি আর তিনজোড়া বেনেবউ পাখির বাসা আছে। তারপরও তার কথা আমার বিশ্বাস হলো না। শেষে সে বিরক্ত হয়ে বাড়ি চলে আসতে যাচ্ছিল। এমন সময় শুনতে পেলাম সেই কাঙ্ক্ষিত পাখি মহাশয়ের ডাক। আমারআনন্দ আর দেখে কে তখন। তার দিকে তাকাতেই দেখলাম সে কান খাড়া করে শুনছে। জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী পাখি?"

"সুউউ...। শুনে তো মনে হচ্ছে এটা ফুলঝুরির ডাক। দেখলে ভালো হতো... দাঁড়া গাছে উঠে দেখি।" এই বলে সে তরতর করে গাছে উঠা শুরু করে দিল। প্রায় ৩ তলার মতো উঠে একটা ডাল থেকে একটা পাখিকে ধরে পকেটে পুরে আবার তরতর করে নিচে নেমে গেল। নেমে আমাকে পকেট থেকে পাখিটা বের করে দেখাল।

দেখলাম এত ছোটো যে হাতের মুঠোর মধ্যে ঢুকে যায়। এক মূর্হুত ভাবলাম হার্মিংবার্ড না তো? পরক্ষণেই ভাবনাটাকে বাতিল করে দিলাম। কেননা হার্মিংবার্ড পিছনের দিকে ওড়ে। কিন্তু পাখিটা সেভাবে ওড়ে না।

পাখিটার রংটা একেবারে সাদা না হলেও ধূসর সাদা। আর মনে হচ্ছে, তার গায়ের উপর আলতোভাবে গাঢ় সিঁদুর রং লেগে আছে। লেজের তলদেশে খানিকটা কালো। কপাল, পিঠ, ডানা গাঢ় জলপাই রঙের। ডানার পালকের নানা জায়গায় থাকে গাঢ় লাল ও চকচকে নীল কালো রং। উপরের পালক সবুজাভ ধূসর। মাথার উপরের পালকের মাঝখানে এবং ডানার নিচের অংশ পাটকিলে। মাথার দুপাশে সাদা ছোপ। পা এবং আঙুল সীসে মিশ্রিত নীল।

“এটা নাকি তোর ওই পাখিটা?”

“বুঝতে পারতাছি না।“

এমন সময় সে “ছিইক ছিইক” করে ডেকে উঠল। “হ্যাঁ এটাই সেই পাখি।“ চিৎকার করে উঠলাম।

“বুঝলাম। এবার পাখিটাকে বরং ছেড়ে দেই। বেচারা কষ্ট পাচ্ছে।“

দেখলাম ছেড়ে দিতেই পাখি ঝাপটে ওড়ে গেল। ওড়ার ভঙ্গি এককথায় অসাধারণ। ওড়ার সময় ডানা একবার খোলে, একবার বন্ধ করে। বাতাসে ঢেউ তুলে তুলে ওড়ছে। ওড়ার গতিও বেশ দ্রুত। ওড়তে ওড়তে একসময় একটা ডালে বসল। দেখে মনে হয় পা দুটো সামনের দিকে প্রসারিত রেখে খানিকটা পিছনে হেলান দিয়ে বসা। ডালটায় একটা পেয়ারা ঝুলেছিল। ধীরে ধীরে পেয়ারাটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর খাওয়া শুরু করল। হাভাতের মতো খাচ্ছে। যেন মনে হয় দীর্ঘকাল কিছু খায়নি। পেয়ারাটা খেতে খেতে পেয়ারাটার ভেতরে ঢুকে গেল। মানে আরেক লেবেলের ভাবছিলাম নড়তে নড়তে না একসময় ফলটাই ডালটা থেকে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দেখলাম ফলটাই ডাল থেকে পড়ে গেল। মনে হয় না পাখিটা বেঁচে আছে। পাখিটার জন্য দুঃখ লাগল। আবার হাসিও আচ্ছে।

তখন আমার মামাতো ভাই বলল,”কিছুক্ষণ দাঁড়া একটা মজার ঘটনা ঘটবে এখন।“ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম দেখলাম পাখিটা “ছিইক ছিইক” করে ডেকে বের হয়ে এলো। এটা দেখে আমার হাসি আর আটকায় কে।

হাসির আওয়াজে পাখিটা উড়ে গেল। “দিলি তো পাখিটাকে উড়িয়ে। চল বাড়ি যাই বড্ড দেরি হয়ে গেছে। রাস্তায় তোকে পাখিটার ইতিবৃত্তান্ত বলব।“

তো সে আমাকে ইন্টারনেট আর নিজের জানা কথা থেকে যা বলল তা অনেকটা এমন-

এরা বাংলাদেশ সহ এশিয়ার সবচেয়ে ছোটো পাখি। এর থেকে ছোট পাখি এশিয়া মহাদেশে আর নেই। অনেকে এদেরকে হার্মিবার্ড বা টুনটুনি বলে ভুল করে। তবে বলে রাখা ভালো হার্মিবার্ডের থেকে খানিকটা বড়ো এবং টুনটুনির থেকে খানিকটা ছোটো। এরা লম্বায় (লেজ থেকে ঠোট পর্যন্ত) প্রায় ৮ সে.মি.। যেখানে হার্মিবার্ড মাত্র ৪ থেকে ৫ সে.মি. এর হয়ে থাকে। অর্থাৎ এরা হার্মিবার্ড থেকে লম্বায় মোটামুটি ৪ থেকে সাড়ে ৪ সে.মি. বড়ো। আবার টুনটুনি এদের থেকে প্রায় ৪ থেকে সাড়ে ৪ সে.মি. বড়ো।

এদের ওজন ৬.৩ গ্রাম। ডানা ৪.৮ সে.মি., ঠোঁট ৯.২ সে.মি., পা ৯.২ সে.মি. ও লেজ ২.৪ সে.মি.। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতেই দেখা যায়। এদের মিশ্র চিরহরিৎ বনাঞ্চল, সুন্দরবনের গরান বনাঞ্চল এবং দেশের দক্ষিণ-পূর্ব বনাঞ্চলেও দেখা যায়। এরা থাকে পাতাঝরা বন, আবাদি বন, ঘেরা ফলের বাগান, কুঞ্জবন বা প্যারাবনে। এদের প্রধানত পছন্দের খাবার-পরজীবী গাছের রসালো ফল। যেখানে ফলের বাগান, বনভূমি কিংবা গ্রামীণ লোকালয়ের কাছে গাছ-গাছালি, সেখানেই এদের দেখা যায়। তবে আকারে ছোটো বলে এদের তেমন চোখে পড়ে না। যখন এরা এক গাছ থেকে অন্য গাছে ওড়ে তখন এদের সাধারণত চোখে পড়ে।

এদের আবার একেক জায়গায় একেক নামে ডাকে। যেমন কোথাও ফুলচুষি আবার কোথাও মধুচুষি।

ফুলঝুরির ইংরেজি নাম Tickelles FlowerpeckerI

এর শ্রেণিবিন্যাস :
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Passeriformes
Family: Dicaeidae
Genus: Dicaeum
Species: *Dicaeum erythrorhynchos (latham, 1790)*

গ্রীস্মকাল ওদের প্রজননে সময়। ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে তাদের ঘর তৈরি শেষ হয়। এ সময় বেশ উঁচুতে গাছের ডালে ছোটো থলির মতো ঝুলন্ত বাসা বানায়। বাসার স্থান নির্বাচন পুরুষ পাখি আর স্ত্রী পাখি মিলে করলেও বাসা তৈরি করা ও ডিমে তা দেয়ার দায়িত্ব স্ত্রী পাখির একাই। তবে বাচ্চাদেরকে দুজনে মিলেমিশেই খাওয়ায়। ওদের ডিমের সংখ্যা ২টি। স্ত্রী-পুরুষ একে অপরকে সহযোগিতা করে সংসার জীবনে। ডিমের রং ঘোলাটে সাদা। ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে ১৩-১৫ দিনে। ফোটার পর মা-বাবা উভয়েই বাচ্চাদের খাওয়ায় ও যত্ন নেয়। বাচ্চারা ওড়তে শেখে ১৩-১৪ দিনে। ২২-২৪ দিন বয়সে ছোট্ট পাখিগুলো বাবা-মায়ের কাছ আলাদা হয়ে যায়।
দক্ষিণ এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডে ফুলঝুরি পাখির ৫৫টি প্রজাতি ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশে মাত্র ৭ প্রজাতির ফুলঝুরি শনাক্ত করা হয়েছে। যাদের মধ্যে বাংলাদেশে মেটেঠোঁট ফুলঝুরি (Pale-billed flowerpecker) ও লালপিঠ ফুলঝুরি (Scarlet-backed Flowerpecker) সব এলাকায় দেখা যায়।
এ পাখি আবার পরিবেশের অনেক উপকার করে। যেমনঃ

১) এরা ফসলের জন্য যে-সকল পোকামাকড় ক্ষতিকর তাদের খেয়ে ফেলে কৃষকের বন্ধুর মতো আচরণ করে।
২) আবার এরা ময়লা আর্বজনা খেয়ে ফেলে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে বাঁচায়।
৩) আবার এরা হা ভাতের মতো যে ফলমূল খায় তার বীজ সে হজম করতে পারে না। তাই সে খাওয়ার কিছুক্ষণ পর সেই বীজ মল হিসেবে ত্যাগ করে। ফলে বীজ একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরের মাধ্যমে পরাগায়নে সাহায্য করে।

এদের নিয়ে একটা মজার কথা প্রচলিত আছে। এরা নাকি সর্দিজ্বর হওয়ার ভয়ে বর্ষাকে ভয় পায়। যার কারণে এরা বর্ষার সময় পাতা আর ব্যাঙের ছাতার নিচে আশ্রয় নেয়। আর গজর গজর করে বিরক্তি প্রকাশ করে। অনেকটা ছোটো বাচ্চার মতো।

আমার মামাতো ভাই আমাকে আরো কিছু বলতে যেত কিন্তু এমন সময় একজন তাকে কল দেওয়ায় তাকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়। ফলে বাকিটুকু শুনাও হয় না আমার। তবে সে আমাকে কথা দেয় পরে কোনো একদিন সে আমাকে আরো বলবে। সেই অপেক্ষায় রইলাম।

সিলভার ফিশ

শিখর সরকার

আজ আপনাদের শুনাবো এমন এক প্রানীর গল্প যাদের নারীরা পুরুষদের তাড়া করে। কী আশ্চর্য! নারীরা পুরুষদের তাড়া করে! আচ্ছা ঠিক আছে, এটা না হয় স্বাভাবিকভাবেই নিলাম। কিন্তু তাড়া করার কারণটা কী? এবং এমন কাজ কেন করে এ প্রাণীর পুরুষ প্রজাতি? তারা কি ভয়ে দৌড়ায়? উত্তর হচ্ছে 'না'। আসলে এটা এ প্রজাতির প্রজননের পূর্বের একটি ধাপ। এ প্রজাতির প্রাণীরা প্রজননের পূর্বে এক ধরনের নিয়ম পালন করে, যা তিন ধাপসম্পন্ন। এই তিন ধাপের দ্বিতীয় ধাপে পুরুষটি দৌড়ে পালায় এবং তার নারী সঙ্গী তাকে তাড়া করে। এই প্রাণী আদিম, ডানাহীন, নিশাচর প্রকৃতির পোকা যার দৈর্ঘ্য সাধারণত 13-25 মিলিমিটার হয়। এ প্রাণী যে বর্গের অন্তর্ভুক্ত, তার প্রাণীরা সাধারণত চোখবিহীন হয়। কিন্তু এদের দুটি ছোটো পুঞ্জাক্ষি আছে, যার কারণে এরা আলোকে ভয় পায় এবং উজ্জ্বল আলো দেখলে এরা লুকিয়ে পড়ে। এরা ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন পোকা এবং এরা এদের বেশিরভাগ শিকারীদের ছাপিয়ে যায়। এরা 75% থেকে 95% আপেক্ষিক আর্দ্রতাযুক্ত স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস করে। এদেরকে সচরাচর বাড়ির সর্বনিম্ন অংশে, বাথটাবে, রান্নাঘরে, বেসিনে, পুরাতন বইয়ে,লাইব্রেরিতে, ক্লাসরুমে পাওয়া যায়। এরা সেসব পদার্থ ভক্ষণ করে যেগুলোতে পলিস্যাকারাইড থাকে, যেমন-আঠায় স্টার্চ এবং ডেক্সট্রিন থাকে। বই, কার্পেট, কাপড়, চিত্রকর্ম ইত্যাদিতে আঠা থাকে, যার কারণে এরা এগুলো কাটে। এছাড়াও এরা তুলো, মৃত পোকা, পট্ট বস্ত্র, রেশম, অবশিষ্ট রুটির টুকরো, এমনকি নিজেদের ঝরিত বহিঃকঙ্কালও (exuviae) গ্রাস করে। এদের ক্ষয় এবং ধ্বংসকারী বেশিষ্ট্যের জন্য এদেরকে গৃহস্থালির পোকামাকড় বলে বিবেচনা করা হয়। এসব কাহিনি তো গেল। এখন নামটা দেখা যাক, তাতে কী পাওয়া যায়। এ পোকার বৈজ্ঞানিক নাম হলো *'Lepisma saccharinum'*। এদের সাধারণ নাম হলো সিলভারফিশ। এটি এক ধরনের পোকা অথচ নামের সঙ্গেই রয়েছে ফিশ। এর পিছনেও কারণ রয়েছে। যখন এই পোকা নড়াচড়া বা চলাফেরা করে তখন তা মাছের মতো নড়াচড়া বা চলাফেরা করে। এর গায়ের রঙ রূপালি (silver) এবং হালকা ধূসর। এজন্য এর নাম সিলভারফিশ।

শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ-
Kingdom:Animalia
Phylum:Arthropoda
Class:Insecta
Order:Zygentoma
Family:Lepismatidae
Genus:Lepisma
Species:*Lepisma saccharinum*

আমাদের জীববৈচিত্র্য

জয় দেব নাথ

আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগের কথা, চারদিকে বিশাল এলাকা জুড়ে পাহাড় আর ঘন অরণ্য। পাহাড়ের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে শিলক খাল, যা মিশেছে কর্ণফুলী নদীতে গিয়ে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হতে চলল, চাঁদনী রাত, হালকা ঠান্ডা হাওয়া বইছে, আর পুরোপুরি নিস্তব্ধ পরিবেশ। কিছু কাজ সেরে শিলক খাল দিয়ে দাদু আর বাবা ভেলায় করে বাড়ি ফিরছিলেন। বাবার বয়স তখন ছয় কি সাত হবে, কাঁথা মুড়ে শুয়ে আছেন দাদুর কোলে।

হঠাৎ জোছনার আলোয় দাদুর চোখ কিছু একটার উপর পড়ল। সামনে ভয়ংকর কিছু। ভেলা তখন অগভীর পানিতে। দাদু বাঁশের সাহায্যে ভেলার গতি কমালেন। একটা মস্ত বড়ো কালো ভালুক তাদের দিকে তাকিয়ে নদী পাড় হচ্ছে। দাদু ঘাবড়ে গেলেন, এই বুঝি ভেলার উপর ঝাপিয়ে পড়লো ভালুকটা। বাবার চোখ হাত দিয়ে ঢেকে ধরলেন, যাতে বাবা ভয় পেয়ে না যায়! ধীরে ধীরে ভালুকটা নদীর ওপারে পৌঁছল। কিন্তু তবুও ভালুকটার নজর এদিকেই, হয়তো ভালুকটাও বোঝার চেষ্টা করছে সামনে কী। দূরত্ব কমতে থাকল তাদের মধ্যে, ২০-৩০ ফুট মতো হবে। ভেলা খুব ধীরে এগোচ্ছিল, দাদুও এর মধ্যে কাঁথা দিয়ে নিজেকে যথাসম্ভব ঢাকার চেষ্টা করছিল। ভেলা যখন ভালুকের সবচেয়ে কাছে, তখনই ভালুকটা আগ্রহ হারিয়ে ফেলল এবং মাথা ঘুরিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা দিল। আর দাদু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

আজ থেকে বেশ অনেক বছর আগে দেশের অন্যান্য জায়গার মতো চট্টগ্রামের এই শিলক অঞ্চলটাও ছিল ঘন অরণ্যে ঢাকা। যার সুবাদে হরেকরকম প্রাণীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয় অঞ্চলটি। যার মধ্যে ছোটো, বড়ো, হিংস্র, শান্ত সব ধরনের জীব-জন্তুর স্থান হয়েছিল। আর তাই ছোটোবেলা থেকেই গুরুজনদের

মুখে এসব প্রাণীদের নিয়ে নানারকম রোমাঞ্চকর গল্প শুনে আসছি, তারই একটা ছিল ভালুকের মুখোমুখি হওয়ার এই গল্পটি। তবে এটা কিন্তু গল্প হলেও সত্যি!

(১)

বাংলাদেশে কালো ভালুক নতুন কিছু না, একসময়কার ঘন অরণ্যে ঢাকা বাংলা এসব ভালুকদের জন্য আদর্শ আবাসস্থল ছিল। এশিয়া এবং আমেরিকা, এই দুই মহাদেশেই এদের পাওয়া যায়, তবে দুটো প্রজাতি কিন্তু আলাদা। বাংলাদেশি কালো ভালুকগুলোকে বলা হয় এশিয়ান ব্ল্যাক বিয়ার। মূলত সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনাঞ্চলে এদের বসবাস।
[is.gd/VcdwER]

আর একসময় চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনাঞ্চলের একটা অংশ আমাদের শিলক অঞ্চলেও ছিল, যার ফলে এসব কালো ভালুকদের বিচরণও ভালোই ছিল। ওজনে ২০০ কেজি অবধি হতে পারে এই কালো ভালুকগুলো। তাই বলাই যায় বেশ বড়োসড় প্রাণী ছিল এরা। আর যেমন আকার তার তেমনই শক্তি! তাই মানুষের এই প্রাণীটাকে ভয় পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করার মতো প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা যায় না, বরং নিজেদের এবং বাচ্চাদের সুরক্ষার জন্যই তাদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যেত।
[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Asian_black_bear]

তাই যতক্ষণ না মানুষ নিজে ভালুকের এলাকায় গিয়ে না পড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আর স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলেও তাই ঘটত, যত ভালুকের আক্রমণের ঘটনা ছিল তার সবই ছিল গহীন অরণ্যে। তবে এসব এখন অতীতই বলা যায়, কারণ বর্তমানে চামড়া, লোম, পিত্ত থলি, দাঁত, নখের জন্য শিকারের ফলে কালো ভালুক বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত প্রায়! তবে এই অঞ্চল থেকে বিলুপ্তির কারণ আলাদা, আর তা হচ্ছে প্রতিনিয়ত বন উজাড়।

(২)

ভালুকের মতোই এই অঞ্চলের মানুষরা আরেকটি প্রাণীকে নিয়ে বেশ ভয়ে ভয়ে থাকতো। গভীর অরণ্যে প্রবেশের আগে দুবার ভাবতো! যদিও এটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ এমন অনেক ঘটনাই শোনা যায়, যেখানে এই প্রাণীটি তার এক থাবাতেই একজন জলজ্যান্ত মানুষের জীবন নিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, সেই প্রাণীটি বাঘ।

এই অঞ্চলে মূলত দুই প্রজাতির বাঘের কথা শোনা যায়, রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং চিতাবাঘ। একসময় এই অঞ্চলের জঙ্গলের আশেপাশে বসবাসরত মানুষদের জন্য অন্যতম ভীতির কারণছিল এই প্রাণী। তবে সময়ের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে থেকে এই ভীতিও এখানকার বাঘের মতোই বিলুপ্ত। যদিও এখনো মাঝেমধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঘের হদিস পাওয়া যায়।
[is.gd/kPWQWl]

তবে বর্তমানে বাংলাদেশে কেবলমাত্র সুন্দরবনেই সবচেয়ে বেশি বাঘের আবাসস্থল রয়েছে, আর সেটাও বিশেষ করে মানুষের কারণে দিনের পর দিন উল্লেখযোগ্য হারে কমছে। যদিও সরকার নানারকম পদক্ষেপ নিচ্ছে দেশের এই গৌরবময় প্রাণীটিকে টিকিয়ে রাখার, যেমন এ বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘন জঙ্গল বাঘের উপযুক্ত হলে সেখানে নতুন করে বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
[https://www.bbc.com/bengali/news-53991975]

তবে প্রশ্ন থেকেই যায়, "তারা কি তাদের সেই অভয়ারণ্য বাংলাকে ফিরে পাবে?"

(৩)

শেষবার যখন চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম, তখন পাখিদের মধ্যে একটা প্রজাতি বিশেষভাবে নজর কেড়েছিল। তার চলাফেরা, এটিটিউড সবকিছুই যেন অন্য পাখিদের থেকে আলাদা। তাও এই বন্দি অবস্থায়! তবুও এই পাখিটিকে মনে হয় এখানে অতটাও ভালো চোখে দেখা হয় না। হোক সেটা শকুনি মামার জন্য, হোক সেটা "শকুনের অভিশাপে গরু মরে না" প্রবাদের জন্য অথবা হোক সেটা অন্য কোনো কারণে। কিন্তু তবুও বলতে হয়, এই পাখিটিরও গুরুত্ব কিন্তু আছেই! কারণ শকুনই একমাত্র প্রাণী, যা রোগাক্রান্ত মৃত প্রাণী খেয়ে হজম করতে পারে, যা বাকি জীবজগতকে অ্যানথ্রাক্স, যক্ষ্মা, খুরা রোগের মতো ভয়ংকর ব্যাধির সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। প্রসঙ্গত, অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে রাখলেও তা একশ বছর সংক্রমণক্ষম থাকে।

[https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%A8]

তবে এসব গুরুত্ব এখন আর কার্যকরী নয়, শকুন থাকলেই তো হবে! বর্তমানে বাংলাদেশে শকুনের সংখ্যা তিনশোরও কম। এখন শুধুমাত্র মৌলভীবাজার এবং সুন্দরবন এলাকায় কিছুটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় শকুনের দেখা মেলে। শকুনের এই সংখ্যার এমন অবনতির জন্য দায়ী করা হয় তিন থেকে সাড়ে তিন দশক আগে গরুর জন্য প্রচলন হওয়া একটি ব্যথানাশক ঔষধের।

'এই ঔষধটা গরুকে দেয়ার পর যদি গরু মারা যায় এবং সেই মৃত গরু কোনো শকুন খায়, তবে পরবর্তীতে ওই শকুনটিও মারা যায়'।

এটা ২০০৩ সালে ধরা পড়ার পর শকুন অধ্যুষিত দেশগুলোতে এই ঔষধ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ততদিনে বাংলাদেশের জন্য তা অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, শকুনের সংখ্যা যা কমার ছিল তা ততদিনে যথেষ্ট পরিমাণে কমেই গিয়েছিল!

[https://www.bbc.com/bengali/news/2015/09/150906_aho_bangla_vulture_extinct]

তবে আমাদের অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই শকুন বিলুপ্তির ঘটনা একটু আলাদা। একসময় যেই অঞ্চলটা শকুন অধ্যুষিত ছিল, এখন সেই জায়গায় আর শকুনের কোনো নাম নিশানাও নেই। শোনা যায় একাত্তরের যুদ্ধের সময় গোলাগুলির আওয়াজে সব শকুন এই অঞ্চল থেকে দূরে চলে যায়। এরপর তারা আর কখনোই ফিরে আসেনি!

(৪)

মনে আছে, ছোট বেলায় যখন 'অ' তে "অজগরটি আসছে তেড়ে" লাইনটা পড়তাম তখনই চোখের সামনে ভেসে উঠত বিশাল একটা সাপের তেড়ে আসার দৃশ্য, অনেক সময় নিয়ে ভাবতাম দৃশ্যটা, কারণ একসময় আশেপাশে ঘটা অজগর নিয়ে নানান ঘটনার ভয়ংকর সব গল্প প্রায়শই শুনতাম। যা তখন আমার ছোটো মনে ভালোই ভীতির সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে পাহাড়ে কোনো সময় গেলে বেশ ভয়ে ভয়ে থাকতাম! কারণ একসময় ওই পাহাড়গুলোতেই বিশালাকৃতির সব অজগরের আনাগোনা ছিল। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক জায়গায় এখনো মাঝেমধ্যে এ ধরনের সাপের দেখা মেলে।

[https://samakal.com/whole-country/article/1506140699]

[https://m.bdnews24.com/amp/bn/detail/ctg/1759619]

তখন ভাবতাম এগুলোই হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সাপ, কিন্তু ধারণাটা ভুল ছিল, মূলত গ্রিন অ্যানাকোন্ডারাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাপ।

[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Green_anaconda]

তবে সেক্ষেত্রে অজগর সাপ নিয়ে এখানে যেসব গল্প প্রচলিত আছে তা হয়তো অতটাও ভয়ংকর নয়। আবার এটাও হতে পারে যে সেসব সাপ অজগরের পরিবর্তে অ্যানাকোন্ডাই ছিল! যদিও দুটোই কিন্তু আলাদা প্রজাতির সাপ।
[is.gd/JnAcoP]

যাহোক, এই অঞ্চল থেকে এসব সাপ এখন বিলুপ্ত, তাই সত্যিটা ইতিহাসের আড়ালেই থাক!

(৫)
এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব প্রাণী নিয়ে বলেছি তার সবই এখন এই অঞ্চল থেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত। তবে এখন যেই প্রাণীটির কথা বলব সেটির এই অঞ্চলে এখনো বেশ ভালোই বিচরণ রয়েছে। আর বলাই বাহুল্য যে এটাই এগুলোর মধ্যে এই অঞ্চলে আমার সচক্ষে দেখা একমাত্র প্রাণী। এখনো এখানের অনেকের রাতের ঘুম উড়িয়ে দেয় এই প্রাণীটি। আর এরাই হলো বর্তমান পৃথিবীর স্থলভূমির সবচেয়ে বৃহৎ প্রাণী হাতি। যদিও এশিয়ান হাতিদের থেকে আকারে আফ্রিকান হাতিরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বড়ো এবং শক্তিশালী। কিন্তু তবুও এশিয়ানগুলোও কম যায় না। প্রতিবছর ধান কাটার মৌসুমে প্রাণীটি পাহাড় থেকে নেমে লোকালয়ে ঢুকে একপ্রকার তান্ডব চালায় বলা যায়। আর এই তান্ডবে হতাহতের ঘটনাও বাদ যায় না।
[https://www.bbc.com/bengali/news-50534961]

তবে প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজেরাই দায়ী এসব দুর্ঘটনার জন্য। কারণ আমাদের বন ধ্বংস, তাদের এলাকার ভেতরে গিয়ে চাষাবাদ করার মতো অনুচিত কাজের প্রতিদানে এমন কিছু পাওয়া অস্বাভাবিক মোটেও নয়! আর তাছাড়াও আমাদের কারণে হাতিদের যে পরিমাণে ক্ষতি হচ্ছে তার তুলনায় আমাদের ক্ষতি নেহাতই তুচ্ছ।
[https://m.bdnews24.com/amp/bn/detail/environment/1771889]

এভাবে চলতে থাকলে এটা নিশ্চিত যে, অন্যান্য প্রাণীগুলোর এই প্রাণীটাও একদিন হারিয়ে যাবে চিরতরে!

একসময়ের প্রাণী বৈচিত্রের বাংলায় যেন আজ ভাটা পড়েছে। খুব কম সময়ের মধ্যে বাংলার প্রকৃতি অনেক বেশি কিছু হারিয়েছে। আমাদের এই অঞ্চলটাও তার অন্যতম এক যথার্থ উদাহরণ। এই প্রাণীগুলো ছাড়াও হরিণ, বুনো শূকর, নানান প্রজাতির পাখিদের অবাধ বিচরণ স্থল ছিল এই অঞ্চল। একসময় মানুষ যেখানে যাওয়ার সাহসই পেত না, আজ সেখানে ঘন লোকবসতি। তবে হ্যাঁ, পাহাড়ের উপর থেকে চোখ বোলালে দূরে এখনো গহীন অরণ্যের দেখা মিলে, সেখানে হয়তো এখনো এমন কিছু জীববৈচিত্র্য টিকে আছে। কিন্তু আর কতদিন? বাংলার এমন রূপ দেখলে জীবনানন্দও হয়তো আর এই বাংলায় ফিরে আসতে চাইতেন না।

[সম্পাদকের কথা: লেখক চট্টগ্রামের বাসিন্দা। তার এই লেখাটি তার নিজের এলাকার জীবজগতের উপর ভিত্তি করে লেখা]

শ্রেণিবিন্যস্ত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয়

স্বপ্নিল আচার্য্য

নবম দশম শ্রেণিতে সাধারণ গণিতে পরিসংখ্যান অধ্যায়ে আমরা শ্রেণিবিন্যস্ত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় করি। সেসময় আমরা একটি সূত্র ব্যবহার করি। এই সূত্রটির প্রতিপাদন আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শেখানো হয় না। আজ আমরা এই সূত্রটি কীভাবে বের করা যায় তা দেখার চেষ্টা করি।

সূত্রটি এরকম-

Mode=L+f1f1+f2h

আমরা একটি ডাটাসেট নিয়ে কাজ শুরু করি।নিচের ছকটি দেখি।

শ্রেণিসীমা	গণসংখ্যা
a-b	x
b-c	m
c-d	f0
d-e	n
e-f	y

ধরি, এটি একটি ডাটাসেট। যার প্রচুরক শ্রেণি c-d কারণ,আমরা ধরে নিয়েছি, f0 অন্য সবগুলো গণসংখ্যা থেকে বড়ো। মানে c-d শ্রেণিতে উপাত্ত সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যার মান f0
আমাদের বইয়ের নোটেশান অনুযায়ী,

f1=f0-m= প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা - প্রচুরক শ্রেণির পূর্ববর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা।

f2=f0-n= প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা - প্রচুরক শ্রেণির পরবর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা

আমরা সবাই আশা করি, আয়তলেখ বা বার ডায়াগ্রাম (Histogram) থেকে প্রচুরক বের করতে পারি। এই লেখায় আমরা সেটা ব্যবহার করবো। এখন উপরের ছকের ডাটা থেকে বার ডায়াগ্রাম (Histogram) অঙ্কন করি।

[Additional Note- AP,EM,BQ ; X অক্ষের উপর লম্ব। এবং EF⊥ AC]

এবার গ্রাফ থেকে,

AP=BQ=f0

PQ=AB=h=শ্রেণিব্যাপ্তি

AC=AP-CP=f0-m=f1

BD=BQ-DQ=f0-n=f2

আপনি যদি আয়তলেখ থেকে প্রচুরক বের করতে পারেন তাহলে বুঝবেন যে, M বিন্দুটিই প্রচুরক বিন্দু।

সুতরাং, প্রচুরক হবে c+PM

খেয়াল করেন, c কিন্তু প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা = L

PM=EF=p

সুতরাং, প্রচুরক = L+p

এখন আমাদের p এর মান নির্ণয় করতে হবে। তাহলেই প্রচুরক বের করতে পারব।

এখন,

AFE & ABD এর মধ্যে,

∠AFE=∠ABD [Both are 90]

∠FAE=∠ADB [একান্তর কোণ]

∠FEA=∠BAD [Remaining Angle]

So, AFE & ABD সদৃশ।

So, AEAD=EFAB=AFBD

or, AEAD=ph=AFf2.....(1)

আবার,

ACE & BED এর মধ্যে,

∠AEC=∠BED [বিপ্রতীপ কোণ]

∠CAE=∠EDB [একান্তর কোণ]

∠ACE=∠EBD [একান্তর কোণ]

So,ACE & BED সদৃশ।

So,ACBD=CEBE=AEDE

or,f1f2=AEDE

or,f2f1=DEAE

or,f1+f2f1=DE+AEAE

or,f1f1+f2=AEAD.....(2)

(1) & (2) নং সমীকরণ থেকে পাই,

ph=f1f1+f2
or, p=f1f1+f2h

p এর মান বসিয়ে পাই,

Mode=L+f1f1+f2h

আমাদের সূত্র প্রমাণিত। আশা করি বুঝেছেন। ভালো থাকবেন।

কল্পগল্প আইডিয়া

১. একজন জীববিজ্ঞানী এমন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন যাতে মানুষের লাইফ সোয়াপ করা যায়।

২. টাইম ট্রাভেল করে ভবিষ্যৎ থেকে কোনো এক সিক্রেট সোসাইটির মানুষ ভবিষ্যতের কোনো এক ত্রুটি সমাধান করতে আসেন।

৩. কোনো এক বিজ্ঞানী ন্যানোবটের সাহায্যে আলজেইমার কিউরের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ন্যানোবটরা ব্রেইনে গিয়ে সব জিনিসপত্র ঠিক করে আসবে। এর কি কোনো সাইড এফেক্ট তৈরি হবে?

Bonne journée!

দাঁতরাঙা

হুমায়ুন কবির

জাফলং ঘুরতে যাওয়ার সময় গাড়ি থেকে টিলাগুলোয়, রাস্তার পাশে কিংবা জাফলং এর পাথরের স্তুপের পাশে বেগুনি-গোলাপি রঙের বন্য কোনো ফুল চোখে পড়েছে? পাতাটা অনেকটা তেজ পাতার মতো দেখতে? যদি চোখে পড়ে থাকে কিন্তু নামটা অজানা থাকে তাহলে আমি নামের পাশাপাশি বিস্তারিত জানাচ্ছি উদ্ভিদটি দিয়ে।

আমাদের দেশে গাছটির এলাকা ভেদে নাম লুটকি, বন তেজপাতা, দাঁতরাঙা। চাকমা ভাষায় বলা হয় মুওপিত্তিংগুলো। ইংরেজি নাম Indian Rhododendron। পাশাপাশি Singapore Rhododendron, Malabar Melastome, Planter's Rhododendron ও Senduduk নামেও পরিচিত।

শ্রেণিবিন্যাস -
রাজ্য : Plantae
বিভাগ : Angiosperm
অবিন্যাসিত : Edicots
বর্গ : Myrtales
পরিবার : Melastomataceae
গণ : Melastoma
প্রজাতির নাম: *Melastoma Malabathricum*
দাঁতরাঙা গুল্মটি প্রায় তিন মিটার লম্বা হয়। এর উপশাখাগুলো চতুষ্কোণী এবং চ্যাপ্টা থেকে প্রশস্থ, সূক্ষ্ম খন্ডিত এবং তামাটে শল্কদ্বারা ঘন আবৃত। গাছের পাতা দেখতে উপবৃত্তাকার। পুষ্পমঞ্জরিতে তিনটি থেকে সাতটি
ফুল থাকে। মঞ্জুরিপত্র কখনো স্থায়ী, বৃহৎ ও সুদৃশ্য, ২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা। বহিঃপৃষ্ঠা বিশেষ করে মাঝের দিকে চ্যাপ্টা এবং সাদাটে বা লাল শল্কা দ্বারা ঘন আবৃত।

দাঁতরাঙা গাছটি বেশ ঝোপালো। উম্মুক্ত জায়গায় এই গাছ সহজেই বেড়ে উঠতে পারে। মূলত পাহাড়ে বা লাল মাটি আছে এমন জায়গায় এই গাছ ভালো জন্মে। বিদ্ন মাঠ, রাস্তার পাশে, টিলা/পাহাড়ে, নদীর ধারে, জঙ্গলে, ঝোপঝাড়ে এই গাছ বেশি চোখে পড়ে। বাংলাদেশে পঞ্চগড়, গাজীপুর, সিলেট, কাশিমপুর, শ্রীপুরে এই গাছ বেশি দেখা যায়। তাছাড়া বান্দরবান ও টেকনাফ এর আরও কয়েকটি জাতের দেখা মেলে। সিলেট যাবার পথেও জাফলং এ প্রচুর দেখেছি এই গাছ। তবে আমি এই ছবিটি তুলেছি দিনাজপুর জেলার, রানিরবন্দের

তেলি পাড়া নামক এক প্রত্যন্ত গ্রামে ঝোপের ভেতর। যা একদম আশাতীত। বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারত, মালয়েশিয়া এবং নিউগিনি, ফিলিপাইন ও উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় এর দেখা মেলে। দাঁতরাঙা একটি জংলি ফুল হলেও এর রয়েছে বহুজাতিক ঔষধি গুণ। বিভিন্ন অঞ্চলে এটি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এটি কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য ব্যবহার করা হয়। এর পাতার নির্যাস মানবদেহের ক্যান্সার ও হৃদরোগ রোধে সহায়ক। তাছাড়া এর পাতার রস আমাশয়, পেটেরব্যাথা ও বাত জ্বর কমাতে পারে। লোক চিকিৎসায় এটি দাঁত ব্যাথা, উচ্চরক্তচাপ, আলসার, ডায়রিয়া, চর্মরোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। থাইল্যান্ডে মেওহিল আদিবাসীরা এর শেকড়ের নির্যাস গরম পানিতে ফুটিয়ে প্রসব পরবর্তী জটিলতায় ব্যবহার করে। ফিলিপাইনে এর বাকল সর্দিজনিত গলবিল প্রদাহ এবং মুখের পঁচনে ব্যবহৃত হয়।

এই উদ্ভিদের একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হলো যে জায়গায় এই গাছটি জন্মে সেই জায়গাটাকে চা চাষের উপযুক্ত হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। তাই একে চা নির্দেশক বা টি ইন্ডিকেটর শ্রেণির উদ্ভিদ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

লাল কদম

অপরাজিতা বসু

বর্ষা এলেই বাংলার প্রায় সবজায়গায় কদমের দেখা পাওয়া যায়। বর্ষার এই কদম ফুল নিয়ে সাহিত্যিকরা অনেক কবিতা লিখে গেছেন। সাদা আর সোনালি মিশ্রণের কদম তো আমরা হরহামেশাই দেখি বর্ষায়। কিন্তু লাল রঙেরও যে কদম আছে এ হয়তো আমাদের অনেকেরই অজানা। কদম মূলত দক্ষিণ এশিয়ার ফুল হলেও লাল কদম বাংলাদেশ, ভারত দুই জায়গাতেই বিলুপ্তপ্রায়। এখন পর্যন্ত জানামতে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের পাগলা, গাজীপুরের জয়দেবপুর ও বরিশালে এই তিন জায়গায় বিরল প্রজাতির এই লাল কদম আছে।

কদম গাছের ইংরেজি নাম **Burflower tree** l এছাড়াও এটি নীপ, সুরভি, বৃত্তপুষ্প, সর্ষপ প্রভৃতি নামেও পরিচিত। লাল কদমও দেখতে সোনালী কদমের মতোই দীর্ঘাকৃতি, বহুশাখা বিশিষ্ট। কদমের কান্ড ধূসর, অনেকসময় কালো ও রুক্ষ হয়ে থাকে। পাতা ডিম্বাকৃতির বড়ো বড়ো, তেল চিটচিটে, সবুজ। কদমের একটি মঞ্জরিকে একটি কদম ফুল মনে হলেও তা মূলত অনেকগুলো ফুলের সমাহার। কদম গাছ প্রায় ৪০ বছর বেঁচে থাকে। লাল কদমের বেলায় বৃতি সাদা, দল লাল। লাল কদম এর অর্থকরী দিকের বিষয়ে বলতে গেলে এর কাঠ পেন্সিল কোম্পানি, ম্যাচ, কাগজের ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া এর ছাল জ্বরের উপশম ঘটায়। বীজের মাধ্যমে লাল কদমের বংশবিস্তার সম্ভব নয়; তাই বাংলাদেশে গুটি কলমের মাধ্যমে এই অনিন্দ্য সুন্দর ফুলটির বংশ বিস্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রেণীবিন্যাস -
Kingdom: Plantae
Order: Gentianales
Family: Rubiaceae
Subfamily: Cinchonoideae
Tribe: Naucleeae
Genus: Neolamarckia
Species: *Neolamarckia cadamba*

রাজ শকুন

তাজউদ্দিন আহম্মদ

শকুন।
শব্দটি শুনলে চোখে ভেসে উঠে কিছু ভয়ংকরদর্শন পাখির ছবি। তীক্ষ্ণ ঠোঁটে মাংস খুবলে খাওয়ার দৃশ্য। কারো কারো চোখে সে দৃশ্য রীতিমত বীভৎস মনে হয়। মানুষ তাদেরকে অপয়া, অশুভ প্রতীক ইত্যাদি অপবাদ দিয়েছে। তবে প্রকৃতি জানে, এরা প্রকৃতির কেমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোনো প্রাণীর মৃতদেহ কোথাও পড়ে থাকলেই কোথা থেকে যেন হাজির হয় এরা। দলবেঁধে দ্রুত সাবাড় করে মৃতদেহ।

প্রাকৃতিক পরিচ্ছন্নতাকর্মীর দায়িত্ব পালন করা এই শকুনদের এখন আর সহজে দেখা যায় না। ক্রমাগত বন উজাড় ও গাছপালা কর্তনের ফলে উপকারী পাখিগুলো এখন বিলুপ্তির পথে। সমগ্র বিশ্বেই শকুন বর্তমানে বিপন্ন প্রাণী, তন্মধ্যে কিছু প্রজাতি মহাবিপন্নের তালিকায় নাম লিখিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের। রাজ শকুন তাদের মধ্যে অন্যতম।
পৃথিবীতে প্রায় ১৮ প্রজাতির শকুন দেখা যায়। যাদের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ৬ প্রজাতির শকুন রয়েছে। রাজ শকুন এর মধ্যে একটি মহাবিপন্ন প্রজাতি। International Union for Conservation of Nature বা IUCN কর্তৃক এদেরকে Red list এ বিপন্নপ্রায় প্রজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ১৯৭৪ এবং ২০১২ এর তফসিল ১ অনুযায়ী বাংলাদেশে মহাবিপন্ন ও সংরক্ষিত প্রাণীর তালিকায় রয়েছে এরা।

একসময় পুরো ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও রাজ শকুনের দেখা মিলত। এখন আর এদের দেখা পাওয়া যায় না। আমাদের দেশ থেকে এরা প্রায় বিলুপ্তই বলা চলে।
শ্রেণিবিন্যাস :-

বাংলা নাম : রাজ শকুন।
ইংরেজি নাম : Red-headed Vulture.
বৈজ্ঞানিক নাম : *Sarcogyps calvus.*
জগৎ : Animalia
পর্ব : Chordata
শ্রেণি : Aves
বর্গ : Accipitriformes
পরিবার : Accipitridae
গণ : Sarcogyps
প্রজতি : S. calvus

অন্যান্য শকুনের তুলনায় রাজ শকুনের বর্ণ ও গড়নে চোখে পড়ার মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এদের

চিহ্নিত করা খুব কঠিন নয়। দেখতে বড়ো আকৃতির এই শকুনের দেহের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৭৬-৮৬ সেন্টিমিটার এবং প্রসারিত ডানার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯৯-২৬০ সেন্টিমিটারের মতো হয়। এদের ন্যাড়া মাথায় সুস্পষ্টভাবে লাল বা কমলা রং দৃশ্যমান। গলা ও ঘাড় কুঁচকানো লাল চামড়ায় আবৃত থাকে। চামড়ার উপর ছোট কালো পশম রয়েছে। বুকে সাদা পালক দিয়ে ঢাকা, পিঠ কালচে, ডানা ও লেজ বাদামি কালো রঙের এবং পা ম্লান গোলাপি বর্ণের হয়ে থাকে। পুরুষ শকুনের চোখ কিছুটা সাদা এবং স্ত্রী শকুনের চোখ বাদামি রঙের হয়। বাঁকানো ঠোঁটে গোলাপি আভা দেখা যায়। অন্যান্য শকুনের তুলনায় এরা দেখতে অনেকটা সুন্দর এবং সহজেই তাদের চেনা যায়।

রাজ শকুন প্রধানত শবভোজী। যে-কোনো প্রজাতির প্রাণীর মৃতদেহ ভক্ষণ করে তারা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি রয়েছে তাদের। সাধারণত মাটি হতে ২৫০ থেকে ৩০০ মিটার উপরে বিচরণ করে এরা। এত উপরে থেকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলে সহজে যে-কোনো প্রাণীর মৃতদেহের সন্ধান পেয়ে যায়। দলবেঁধে ছুটে আসে মৃতদেহ ভোজনে। এছাড়া শামুক, পাখির ডিমসহ নানা সরীসৃপও এদের খাদ্যতালিকায় রয়েছে।

দেখতে ভয়ংকর মনে হলেও পাখিগুলো খুবই নিরীহ। চুপচাপ ভোজন সেরে চলে যায়। উঁচু গাছের ডালে সরু কাঠি দিয়ে বাসা বাঁধে তারা। সাধারণত একটিই ডিম পাড়ে এবং মাস দুয়েকের মধ্যে ডিম ফুটে ফুটফুটে বাচ্চা বের হয়। প্রাপ্তবয়স্করা দলবেঁধে আকাশে বিচরণ করে, খাওয়ার সময়ও একত্রে খাবার খায়।

বিরল প্রজাতির এই শকুনগুলো ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। অন্যান্য প্রজাতির শকুনদেরও এখন আর সচরাচর দেখা যায় না। বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ ও খাদ্যের অভাবে শকুনেরা বিলুপ্তির খাতায় নাম লিখিয়েছে। এদেশে হয়তো আর কখনও মিলবে না রাজ শকুনের দেখা।

কুকসিমা

আবু রায়হান

কুকসিমা উদ্ভিদটি শিয়ালমুত্রা এবং ডানকোনী নামেও পরিচিত।

বৈজ্ঞানিক নাম : Cyanthillium cinereum
ইংরেজি : Little ironweed

Poovamkurunnila হচ্ছে Asteraceae পরিবারের Cyanthillium গণের একটি সপুষ্পক ভেষজ বিরুৎ। রাস্তায় হরহামেশাই এ বিরুৎটা চোখে পড়ত কিন্তু এখন তেমন দেখিই না। এটা দিয়ে শৈশবে গলার মালা বানাতাম।

এটি লম্বায় প্রায় ১২০সে.মি.(৪ ফুট) এর মতো হয়। পাতার কিনারার দুইদিক থেকেই কাটা। এর বেশ কয়েকটি জাত হয়।

নাঈম হোসেন ফারুকী

১।

ছেলে বড়ো হয়েছে, বিয়ে শাদী দরকার। ঝামেলা হচ্ছে, ছেলে একটু বেশি লাজুক, প্রেম ফ্রেম করে নাই। এখন বাবা মাকে হন্যে হয়ে মেয়ে খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে।

লাজুক হলে কী হবে, ছেলে কিন্তু দেখতে শুনতে ভালোই, কয়েকদিন আগে ভার্সিটি থেকে বেরিয়েছে। চাকরি এখনো পায়নি, তাতে কী, দুইদিন পরেই কপালে জুটবে একটা, লেখাপড়ায় ছেলে খারাপ না। আকালের বাজার, এমন ছেলের জন্য মেয়ে পাওয়া যায় না!

অবশেষে অনেক খুঁজে এক মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। মেয়ের চেহারা সুরত সেই, এতদিনেও তার বিয়ে শাদী হলো না কেন সেটাই রহস্য। ছেলের মামা এখানে ওখানে খোঁজ খবর নিলেন, কথা সত্য – বিয়ে শাদী দূরে থাক মেয়ের একটা বয়ফ্রেন্ডও নেই। কাহিনি হচ্ছে, মেয়ে একটু বেশি প্র্যাক্টিক্যাল। বিজনেস মাইন্ডের মেয়ে। ভার্সিটি লাইফ থেকে এটা ওটা ব্যবসা করে গাড়ি পর্যন্ত কিনে ফেলেছে।
রূপে গুণে সবদিকে ঝাক্কাস একটা মেয়ে, আবার বিয়েতেও রাজি, ছেলের পরিবার আর না করলো না। বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো।

২।

বাসর রাতের পর ছেলে আর বাড়ি ফিরল না। আসলে আর কোনোদিনই ফিরল না।

চাল চুলোহীন সুন্দর ছেলেকে নিজের কামাইয়ের ভাগ দেওয়ার পাত্রী মেয়ে নয়। সে খুবই প্র্যাক্টিক্যাল।

স্বামী কীভাবে সবচেয়ে বেশি কাজে আসতে পারে তার জানা আছে।

ভালবাসা-বাসির পর স্বামীকে হত্যা করে, কেটে কুটে তার মাংস ফ্রিজে ঢুকালো বউ।

প্রেয়িং ম্যান্টিসের মাংসের পুষ্টিগুণ অনেক। এই মাংস সে নিজে খাবে, খেয়ে পাবে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড। তারপর তার থেকে তার ডিম পাবে সেই পুষ্টি।

ম্যান্টিসের বউ ভারি প্র্যাক্টিক্যাল, কোনো ধরণের ফালতু আবেগের মধ্যে সে নেই!
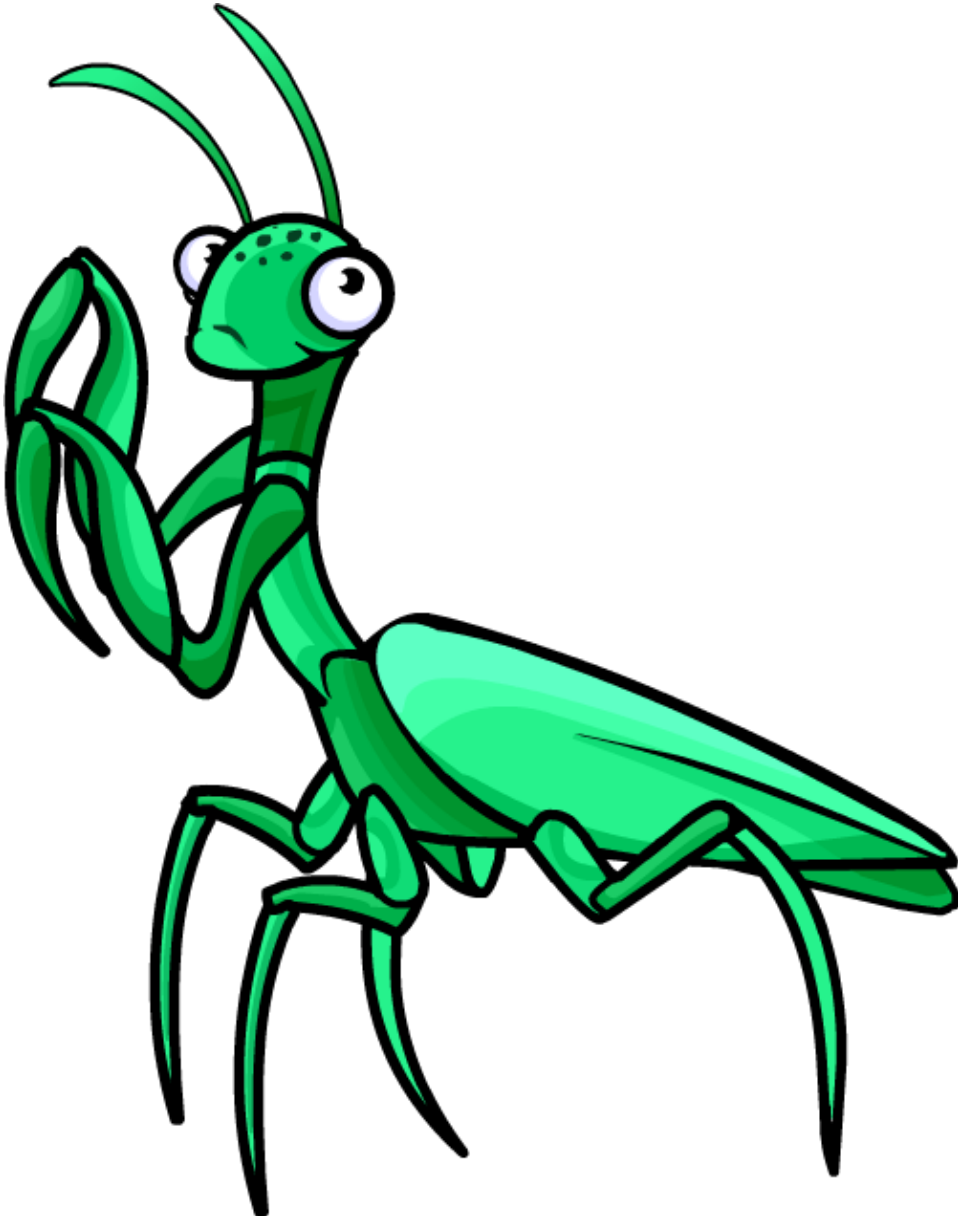
ফুল যদি জায়ান্ট হতো তাহলে কেমন দেখাতো?

২০২০ এর কোভিড বিপর্যয়ের কিছুদিন আগে স্পেনের 'Palacio de Cristal' এ আর্টিস্ট 'Petrit Halilaj' এর প্রথম এক্সিবিশন' এ এই দানব আকৃতির ফুলগুলোর দেখা মেলে। তার কাজগুলো বর্তমানের দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলোর সাথে সম্পর্কিত।

পিঁপড়া না কি মাকড়সা?

নাজমুস সাকিব নাহিন

"আমার পিঠে কীসে সুড়সুড়ি দিচ্ছে? আরে দূর এটা তো পিঁপড়া। হাত ঝাড়া দেওয়ার পরেও মাটিতে পড়ছে না কেন? পিঁপড়াটা মাকড়সার মতো সুতা ছাড়ছে। " আমি তাড়াতাড়ি লেন্স দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম -

-পিপঁড়ার পা আটটি।

-দেহ তিনটি খন্ডে বিভক্ত।

-মাকড়সার মতো সুতা বের হয়।

-মুখের সামনের চোয়াল প্রসারিত করতে পারে।

গুগলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্রাণিটি সম্পর্কে জানতে পারলাম।

প্রাণিটির বৈজ্ঞানিক নাম - Myrmaplata plataleoides.

পিঁপড়ার সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে এর নাম Ant spider. এর বাসস্থান ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। Ant spider আকার,

আকৃতি ও বর্ণের মাধ্যম Weaver ant বা লাল পিঁপঁড়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানে, দুইটা প্রজাতির সাদৃশ্যকে Mimicry বলে। Mimicry কোনো প্রজাতিকে শিকারির হাত থেকে বাঁচাতে কাজ করে। এটাকে Antipredator adaptation বলা হয়। Ant spider খুব সুন্দর ভাবে Antipredator adaptation কাজে লাগিয়েছে। মাকড়সার পা আসলে আটটি নয় ছয়টি এবং সামনের পা অ্যান্টেনা হিসেবে কাজ করে। স্ত্রী মাকড়সা ৬-৭ মিলিমিটার। পুরুষ মাকড়সা ৯-১২ মিলিমিটার।

মাকড়সার সবচেয়ে আশ্চর্য অঙ্গ মুখের সামনে চোয়ালের মতো অংশ। যাকে Chelicerae বলে। যা শুধু পুরুষ মাকড়সার থাকে। এটি লম্বায় দেহের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক হয়ে থাকে। এই Chelicerae এর ভেতরের দিকে তলোয়ারের মতো দেখতে লম্বা Fangs বা বিষদাঁত।

যখন দুইটি পুরুষ মাকড়সার যুদ্ধ লাগে তখন চোয়াল প্রসারিত হয় এবং Fangs বা বিষদাঁত বেরিয়ে আসে। মাকড়সাগুলো গাছ, গাছের পাতা, ঝোপঝাড়ে লাল পিঁপঁড়ার সাথে সংঘবদ্ধ থাকে। শুধুমাত্র নিজেদের লুকাবার স্বার্থে জাল বোনে। এই পিঁপঁড়া মাকড়সা লাফাতেও পারে। যখন নিজের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন মনে করে তখনই লাফায়। লাল পিঁপঁড়াদের মতো এটি মানুষকে কামড়ায় না।
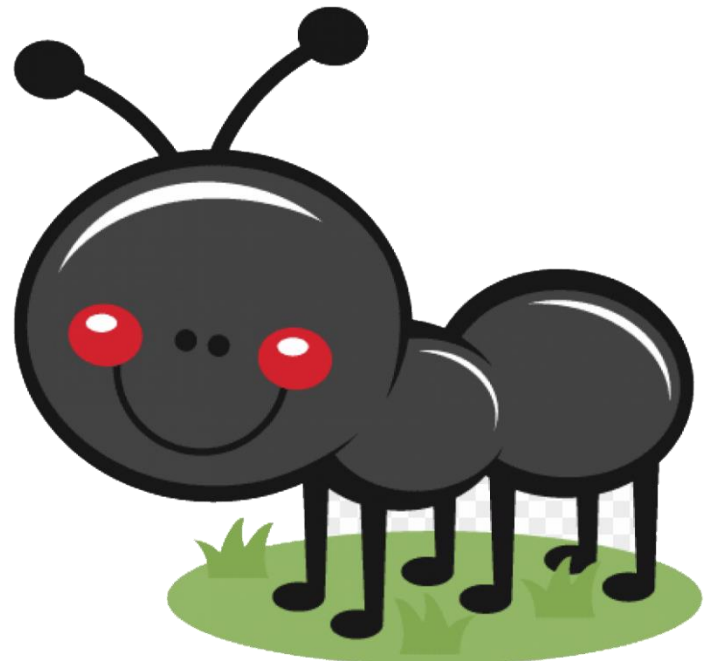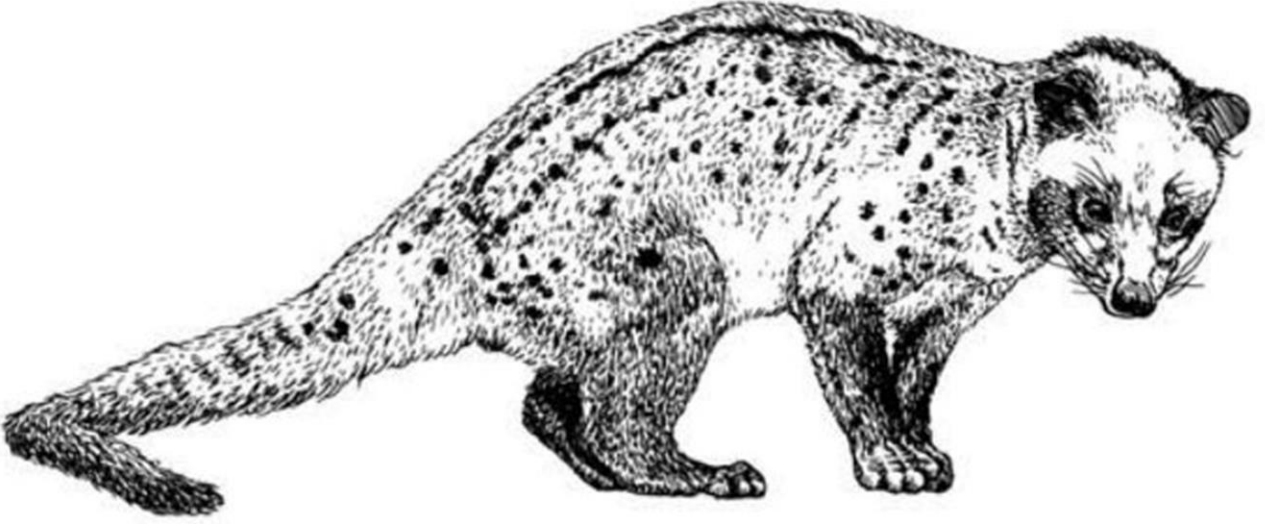
গন্ধগোকুল

জাহিদুল ইসলাম রিয়াদ

নামঃ গন্ধগোকুল (Asian Palm Civet)
স্থানীয় নামঃ লেনজা
বৈজ্ঞানিক নামঃ *Paradoxurus hermaphrodites*

আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগেও 'গন্ধগোকুল' নামের এই প্রাণীটির উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে ছিল আমাদের এলাকার মানুষজন। গৃহস্থেরা তাদের হাস, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি গৃহপালিত পাখিগুলোকে শিয়ালের হাত থেকে রক্ষা করতে যত না সতর্ক ছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি সতর্ক ছিল রাত্রিবেলায় গন্ধগোকুলের খপ্পর থেকে রক্ষা করার জন্য। অবশ্য গন্ধগোকুলেরা ছিল গৃহস্থের চেয়েও এক কাঠি এগিয়ে। এই অঞ্চলে সাধারণত মুরগিগুলোকে গৃহস্থেরা তাদের থাকার ঘরেরই এক কোণে খাঁচায় পুরে রাখে।

কিন্তু গন্ধগোকুলেরা ঘরে ঢুকে তাদের শিকার নিয়ে পালাবেই পালাবে! আশ্চর্যের বিষয়, আমি এখন পর্যন্ত কখনোই এদের চুরি করতে গিয়ে ধরা পরতে শুনিনি। অনেক সময় এরা পুরো পাখিটাকে নিতে না পেরে এর পা, পাখা বা মাথা ছিঁড়ে নিয়ে পালাতো! ফলে অলিখিতভাবে গন্ধগোকুল বা “লেনজানিধন”

স্থানীয় লোকদের একটা অবশ্যকর্ম হয়ে দাঁড়ায়। এতে করে প্রাণীটি মাত্র কয়েক বছরের ব্যাবধানে বিপন্নপ্রায় হয়ে পড়ে। বর্তমানে 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ২০১২' এর তফসিল-১ অনুসারে গন্ধগোকূলকে সংরক্ষিত প্রাণী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

গন্ধগোকুল নিশাচর বন্যপ্রাণী ও একা বাস করে। এদের বসবাস মুলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায়। এরা মাঝারী সাইজের প্রাণী, পুরো দেহের দৈর্ঘ্য ৯২-১১২সেন্টিমিটার যার মধ্যে লেজেরই দৈর্ঘ প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার। স্থানীয় ভাবে তিন রকমেরর গন্ধগোকুল দেখা যেত, ধূসর, কালো, ধূসর গায়ে কালো ফুটি এবং দুর্লভ মুখোশধারী গন্ধগোকুল!

এরা দিনের বেলায় বনে-জঙ্গলে বিভিন্ন গাছের মাটির সমান্তরালে থাকা ডালপালাগুলোতে ঘুমোয়। এসময় তাদের লেজটা নিচের দিকে ঝুলে থাকে। এর বেশ বড়সড় লেজটির জন্যই হয়তো স্থানীয় নামকরণ করা হয়েছে "লেনজা"। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে প্রাণীটি মূলত ফলখেকো হলেও স্থানীয়ভাবে এরা মাংশাসী হিসেবেই কুখ্যাত। এছাড়াও এরা পোকামাকড়, ডিম, পাখির বাচ্চা, তাল ও খেজুড়ের রস খেয়ে থাকে।
ইন্দোনেশিয়ায় গন্ধগোকুলদের কফি বিন খাওয়ানো হয় এবং তার মল থেকে উন্নতমানের "কোপি লুয়াক" বা গন্ধগোকুল কফি বানানো হয়। এই কফির মূল্য প্রতি কেজি ৫০০ থেকে ৭০০ মার্কিন ডলার!

"গন্ধগোকুল" নামকরণের কারণ হলো এর শরীর থেকে পোলাও চালের মতো সুন্দর গন্ধ বেরোয়। আর এই গন্ধটা এতটাই তীব্র যে, বেশ বড় অঞ্চল জুড়ে পোলাওয়ের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পরে। আগে প্রাণীর এই গন্ধগ্রন্থীর রস ব্যবহার করে সুগন্ধী তৈরি করা হতো। প্রজননকালে স্ত্রী ও পুরুষ গন্ধগোকুল এই গন্ধ ছড়িয়ে নিজেদের সীমানা নির্ধারণ করে এবং এই সময়টা তারা একসঙ্গে কাটায়। আমাদের এলাকায় এরা কাঠবিড়ালীর মতো বাসা তৈরি করে সেখানে বাচ্চা প্রসব করে। এদের প্রজননঋতু বছরে দুইবার এবং প্রতিবারে ৩টি করে বছরে ৬টি বাচ্চা প্রসব করে। মা লেনজা তার লেজ দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরি করে এবং সন্তানেরা কখনোই এই বৃত্তের বাইরে আসে না।

ঠিক যখন গন্ধগোকুল একটি অর্থনৈতিক সম্ভাবনার উৎস হয়ে উঠেছে তখনই আমাদের অঞ্চল থেকে এই প্রাণীটি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে (কিংবা হয়ে গেছে)। হয়তো 'কোপি লুয়াক' চাষ করার সম্ভাবনা আমাদের দেশেও ছিল, কিংবা এর গন্ধগ্রন্থী থেকে আরও উন্নত সুগন্ধী তৈরির সুযোগ! আমাদের ইকোসিস্টেমের ক্ষতিকর পোকা ও ইঁদুর ধ্বংস করে ইতিবাচক অবদান রাখছিল এই নিরীহ ভীতু প্রাণীটি। কিন্তু প্রকৃতিপ্রদত্ত হাজারো উপহারের মতো অতি অবজ্ঞা ও ঘৃণাভরে আমরা বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছি গন্ধগোকুলদের। এই অমার্জনীয় কাজের প্রতিফল তো আমাদের পেতেই হবে। আজ হোক বা কাল।
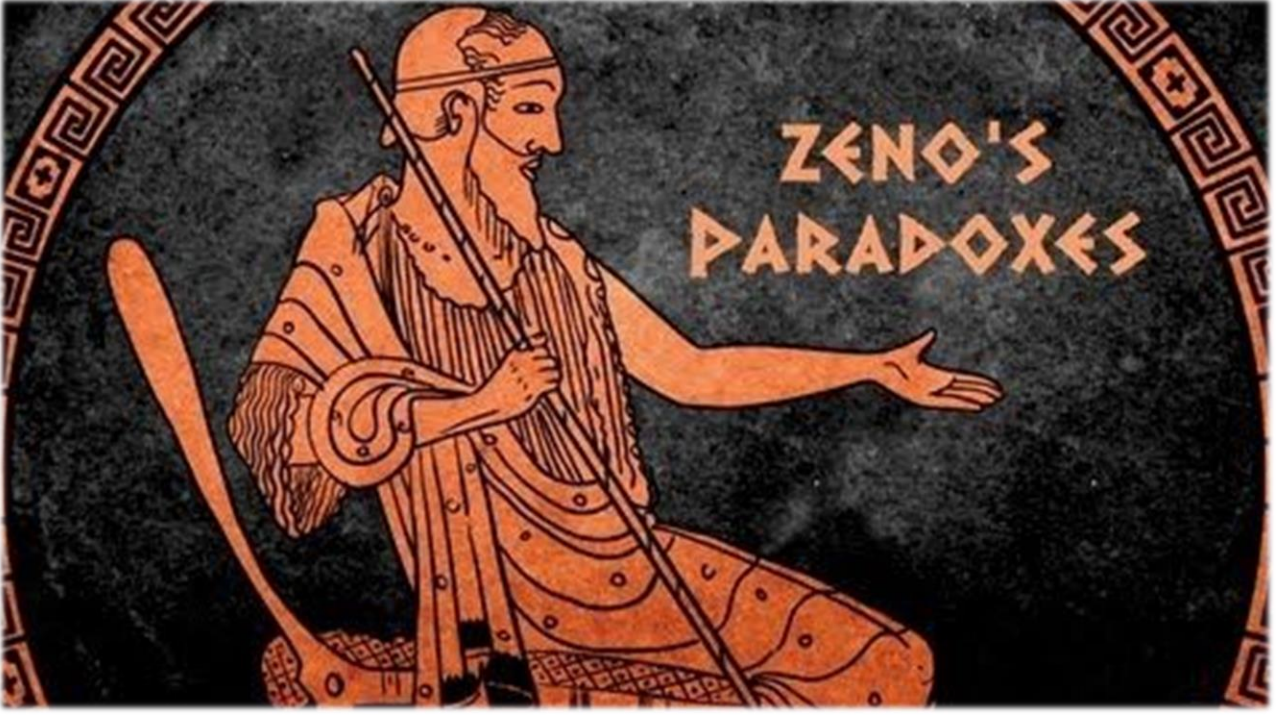
জেনোর প্যারাডক্স

প্রজেশ দত্ত

এক রৌদ্রস্নাত দিনে আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। অলস সময়, অলস প্রকৃতি। হঠাৎ আপনি দুটি ফলক দেখতে পেলেন। দুই ফলকে লেখা সংখ্যা থেকে বুঝলেন এক ফলক থেকে আরেক ফলকের দুরত্ব ১ কিমি। আপনার মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো। অলস মস্তিষ্কে তো কতরকমই বুদ্ধি আসে। আপনি ভাবলেন, প্রতিবার নিজের গন্তব্যের দুরত্বের অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করে আপনি থামবেন। এভাবে পৌছাবেন এক ফলক থেকে আরেক ফলকে। একটু বিস্তারিত বলি।

আপনাকে অতিক্রম করতে হবে ১ কিমি দুরত্ব। এজন্য প্রথমে আপনি ১/২ কিমি দুরত্ব অতিক্রম করে থামলেন। আর বাকী আছে ১/২ কিমি। এবার আপনি ১/৪ দুরত্ব অতিক্রম করে আবার থামলেন। বাকী আছে ১/৪ কিমি। আপনি এবার ১/৮ কিমি অতিক্রম করে আবার থামবেন। এভাবে ১/১৬, ১/৩২, ১/৬৪...... অতিক্রম করবেন। অর্থাৎ প্রতিবার আপনি থামার পর যে দূরত্ব অবশিষ্ট থাকবে তার অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করে আবার থামবেন। এভাবে কি গন্তব্যে পৌছাতে পারবেন কখনো? ভেবে দেখুন তো, প্রতিবারই তো কিছু করে দূরত্ব অবশিষ্ট থাকবে। এভাবে অসীম সংখ্যকবার চলবেন। তাও পৌঁছাবেন না!

আসলে বাস্তবে কিন্তু পৌছে যান। এমন বিভ্রান্তি হয় না। কেন হয়না সেটা শেষে বলব। ম্যাথমেটিকালি এমন হয় যেন আপনি কখনো পৌঁছাতে পারবেন না। এই প্যারাডক্স জেনোর 'দ্বিবিভাজন প্যারাডক্স' নামে সমাদৃত। এর আরেকটি নাম আছে, রেস কোর্স প্যারাডক্স। যাহোক, দার্শনিক জেনো যখন এই প্রশ্নের আবির্ভাব ঘটান তখন আসলে অসীম ধারার সমাধান

ছিল না। এজন্য এটা ম্যাথমেটিকালি সলভ কেউ করতে পারেননি। পিথাগোরাস এমন গণিতকে 'শয়তানের গণিত' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।
যাহোক, উপরের প্যারাডক্স থেকে আমরা নিচের সিরিজ তৈরী করতে পারি।

১/২+১/৪+১/৮+১/১৬+১/৩২+১/৬৪+১/১২৮.........

এটা একটি অসীম ধারা। কারণ এর শেষ পদ কততম আপনিও জানেন না। তো এই ধারার সমষ্টি কত?

তার আগে একটা বিষয় বলি। অসীম ধারার আবার কনভার্জেন্স, ডাইভারজেন্স বিষয় আছে। বাংলায় অভিসৃতি এবং অপসৃতি। ধারাটি যদি এমন হতো-

২+৪+৮+১৬+৩২...... তাহলে এটা অপসৃত। এর কোনো সমষ্টি নেই। এর n তম পদ 2^n যেখানে n অসীম হলে শেষ পদও অসীম।

উপরে যে ধারাটি জেনোর প্যারাডক্স থেকে বেরিয়ে আসে, তার n তম পদ (1/2)^n যেখানে n যদি অসীম হয় তবে শেষ পদ হয় ০. অর্থাৎ এই ধারার প্রথম আর শেষ পদ জানা। তাই এটার সমষ্টিও বের হয়ে যাবে সূত্র দিয়ে।

সূত্রটা হলো: S= a÷(1-r) যেখানে r হলো দুইটা পাশাপাশি অবস্থিত পদের একটি অপরটির কত গুণ সেটা (পরবর্তী পদকে তার পূর্ববর্তী পদ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে)। ধারা কনভার্জেন্স হলে -1<r<1 (r≠0) এবং ডাইভার্জেন্স হলে r>1 হয়। আর a হলো ধারার প্রথম পদ।

তাহলে এই ধারার a হলো ১/২ এবং r হলো ১/২। তাহলে সূত্রে মান দুটি বসিয়ে দিলাম। S এর মান বের হলো ১। এটাইতো কাঙ্খিত দূরত্ব ছিল। আপনি এই দুরত্বই অতিক্রম করতে চাইছিলেন। ১ কি.মি। এবার গাণিতিক ভাবেও সমাধান হয়ে গেল এই ঝামেলার।

আপনার মাথায় আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে। বাস্তবে অসীম সংখ্যক বার চলবেন কীভাবে সেটা। আচ্ছা দূরত্ব ছোটো হতে হতে হতে ধরুন ১০ সেমি হলো। এবার আপনাকে ৫ সেমি অতিক্রম করতে হবে। আপনি আপনার ২০ সেমি পা নিয়ে ৫ সেমি কিভাবে অতিক্রম করবেন? টেকনিক্যালি আপনি তখন গন্তব্যে এমনিও পৌঁছে গেছেন কারণ আপনার পা গন্তব্যের সীমারেখায়। আর আগেই বলেছি। এই প্যারাডক্সটা ম্যাথমেটিকালি ছিল, জেনোও জানতেন বাস্তবে এমন হয় না, কিন্তু গণিত? গণিত কী বলে?

রাঙা তেঁতুলের তত্ত্বকথা

জয়শ্রী রায় পূজা

ভর দুপুরে চুপচাপ গাছের নিচে বসে আছি। হুট করে মাথায় কি যেন একটা পড়লো। চমকে উঠে দেখি তেঁতুল। তেঁতুল দেখলে কার না জিভে জল আসে। আমারও এলো। তেঁতুল ভেঙে মুখে দিতে যাব। ওমা এ তো লাল রঙের তেঁতুল। ভয় পেয়ে একদৌড়ে ঘরে এসে মামাদের বলার পর তারা একচোট হেসে নিয়ে শুরু করলো রাঙা তেঁতুল এর তত্ত্বকথা। আজকের বিষয় লাল তেঁতুল।

Tamarindus Indica চলতি কথায় তেঁতুল আমরা কে না চিনি। সেই তেঁতুল এরই একটি দুর্লভ প্রজাতি হলো এই রাঙা তেঁতুল। এই তেঁতুলের লাল রঙের কারণ হলো এন্থোসায়ানিন (Anthocyanin) নামক এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ। এই এন্থোসায়ানিন সহজেই পানিতে দ্রবণীয়। যার কারণে আপনি কিন্তু পাকা জামের মধুর রসের বদলে রাঙা তেঁতুল দিয়েও মুখ রঙিন করে ফেলতে পারবেন।

সাধারণত ১২ মাসই গাছে এই তেঁতুল দেখা যায়। তবে বৈশাখ মাসে গাছে ফুল আসে, আর আশ্বিন কার্তিক মাসে গাছে ফল আসে। মাঘ মাস আসতে আসতে রাঙা

তেঁতুল পেকে আরো রাঙা হয়ে যায়। এই তেঁতুল গাছ দেখতে একদম সাধারণ তেঁতুল গাছের মতোই। যদি পাশাপাশি একটা সাধারণ তেঁতুল গাছ এবং একটি লাল তেঁতুল গাছ থাকে তাহলে তেঁতুল না ভাঙা অব্দি বোঝা যাবে না কোন গাছের তেঁতুল লাল আর কোনটি সাধারণ তেঁতুল।

কাচা রাঙা তেঁতুল এর স্বাদ সাধারণ তেঁতুল এর তুলনায় একটু কম টক। তবে পাকলে এই তেঁতুল একটু মিষ্টি খেতে লাগে।

এই লাল তেঁতুল এর ব্যবহার বহুমুখী। এর বীজ থেকে উত্তলিত তেল এবং মাড় থেকে টেক্সটাইল শিল্প ও পেইন্ট শিল্পে এই প্রাকৃতিক রং কৃত্রিম রং এর পরিবর্তে ব্যবহার হয়। খাদ্য শিল্প ও খাদ্যে ফুড কালার হিসেবেও ব্যবহৃত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ,অন্ধ্রপ্রদেশ এর বিভিন্ন অঞ্চলে এই তেঁতুল গাছ খুজে পাওয়া গিয়েছে যা সংখ্যায় অতি সামান্য। এই প্রজাতির তেঁতুল নিয়ে এখনো তেমন কোনো গবেষণাপত্র প্রকাশ না হওয়ায় এর সম্মন্ধে বেশি কিছু জানা যায়নি।

সুপারফুড সজনে

মোঃ আজমল হোসেন

সজনে একটি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। যার বৈজ্ঞানিক নাম *Moringa oleifera*। সজিনা একটি অতি পরিচিত দামি এবং সুস্বাদু একটি সবজি। এর উৎপত্তিস্থল পাক-ভারত উপমহাদেশ।

সজনের কাঁচা লম্বা ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়, পাতা খাওয়া হয় শাক হিসেবে। দেশি-বিদেশি পুষ্টি বিজ্ঞানীরা সজিনাকে 'অত্যাশ্চর্য বৃক্ষ' বা 'Miracle Tree' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এর পাতায় আট রকম অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডসহ ৩৮% আমিষ আছে যা বহু উদ্ভিদেই নেই। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুষ্টিকর হার্ব। গবেষকরা সজনে পাতাকে বলে থাকেন 'নিউট্রিশনাল সুপার ফুড'।

সজনে পাতা ভিটামিন 'এ' এর বিরাট উৎস হিসেবে কাজ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম সজনে থেকে ৬৪ কিলো ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।
প্রতি গ্রাম সজনে পাতায় একটি কমলার চেয়ে সাত গুণ বেশি ভিটামিন সি, দুধের চেয়ে চার গুণ বেশি ক্যালসিয়াম ও দুই গুণ বেশি প্রোটিন, গাজরের চেয়ে চার গুণ বেশি ভিটামিন 'এ' এবং কলার চেয়ে তিন গুণ বেশি পটাশিয়াম বিদ্যমান।

ফলে এটি অন্ধত্ব, রক্তস্বল্পতা, অ্যাজমা, কিডনি সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস সমস্যা সহ বিভিন্ন ভিটামিন ঘাটতি জনিত রোগের বিরুদ্ধে বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে সজনে পাতা রূপচর্চায়ও ব্যবহৃত হচ্ছে। সজনে পাতার ২৫ শতাংশই প্রোটিন। কিউবাতে সজনে ব্যবহার করে ক্যান্সার প্রতিরোধী ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা সফলতা পেয়েছেন।
সজনের সাহায্যে সহজেই দৈনন্দিন পুষ্টির চাহিদা মেটানো সম্ভব।

সতর্কতা:
সজনে এর মূল অনেক সময় বিষাক্ত হতে পারে, যা স্নায়ুকে অবশ করে দিতে পারে। তাই খাওয়ার ক্ষেত্রে এটি বর্জন করাই শ্রেয়।এছাড়া এর বীজ মাছ এবং র‍্যাবিট এর জন্যেও বিষাক্ত হতে পারে। তাই সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।
গর্ভবতী অবস্থায় সজনে খাওয়াই উচিত নয়। ডায়াবেটিস অবস্থায় যারা জানুভিয়া (সিটাগ্লিপটিন) বা সাইটোক্রোম পি ৪৫০ পরিবারের সাবস্ট্রেট ঔষধগ্রহণ করেন তাদের সজনে খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

অচেনা উদ্ভিদকাহন

মার্ফি মেসবাহ্

বেগুনি ধান

এক বিশাল সবুজ ধানক্ষেতের মাঝে এক টুকরো বেগুনি রঙের ধানের ক্ষেত দেখতে বেশ চমৎকারই লাগবে তাই না? তবে এরকম বেগুনি ধানক্ষেত কি আদৌ রয়েছে, এই প্রশ্ন সবার মনেই উঁকি দিচ্ছে। তাও আবার 'বেগুনি রঙের ধানক্ষেত', নাম শুনে চমকে গেলেন না তো? কোনদিন কি দেখেছেন বা শুনেছেন এরকম বেগুনি রঙের ধানের কথা?
বেশিরভাগই বোধহয় শোনেননি বা জানেন না।

আসলে এই ধানের পাতার রং যে শুধু বেগুনি তাই নয় ধান ও চালও বেগুনি রঙের। তবে কচি পাতাগুলো প্রথমে সবুজ থাকে ও পরে সময়ের সাথে সাথে গাঢ় বেগুনি রং ধারণ করে। আর সবচেয়ে বড়ো ও মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটি বিদেশি কোনো জাত নয় বরং আমাদের দেশীয় ধানের জার্মপ্লাজম (শুক্রাণু প্রাণরস)।

আমাদের দেশের অন্যতম বিজ্ঞানী ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস জানান, "এ রঙের ধান আমাদের দেশে বহু আগে থেকেই আছে। বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট অনেক আগেই এ রঙের ধান উদ্বোধন করেছে। বিজ্ঞানীরা এটাকে পারপেল চেক বলেন।"

তবে এই ধানের বিষয়টি সম্প্রতি ২০১৮ সালেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। আর সম্প্রতি চাষাবাদও শুরু। বেশিরভাগেরই ধারণা গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে এই ধান সর্বপ্রথম চাষ হয়। আর সেই এলাকার মিসেস দুলালি'র নামানুসারে এর নাম রাখা হয়েছে 'দুলালি ধান'। তবে এলাকাভেদে এই নামের ভিন্নতা রয়েছে। যেমনঃ কুমিল্লার মনোগ্রামের কৃষক মঞ্জুর হোসেন এই ধানের নাম দিয়েছেন 'বঙ্গবন্ধু ধান'। অন্যান্য এলাকায়ও এই ধান চাষ করা হচ্ছে।

তবে "কেন এই ধানের রং বেগুনি?"
গবেষণায় জানা গেছে, অতিরিক্ত মাত্রার এন্থোসায়ানিন ও অক্সিডেন্টের কারণে এই ধানের রং বেগুনি হয়। এছাড়া পাতার রঙের জন্য দায়ী প্লাস্টিড।
এই ধানের আকৃতি মোটা তবে ভাত অনেক সুস্বাদু।

এছাড়া এই ধান চাষ করার সুবিধা হচ্ছে: এর পরিচর্যা কম, রোগবালাই কম বা নেই বললেই চলে, জীবনকাল অন্যান্য ধানের তুলনায় সংক্ষিপ্ত তথাপি ১৫৫ দিন, ফলন ভালো অর্থাৎ শতাংশে আনুমানিক ২০ কেজি হতে পারে এবং এর পুষ্টিগুণ অনেক।
তাহলে জেনে নেওয়া যাক এর পুষ্টিগুণ সম্পর্কে:

- এতে রয়েছে প্রচুর ফাইবার ও ভিটামিন।
- নিয়মিত এর ভাত খেলে হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে।
- এর পাতার রস ডায়াবেটিস ও অ্যালজাইসার নিরাময়ে কার্যকরী।

বর্তমানে এই ধানের চাষাবাদ ক্রমেই বাড়ছে।

শুষনি শাক

অনেকেই বাড়ির আশেপাশে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় এই ছোট্ট উদ্ভিদটিকে দেখতে পাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই এটিকে একধরনের আগাছা কিংবা ঘাস হিসেবে জানেন। আসলে এটি হচ্ছে এক ধরনের উপকারী শাক। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই শাকটি সম্পূর্ণই গুণে ভরপুর।

শুষণি শাক হচ্ছে এক ধরনের জলজ ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ। অন্যান্য অঞ্চলেও এই নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নাম *Marsilea minuta*। উদ্ভিদটি লতানো। পর্ব থেকে এর শিকড় মাটিতে প্রবেশ করে বিস্তার লাভ করে। পাতা যৌগিক। পত্রবৃন্তের একটা বিন্দু থেকে চারদিকে চারটি সমান আকৃতির পাতা জন্মায়। অর্থাৎ থোকা থোকা পাতা জন্মে। পাতার রং সবুজ এবং পাতা অনেক নরম। এরা রেণুর মাধ্যমে কিংবা অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে।
গ্রাম বাংলার ধানক্ষেতের আশেপাশে, পুকুরপাড়ে আর অন্যান্য যে-কোনো ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় বর্ষাকালে জন্মাতে দেখা যায়। এটি ভারত, চীন, জাপান, আফগানিস্তান, ভিয়েতনাম, ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশেই জন্মে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু অঞ্চলে এটিকে আগাছা মনে করলেও অন্যান্য দেশগুলোতে (নাম পূর্বেই উল্লেখিত) গত ১০০ বছর ধরে ঔষধি গুণাবলির কারণে বিশেষভাবে চাষ করা হচ্ছে।

শুষনি শাকের উপকারিতা বা ঔষধি গুণাগুণ অনেক। আমরা একদিক থেকে যেমন শাক হিসেবে গ্রহণ করি তেমনি আমাদের বিভিন্ন রোগের যেমন: শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, কাশি, কফ, ডায়াবেটিস, ডায়রিয়া, উচ্চ রক্তচাপ, চর্মরোগ, এপিলেপ্সি (মস্তিষ্কজনিত রোগ) নিরাময়ে বিপুলভাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া যাদের ইনসম্যানিয়া বা অনিদ্রা আছে তারা এই উদ্ভিদের পাতার রস খেলে অনিদ্রা খানিকটা কেটে যাবে। এমনকি স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও এটি বেশ কার্যকরী।

ভাটফুল

মার্ফি মেসবাহ্

যারা গ্রাম-বাংলায় থাকেন কিংবা গ্রামে বড়ো হয়েছেন তারা এই ফুলটিকে চেনেন। হয়তো নামও জানেন অনেকেই আবার জানেন না। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক এই মিষ্টি ফুলটির সম্পর্কে।

গ্রামের মেঠোপথে, রাস্তাঘাটে, পুকুরপাড়ে কিংবা যে-কোনো ঝোপঝাড়ে, রেললাইনের সাইডে এই ফুলগুলোকে দেখা যায়। এই ফুলগুলোর অধিকাংশই বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের প্রায় সব অঞ্চলেই জন্মে।

এই মিষ্টি ফুলগুলোর নাম হলো 'ভাঁটফুল'। আরেক নাম 'ঘণ্টাকর্ণ'। অঞ্চলভেদে এটি 'বনজুঁই', 'ভাঁটিফুল','ঘেঁটু' নামেও পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম Clerodendrum viscosum। এগুলো আসলে গুল্মজাতীয় সপুষ্পক ফুল। বুনোফুলও বটে, তাই যে-কোনো স্থানে কোনোরকম পরিচর্যা ছাড়াই এরা বেড়ে ওঠে।

এই বুনোফুল উদ্ভিদ মাটি থেকে বেশি উপরে ওঠে না। এক পক্ষল সবুজ রংয়ের তেতো পাতা রয়েছে যা ৪ ইঞ্চি

থেকে ৭ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতার আগা সরু, অনেকটা পান পাতার মতো। পাতা খসখসে ও রোমে বিস্তৃত। ফুলগুলো কাণ্ডের শীর্ষে ফোটে। কাণ্ডগুলো ২ থেকে ৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। ফুলগুলোর রং সাদা, সাথে হালকা বেগুনি রংয়ের মিশেলও রয়েছে। ফুলের পাঁপড়ি থাকে পাঁচটি। সব মিলিয়ে বেশ সুন্দর দেখতে এই বুনো ফুলগুলোকে। এই ফুলগুলো বসন্ত কালে ফোটে। ফুল আসার পর ফলও ধরে বেশ। ফলগুলো গোলাকার ও ছোট ছোট। এরা কালচে বর্ণের হয়ে থাকে।

এই বুনো ফুলটির ভেষজ ও ঔষধী গুণাবলিও রয়েছে। যেমন:

i) এর পাতা লিভার সমস্যা, ডায়রিয়া ও মাথাব্যথায় ব্যবহার করা হয়।
ii) এর পাতা ও শিকড় চর্মরোগ, স্কেবিস, ম্যালেরিয়া, ডায়াবেটিসের প্রতিষেধক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।
iii)সাপ বা বিচ্ছুর কামড়ের ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা হয়।
iv)টিউমার, ক্যান্সার নিরাময়েও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বানান সংশোধন: আফীফাহ্ হক মীম

প্রজাপতি আর মথ

নাঈম হোসেন ফারুকী

প্রজাপতি আর মথ দুইটাই একই ফ্যামিলির মানুষ। দেখতে শুনতেও কাছাকাছি। কীভাবে চেনা যায়?

১। প্রজাপতি বসলে ডানা ভাজ করে উপরে তুলে রাখে। মথ বসে ডানা ছড়িয়ে।
২। প্রজাপতির শুর হয় লম্বা, সরু সরু। মথের রোমশ, পালকের মতো।
৩। মথ সাধারণত রাতে বের হয়, প্রজাপতি দিনে। এটা অবশ্য অতো জোড় দিয়ে বলা যায় না।
৪। পিউপা অবস্থায় মথ সিল্কের কোকুনে ঢুকে। প্রজাপতির কোকুন সিল্কের না।

ছবিতে সবচেয়ে বড় প্রজাপতি কুইন আলেকজ্যান্ডার প্রজাপতি, আর সবচেয়ে বড় মথ অ্যাটলাস মথ দেখা যাচ্ছে। বলতে হবে কোনটা কি।

টিম বিসিবির প্রথম ট্যুর: পদ্মবিল ভ্রমন

সমুদ্র জিত সাহা

২০২০। করোনাভাইরাসের আতঙ্কে সবাই বাড়িতে আটকা। বাসায় বসে বসে ফেসবুক স্ক্রল করে লকডাউন শেষে কোথায় কোথায় ঘুরবো সেই তালিকা বড়ো করা ছাড়া বিশেষ কাজ ছিল না। এমন সময় ফেসবুকে খুব হাইপ ওঠল পদ্মবিলের ব্যাপারে। নাঈম ভাইকে বললাম যাবেন কিনা। এক কথায়ই রাজি।

বললেন কবে কেমনে যাবা ঠিক করো। লোকেশন কুমিল্লার দক্ষিণগ্রাম, পদ্মবিল। একটা ছোটো গাড়ি ভাড়া করে আমি, আমার ভাই, বিসিবি ও ব্যাঙাচির কভার আর্টিস্ট সাবিত আর অবশ্যই গ্রুপের ফাউন্ডার নাঈম ভাই, আমাদের সীমিত পরিসরের 'টিম বিসিবি'। উত্তরা থেকে গাড়িতে উঠে খিলগাঁও এ নাঈম ভাইকে নিয়ে রওনা দেই কুমিল্লার উদ্দেশ্যে। প্রচন্ড রোদ আর জ্যামের মধ্যে নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘন্টা পর পৌঁছাই দক্ষিণগ্রামে। পথের মধ্যে আবার আমি অসুস্থ হয়ে

পড়ি। কুখ্যাত 'কলা কেলেংকারি', সে বিষয়ে অন্যদিন লেখবো হয়তো।

ক্লান্ত অবস্থায় লেট করে কুমিল্লা পৌঁছেই দেখি বিসিবির অন্যতম মেম্বার ও লেখক জহিরুল ইসলাম ভাই, সাথে কুমিল্লাবাসী বিসিবির আরো দুইজন মেম্বার। জহিরুল ভাই আগে থেকেই সবার জন্য খাবার কিনে নিয়ে এসেছিল, যার কারণে অনেক সময় বেঁচে যায়, পদ্মবিলের কাছেই গাছের ছায়ার তলে এক ফুচকার

দোকানে বসে জহিরুল ভাইয়ের আনা খিচুড়ি খাওয়া শেষে এবার নৌকায় উঠে পদ্মবিল ঘোরার পালা।
নৌকা ভাড়া করে প্রখর রোদে বিলের মধ্যে যাত্রা শুরু। ফার্স্ট ইম্প্রেশন (ফেসবুক ট্রেন্ড কীনা!) বিলটা বিশাল, সত্যিই অনেক বড়ো আর বাতাস। যদিও কড়া রোদে আরেকটু হলেই কারো মাইগ্রেন কারো সাইনাসের ব্যথা

শুরু হয়ে যেত। একটু পর কোনো বিশাল মেঘের কল্যাণে রোদের তাপ থেকে একটু বাঁচি।

পদ্মবিলের সবচেয়ে ইম্প্রেসিভ জিনিস, আর কী, অনেকগুলো পদ্ম! গোলাপী, হলদে সাদা, নীল বিভিন্ন রঙের পদ্ম সব একসাথে, দেখতে অসাধারণ সুন্দর। সাথে পদ্মগুলোয় ওড়ে বেড়াচ্ছে লাল, সবুজ, নীল, আকাশী, হলুদ... রঙের ফড়িং। পদ্মর চেয়ে ফড়িংগুলোই দেখতে বেশি আকর্ষণীয় ছিল। হঠাৎ করে পাশে সাংবাদিকের নৌকা ভিড়ে ইন্টারভিউ নেওয়ার চেষ্টা করছিল, মাঝি গান বাজাচ্ছিল...
সেসবের ডিটেইলে আর না যাই। মাঝির রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী পদ্মফুলের ফল খেয়ে দেখেছিলাম, এটা লিগ্যাল কিনা জানি না। খেতে পানিফলের মতো ছিল। পদ্ম ছাড়াও বিলের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য ছিল ভালোই। ব্লাডারওর্ট গাছ হিসেবে সন্দেহ হয়েছিল একটাকে, যদিও নিশ্চিত হতে পারিনি।
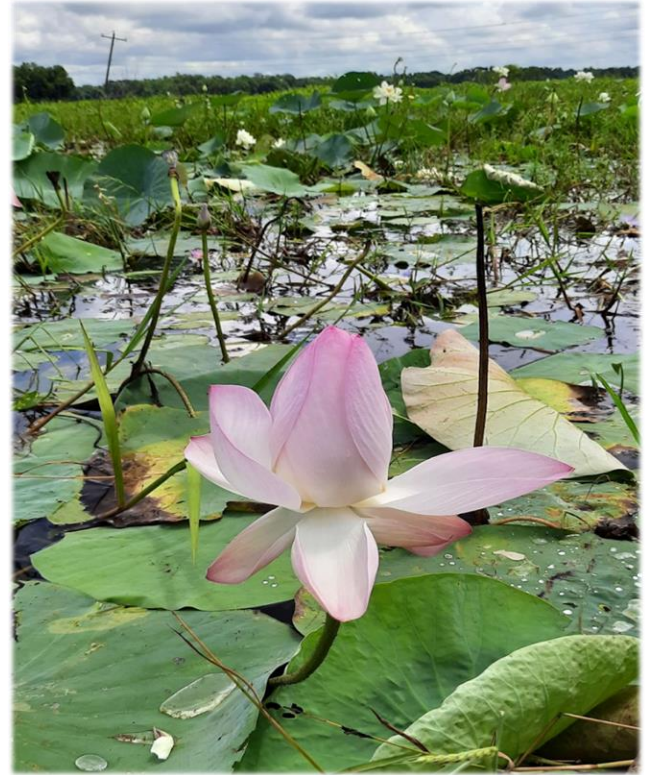
তবে সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার ছিল মানুষের আচরণ। এদেশে কোনো পর্যটন স্থান ভাইরাল হলেই লাখ খানেক লোক মুহূর্তেই পৌঁছে যায় সেখানে। আর গিয়ে নিজেদের প্রতিনিধি স্বরুপ ফেলে আসে সিগারেট আর বিরিয়ানির প্যাকেট, উচ্চস্বরে বাজায় হিন্দি গান! এরকম চালিয়ে যেতে থাকলে পদ্মবিলের মতো

প্রাকৃতিক স্পটগুলো আর টিকবে না। আর প্রতিটা নৌকাই দেখি পদ্মফুল ছিড়ছিল, যেটা অবৈধ, সবাই একটা করে পদ্মফুল ছিড়লে বিল ফাকা হয়ে যাবে কয়েকদিন পদ্মবিলের মতো প্রাকৃতিক স্পটগুলো আর টিকবে না।আর প্রতিটা নৌকাই দেখি পদ্মফুল

ছিড়ছিল, যেটা অবৈধ, সবাই একটা করে পদ্মফুল ছিড়লে বিল ফাকা হয়ে যাবে কয়েকদিনেই। আপনারা কেউ পদ্মবিল সহ যে-কোনো প্রাকৃতিক ট্যুরিস্ট স্পটে ভ্রমনে গেলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষায় সচেষ্ট থাকবেন।

নাঈম হোসেন ফারুকীর দৃষ্টিতে

২ ঘণ্টার মতো নৌকা ভ্রমন শেষে কুমিল্লা শহরে এসে খাওয়া শেষে শালবন ঘোরার মতো সময় ছিল না, তাই গরিবের ওভার প্রাইসড ডাইনোপার্ক ঘুরে দেখতে গেলাম।

বাংলাদেশের সবকিছুর মতোই ডাইনোপার্কের ডাইনোসরগুলো ছিল কমবেশি ভাঙা। সবচেয়ে সুন্দর ডাইনোসরের মডেলটা ছিল বাইরে 'ঝোলানো'। ভেতরেরগুলো মুভমেন্ট সেন্সর ইউজ করে সামনে মানুষ গেলে ডাইনোসরগুলো মাথা আর লেজ একটু নড়াতো, যদিও 'কারিগরি ত্রুটি' এর কারণে বেশিরভাগ ডাইনোসরই আমাদের দেখে স্থিরই ছিল। টি-রেক্স বাদে বাকিগুলোর সাইজ ঠিক নেই। প্রায় কোনো মডেলেরই চেহারা অ্যাক্যুরেট ছিল না।

আর ফেরার পথে কুমিল্লার ইকো পার্কে একটু ঢু মেরে আসলাম। এটায় তেমন বিশেষ কিছু ছিল না, শুধু ক্লান্ত টুরিস্টদের লেবুর শরবত (জহিরুল ভাইয়ের পক্ষ থেকে) আর ক্লান্ত জহিরুল ভাইয়ের শোয়ার জন্য একটা স্লিপার। সন্ধ্যা নামার আগে অসাধারন সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির বেড়িয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেই। বিসিবিকে ভালোবেসে আমাদের পুরো ট্যুরে গাইড করার জন্য জহিরুল ভাইসহ সেই বিসিবি মেম্বারদের ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা নেই আমার।

কুমিল্লার দক্ষিণগ্রামের অতি দুর্লভ হলুদ পিদ্মের পদ্মবিল কাভার করে এলাম, সাথে সমুদ্র জিত সাহা, জাহিরুল ইসলাম, জেড এইচ চৌধুরী, মেহরাব সিদ্দিকী সাবিত, জগত, রেদওয়ান।

দুই চার কথায় সামারি:

১. 'হলুদ পদ্মে'র শুধু বাইরের দুই একটা লেয়ারের পাঁপড়ি হলুদ, ভেতরের দিকে ঘিয়া কালার।

২. তরতাজা হলুদ পদ্ম আসলেই জোস জিনিস।

৩. এই বিলে হলুদ পদ্ম ছাড়াও ট্র্যাডিশবাল গোলাপি পদ্ম আভহে, হালকা নীল গাঢ় নীল দুই ধরণের শাপলাই আছে, আর আছে পতঙ্গখেখো ব্ল্যাডারওয়ার্ট।

৪. চ্যানেল আইয়ের সাংবাদিকরা প্রায় সব পর্যটকেরই সাক্ষাৎকার নিচ্ছে, আমি আর জাহিরুলও দিসি। দেখানোর চান্স কম, ওইখানে কিছু প্রতাপশালী নেতাও ছিলো, তাদের সাক্ষাৎকার গুরুত্ব পাবে ☺।

প্রজাপতি

আশরাফুজ্জামান খালিদ

১। ভাবুন আপনি ডিম থেকে বের হলেন (ধরে নিন)। এরপর আপনি আপনার ডিম মজা করে খেয়ে ফেললেন।(ভেবে নিন খুব খিদে লেগেছিল) এরপরও ক্ষুধা মিটেনি। আসে পাশে থাকা সব কিছু সাবাড় করলেন। খাওয়ার পর ঘুম আসলো। ঘুমাবার জন্য ঝুলন্ত খাট বানালেন, মশারি টাঙালেন। এরপর ভিতরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়লেন। লম্বা ঘুমের পর, মশারি চিড়ে বেরিয়ে গেলেন। দেখলেন আপনার গায়ে পাখা গজিয়েছে, খুশিতে সাথে সাথে ওড়াল দিলেন। উশটা খেয়ে পড়লেন। কেন পড়লেন বাকিটা পরে জানবেন।

২। উপরের ঘটনাটা প্রজাপতির। আজকে আমরা তাকে নিয়েই জানব।
প্রজাপতি কিন্তু বেশ পুরনো প্রাণী। প্রথম ফসিল ৬৯০ মিলিয়ন বছরের পুরনো। সারা পৃথিবীতে প্রায় ১৭,৫০০ প্রজাতির প্রজাপতি আছে। বাংলাদেশে আছে প্রায়

৪৩০ টি প্রজাতির মতো। কেউ কেউ ভাবে যে মোট সংখ্যা ৫০০ থেকে ৫৫০ এর মতো হবে। এখন কেউ যদি Scientific Classification জানতে চান তাহলে নিচেরটুকু পড়তে পারেন।

বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস :
Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda

Class: Insecta
Order: Lepidoptera
Suborder: Rhopalocera
৪। প্রজাপতি একটা অত্যন্ত ভিন্ন রকম জীবন যাপন করে। আপনার আমার কাছে মনে হবে ভিন্ন রকম কিন্তু কিছু কিছু পোকার কাছে তা তুচ্ছ বিষয়।
জীবন বৃত্তান্ত:

প্রজাপতির ৪ টি দশা রয়েছে।
- ডিম
- লার্ভা/ক্যাটার-পিলার
- পুপা
- পূর্ণবয়স্ক প্রজাপতি

তাদের বছরে ১ থেকে ২ টি প্রজন্মের সূচনা ঘটতে পারে। তবে তা বিভিন্ন প্রজাতির উপরে নির্ভর করে।

ডিম: স্ত্রী প্রজাপতি প্রজাতি ভেদে ১-১০০ টা ডিম পাড়ে। বেশিরভাগ সময় তারা এমন গাছে পাড়ে যে ওই গাছের পাতা ওই প্রজাতির লার্ভা খেতে পারে। যেমন Black Swallowtail ডিম পাড়ে গাজর জাতীয় গাছের পাতার উপর, Monarch প্রজাতি ডিম পাড়ে Milkweed গাছের পাতায়। প্রতিটি ডিম সাধারণত একই রকম হয়ে থাকে। প্রায় ১-৩মিমি ব্যাসের। বেশিরভাগ সময় ডিমগুলো হালকা হলুদ রঙের হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু প্রজাতিতে হলুদ রংটা আস্তে আস্তে গাঢ় রং বা পুরোপুরি কালো রঙের হয়ে যায়। যদি কেউ ডিম দেখতে পায় তাহলে ওখানে আরও ডিম পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর চাইলে আপনি ডিমগুলোকে প্রজাপতি হওয়া পর্যন্ত দেখতে পারেন ডিম কখন পাড়া হবে তা তাদের প্রজাতির ওপর নির্ভর করে।

লার্ভা: প্রায় ৩ থেকে ৭ দিনের মতো সময় নেয় ডিম ফুটতে। এগুলো বেশিরভাগ সময় প্রজাতি ও আশেপাশের পরিবেশের উপর নির্ভর করে। লার্ভাগুলো তাদের গাছগুলোর উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট প্রজাতির জন্য নির্দিষ্ট গাছ থাকে। আমি সেগুলোর লিংক নিচে দিয়ে দেবো। ডিম ফোটার পর তারা প্রথমেই তাদের ডিমের খোসা খেয়ে ফেলে। এটা তাদের জন্য অত্যন্ত পুষ্টিকর। এরপর তারা গাছের পাতা খাওয়া শুরু করে। খেতে খেতে বড়ো হয়। আর তা সম্পূর্ণ ভাবে করার জন্য তারা বেশ কয়েকবার খোলস ছড়ায়। যারা এগুলোর ভিডিওগুলো দেখতে চান লিংক নিচে দিয়ে দেবো দেখে নেবেন। তারা খেতে খেতে তাদের বাচ্চা সাইজ থেকে রীতিমতো বডি বিল্ডার হয়ে যায়। তাদের ওজন প্রায় ১০০০ গুণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বেশিরভাগ সময়ই তাদের খোলস পরিবর্তনের সময় তাদের রং পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন তাদের জীবন চক্রে এটা সবচেয়ে বেশি বিপদজনক সময়। এমনটাও দেখা যায় যে কয়েকশ ডিমের মধ্যে মাত্র কয়েকটি মাত্র ডিম প্রজাপতি হতে পারে।

পুপা (ক্রিসেইল): আপনি যদি অনেক খাবার খান তারপর আপনার কী করতে মনে চাইবে? আরো খেতে? ওয়াও। আরো খাওয়ার পরে? বিশ্রাম করতে। ঠিক না? হুম, লার্ভা ও আমাদের মতো অলস। কিন্তু অত না। তারা বিশ্রাম নেবে কিন্তু নেওয়ার আগে তারা Ecdysome হরমোন নিঃসরণ করে চারপাশে একটা আস্তরণ তৈরি করে। যাতে এর কোনো ক্ষতি না হয়। আপনি তো শুধু ঘুমিয়ে পড়েন। কেউ ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি দিলে তো শুধু পালাবেন। কতক্ষণ ঘুমাবেন আপনি? ৮ ঘণ্টা? ১২ ঘণ্টা? তারা এই সময় প্রজাতি ভেদে কয়েক সপ্তাহ থেকে ২ বছর পর্যন্ত ঘুমাতে পারে। আপনি ঘুমিয়ে

ঘুমিয়ে শুধু স্বপ্নই দেখবেন। আর কিছু পারবেন না। এরা কিন্তু অনেক কিছুই করে। বলতে গেলে তাদের পুরো শরীরের গঠন টাকেই পরিবর্তন করে। তখন প্রথমে এরা একটা এনজাইম নিঃসরণ করে নাম Caspases. তখন শুরু হয় একই সাথে মজার আর ভয়ংকর পর্যায়। এই এনজাইম তাদের শরীরের বেশিরভাগ কোষ গুলোকে গলিয়ে ফেলে বা ভেঙ্গে ফেলে। সাথে আরও ভাঙ্গে তার পাচন তন্ত্র (Digestive system), টিস্যু, পেশি এবং অন্য অঙ্গ সমূহ। কিন্তু এনজাইম গুলো সব কিছু গলিয়ে ফেলে না। কিন্তু তারা মূল কাঠামোটাকে ঠিক রাখে যেমন শ্বসন নালি। ঠিক তখনই কিছু বিশেষ কোষ যাকে আমরা বলি Imaginal Disk সেগুলো জেগে উঠতে শুরু করে। এগুলো তাদের শরীরে আগে থেকেই ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে আগে কেন জাগেনি? কারণ এই পর্যায়ের আগে সেগুলো বেশ কিছু হরমোন দিয়ে আটকানো ছিল। কিন্তু যখনই পরিবর্তন শুরু হয় তখন হরমোনগুলো একেবারে কমে যায়, প্রায় শূন্যের কাছাকাছি চলে আসে। আর সেটা ওই বিশেষ কোষগুলোকে তাদের সর্বোচ্চ সুযোগ দেয় যাতে তারা তাদের সর্বোচ্চটা করে প্রজাপতি তৈরি করতে পারে। প্রত্যেকটি ডিস্ক তাদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ তৈরি করে। ভেতর থেকে প্রসেসটা শুরু হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের পাচন তন্ত্র কাজ শুরু করে দেয়। ৯৬ দিনের মাথায় তাদের মুখ, পাখা, পা এর কাজ শুরু হয়ে যায়। এতকিছু হয় মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, Imaginal Disk গুলো শুরু হয় মাত্র ৫০ টির মতো কোষ থেকে, শুধু একটা পাখা তৈরি করতে তাদের হাজার গুণেরও বেশি বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। যত দিন যায় তাদের বাইরের আবরণ স্বচ্ছ হতে থাকে এবং বাইরে থেকেই ভিতরের জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন তাদের পাখা, পা, মুখ ইত্যাদি বাইরে থেকেই দেখা যায়।

এই যে তাদের শরীরের এক রকম অবস্থান থেকে আরেকরকম হওয়া, সহজ ভাষায় এই পরিবর্তনটা হওয়াকে বলে মেটামরফোসিস (Metamorphosis)। এই পদ্ধতিটা শুধু প্রজাপতিই ব্যবহার করে না। কিছু প্রজাতির ব্যাঙ, মাছ যেমন Osteichthyes, Agantha ও এই পদ্ধতি ব্যাবহার করে। এটাকেই তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় হিসেবে ধরা হয়।

প্রজাপতি: প্রজাপতি যখন তার পরিপূর্ণ আকৃতি পায়। তার সকল অঙ্গ ঠিক মতো কাজ করে তখন তার বের হওয়ার সময় হয়ে যায়। সে আস্তে আস্তে তার চারপাশের আস্তরণ ভেঙ্গে ফেলে। তারপর সে তার পরিত্যক্ত খুপরি ঘর থেকে বের হয়, নতুন এর জগতে পা রাখে। যেখানে সে স্বাধীন মতো ওড়তে পারবে, ঘুরতে পারবে। তবে ওড়ার জন্য সে এখনও প্রস্তুত হয়নি, তার ডানা এখনও খুব ছোটো, ভেজা, ওড়ার অযোগ্য। তাই সে উলটো হয়ে দাড়িয়ে থাকে। যাতে তার ডানা গুলোর মধ্যে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এভাবেই সে দাঁড়িয়ে থাকে প্রায় কয়েক ঘন্টার মত। কষ্টের ফল মিঠা হয়, ডানা আস্তে আস্তে বড়ো হয়। কয়েক ঘণ্টা পরে সম্পূর্ণ ভাবে ডানা হয়ে গেলে প্রজাপতি তার জীবনের প্রথম ওড়াল দেয়। সে এখনি মেট করার জন্য উপযুক্ত। এত কষ্টের পরেও প্রজাতিভেদে প্রজাপতির জীবন মাত্র কয়েক সপ্তাহ। কয়েকটি প্রজাতির জন্য তা আরও বেশি। এই সময় টাতেই তাকে আরেকটি প্রজাপতির সাথে মেট করতে হবে এবং তার পাড়া ডিম থেকে হবে তার বংশধর। A new Generation.

৪। প্রজাপতির একটা মজার বিষয় হচ্ছে লার্ভা অবস্থার স্মৃতি তার পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পরেও মনে থাকে। বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষাটি করেছেন এভাবে, লার্ভা অবস্থায় কখনও কখনও তাদের চারপাশে একটা গন্ধ ছড়িয়ে দেয়া হতো (হ্যাঁ, তারা ঘ্রাণ সংবেদী) এরপরই তাদের দেয়া হতো ইলেকট্রিক শক। শক খেয়েই তারা কুপোকাত, ওখান থেকে দৌড়ে পালাত। যাই হোক এর পর যখনই তাদের চারপাশে এরকম গন্ধ দেওয়া হতো

তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত। পরে দেখা গেছে পূর্ণ বয়স্ক প্রজাপতি হওয়ার পরও তারা এরকম গন্ধের উপস্থিতি পেলে পালিয়ে যেত। (বোঝা গেল যে, আপনার আমার মতো প্রজাপতিও ইলেকট্রিক শক ভয় পায়।)

৫। বাসস্থান: প্রজাপতি তাদের বাসা প্রজাতি হিসেবে নির্বাচন করে। Monarch প্রজাতি Milkweed গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। Black Swallowtail ডিম পাড়ে গাজর জাতীয় গাছের পাতার উপর। কিছু কিছু প্রজাতি নেকটার জাতীয় গাছে বাসা বাধে। আর প্রায় সব প্রজাতি মধু হিসেবে তাদের খাদ্য গ্রহণ করে। তাই তাদের খুঁজলে বাগান এবং যেখানে মধু হয় এমন ফুল এ তাদের দেখা পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সরিষা খেতে ফুলের ওপর প্রজাপতির মধু খাওয়া খুবই সুন্দর একটি দৃশ্য।

৬। আরও কিছু:

১. প্রজাপতি কি বিষাক্ত? উত্তর হচ্ছে মানুষের জন্য না। কিছু কিছু প্রজাতি যেমন Monarch ব্যাঙ, ফড়িং,

ঘাসফড়িং, ইঁদুর অর্থাৎ যারা তাদের ক্ষতি করতে পারে তাদের জন্য বিষাক্ত হতে পারে, কিন্তু মানুষের জন্য না। তবে কিছু আফ্রিকান ক্যাটার-পিলার আছে যাদের ফ্লুয়িড খুবই বিষাক্ত।

২. প্রজাপতি একা থাকতে পছন্দ করে যদি না তারা নতুন বংশধর তৈরি করতে চায়। তবে কয়েকটা প্রজাতি তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একসাথে থাকে। অন্যদের ক্ষেত্রে এটা খুবই কম সময় দেখা যায় যে তারা একসাথে থাকে।

৩. প্রজাপতির পায়ে স্বাদ গ্রহণকারী রিসেপ্টর থাকে যা তাদের বুঝতে সাহায্য করে যে তারা কোনটা খাবে।

৪. প্রজাপতি সবসময় বিশেষ করে ঠান্ডা আর বৃষ্টির সময় ওড়তে পারে না। তাদের ওড়ার জন্য শরীরের তাপমাত্রা থাকতে হয় প্রায় ২৮ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট। আর যেহেতু বৃষ্টিও তাদের শরীরের তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় তাই মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করা যায় যে তারা রোদে তাদের পাখা শুকিয়ে নিচ্ছে।

৫. প্রজাপতি ৩ থেকে ৩.৫ মিটার পর্যন্ত ভালো দেখতে পায়। এছাড়া তারা মানুষের চোখে অদৃশ্য Ultraviolet রশ্মিও দেখতে পায়।

৬.ক্যাটার-পিলার এর শরীরে প্রায় ৪০০০ এর মতো পেশি আছে। যা খুবই কম তাই না? না, মানুষের শরীরে পেশীর সংখ্যা ৬৫০ টি। এছাড়া তাদের আছে ১২ টা চোখ।

৭. শেষ কথা: প্রজাপতি কিন্তু আমাদের অনেক উপকার করে। পরাগায়নের মাধ্যমে । মানুষের আবাসস্থল তৈরির কারণে তাদের সংখ্যা ক্রমাগতই কম হচ্ছে। এটা যদি হয় তাহলে গাছদের ওপরে সরাসরি প্রভাব ফেলবেই সাথে মানুষের জীবনেও পরোক্ষ প্রভাব পড়বে। কি উচিৎ আর কী উচিত না তা ভেবে আমাদের সবাইকে কাজে লেগে পড়তে হবে।

[উপরের লেখার কারণ হচ্ছে এটা বোঝানো যে আমাদের চারপাশে কত অদ্ভুত জিনিস ঘটে তা উপলব্ধি করানো। রাস্তার পাশে দিয়ে হাটার সময় যে গাছ গুলোকে পিছনে ফেলে আমরা চলে যাই এদের অনেকের নামই কিন্তু আমরা জানি না। অথচ হতে পারে তাদের মধ্যেই অনেক জিনিস রয়েছে যে আমরা তা জানলে অবাক হয়ে যাবো। এটাই কিন্তু বাংলার জীবজগৎ ব্যাঙাচির মূল কারণ। আশা করি যারা আয়োজন করেছেন তাদের লক্ষ্য পূরণ হবে।

ভেসে আসা নীল পথিক

রওনক শাহরিয়ার

২০২৬ এর ৯ তারিখ, শুক্রবারের সকাল। প্রতিদিনের মতো কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের হিমছড়িতে স্থানীয় মানুষেরা যাতায়াতের সময় হঠাৎ সমুদ্র তীরে এক বিশাল আকৃতির প্রাণীর দেহাবশেষ পড়ে থাকতে দেখে। প্রাণীটা কোনো সাধারণ জীব নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো প্রাণীদের একটা, যার ওজন ১৫০ টন পর্যন্ত হতে পারে। সামুদ্রিক জায়ান্ট এই প্রাণীটি কর্ডাটা পর্বের স্তন্যপায়ী প্রাণী, দলবদ্ধ লভাবে জীবনযাপন করে। ডলফিনও এদের সমগোত্রীয়। মোট ৮৯ প্রজাতির মধ্যে বেশিরভাগই আজ বিলুপ্তির পথে। এই প্রাণীরা Eocene যুগে বা ৪৬-৩৯.৯ মিলিয়ন বছর পূর্বে Basilosaurids and dorudontines আদি প্রাণী থেকে উদ্ভব হয়েছে।

বিশাল আকৃতির প্রাণীটির নাম **নীল তিমি**। এর বিভিন্ন প্রজাতিকে সমগ্র মহাসাগর জুড়ে দেখা যায়। কক্সবাজারে পাওয়া তিমিগুলো **Bryde's whale** প্রজাতির পূর্ণবয়স্ক তিমি, যা ভারতীয় এবং আটলান্টিক মহাসাগরীয় এলাকায় অধিক দেখা যায়। মানুষের শিকারে তিমিদের হার অনেক কমে যেতে থাকে। যদিও '৮০ এর দশকে আন্তজার্তিকভাবে এর শিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে সমুদ্র পাড়ে কিন্তু প্রায়ই মৃত তিমির সন্ধান মেলে। এদেশে গত ৩৬ বছরে এমন ৬০টি তিমির মরদেহ পাওয়া গেছে বলে তথ্য আছে। বিভিন্ন সময়ে বিশাল সংখ্যক মৃত তিমির সন্ধান পাওয়া যায়। গতবছর অস্ট্রেলিয়ার উপকুলে এমনই ৩৫০টি তিমি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

সাধারণত তিন কারণে তিমি মারা যেতে পারে। প্রথমত, বার্ধক্য। একাকিত্ব, সঙ্গি বা দলনেতা হারিয়ে, ডিকমপ্রেসন সিনেসের জন্য মারা যায়। দ্বিতীয়ত, আঘাত বা ধাক্কা। গভীর সমুদ্রে বড়ো ফিশিং জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। সাগরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মাছ ধরার সময় হার্ট অ্যাটাক বা আঘাতেও তিমি মারা যেতে পারে। তৃতীয়ত, প্লাস্টিক কন্ট্রামিনেশন; পলিথিন বা প্লাস্টিকজাতীয় বর্জ্য, যা তিমির খাদ্য নয়, তা খাদ্যনালিতে আটকে গেলে তিমি মারা যেতে পারে।

হিমছড়িতে সকালে ভেসে আসা তিমিটির ওজন প্রায় দশ টন। লম্বায় ৪৬ ফুট ও প্রস্থে ৯৮ ফুট। অবাক করার মতো বিষয় হলো, পরেরদিনই এক কি.মি. দূরে দরিয়ানগড় সমুদ্রসৈকতে আরেকটা একই ওজনের তিমি ভেসে ওঠে। বিশেষজ্ঞরা তিমিটির নমুনা সংগ্রহ করেছেন কারণ জানার জন্য। কিছুদিন আগের রিপোর্টে জানা যায়, হিমছড়িতে ভেসে আসা তিমিটি মহিলা তিমির দেহ। আর দরিয়ানগড়ে তিমিটি পুরুষ তিমি। দ্বিতীয় তিমিটি প্রথমটির চেয়ে আগে মারা গিয়েছে। প্রচুর দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল বলে স্থানীয়রা জানা। ধারণা করা হয়, পুরুষ তিমিটি আরও এক সপ্তাহ আগে মারা গিয়েছিল কোনো জাহাজের ব্লেডে আঘাতে। আর মহিলা তিমিটি পুরুষ তিমিটির শোকে মারা যায়।

তিমি আত্মহত্যা করতে পারে কি-না বিষয়টি বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো অমীমাংসিত। তবে দূষণ, আহত হওয়া বা অন্য কোনো কারণে তিমিদের গভীর সমুদ্র থেকে সৈকতমুখী যাত্রা করা ও নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার যে প্রবণতা, তাকে ধারণাগত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা হাইপোথিসিস অনুযায়ী ‘হোয়েল স্ট্র্যান্ডিং ইভেন্ট’ বা তিমিদের আত্মহত্যা বলা হয়।

মৃত তিমিদের বেশি সময় সেখানে রাখা হয়নি। কারণ মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পারে এটা। বনবিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত সময়ে মাটিতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। তিন পর মাস সম্পূর্ণ পঁচে গেলে এর হাড় বের করে জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য দেওয়া হবে।

বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কের মিউজিয়ামে একটি এবং ওশানোগ্রাফিক সেন্টারের মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হবে ভবিষ্যৎ গবেষণা ও প্রদর্শনীর জন্য।

সুন্দরবন থেকে ৯৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের দিকে গেলেই দেখা মেলে নীল জলরাশির বিস্তীর্ণ রাজ্য ‘সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড’, ২০০০ কি.মি. গভীর স্থানটি একটি সামুদ্রিক প্রাণীদের অভয়ারণ্য। সেখানে নানা জাতের সামুদ্রিক মাছের পাশাপাশি তিমি ও ডলফিনেরও বিচরণ রয়েছে।
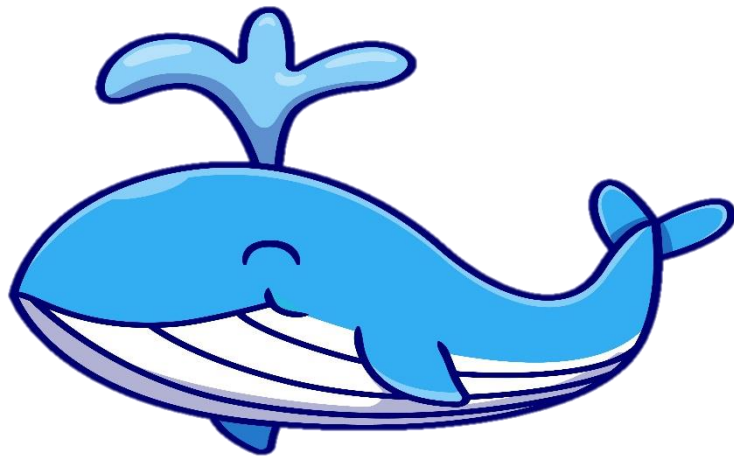
ব্যাঙের ছাতার রসায়ন

মোঃ আতিকুর রহমান পাই

ডক্টর রভ্রিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে যারপরনাই অবাক হলো জেরি। কাঁচা পাকা চুল দাঁড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের একটা চশমা, দীপ্তিময় চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ স্পষ্ট। ল্যাবের এপ্রোনটা এখনো পরে আছেন। ল্যাব থেকে ছুটে আসছেন না কি? জেরি ডক্টর রভ্রিকে জানে একজন গম্ভীর মানুষ হিসেবে যে কিনা ল্যাবে দাড়িয়ে টেস্টটিউব নাড়াচাড়া করে দু তিনটা রাসায়নিক মিলিয়ে চুপচাপ তা পর্যবেক্ষণ করতে ভালোবাসে। তাকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে অবাক না হয়ে পারল না জেরি। "জেরিন তুমি ভাবতেও পারবে না কি হয়েছে!" এক নিশ্বাসে বলল ডক্টর রভ্রি।

জেরি আবারো অবাক হলো। কারণ এর আগে ডক্টর রভ্রি ওকে 'আপনি' বা 'মিস জেরিন' ছাড়া সম্মোধন করেনি কখনো। জেরি স্পষ্টই বুঝতে পারছে ডক্টর রভ্রি কোনো কারণে খুব খুশি।

"আমার এতদিনের গবেষণা এত দিনের পরিশ্রম আজ সফল হয়েছে জেরি। তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না আজ আমি কত খুশি। "

আজ জেরিও খুব খুশি। এই মানুষটা তার খুশি ভাগাভাগির জন্য তাকে বেছে নিয়েছেন এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে! অজান্তেই জেরির কোমল গাল বেয়ে দু ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল!

এই গল্পের ডক্টর রড্রি বা কোনো সাইন্স ফিকশন মুভির কোন রসায়নবিদের কারিশমা দেখে আমরা যতটা না অবাক হই বাস্তব জীবনে রসায়ন বা কেমিক্যাল এর প্রতি তার থেকেও ঢেড় বেশি ভীতি প্রদর্শন করি। আমাদের কাছে কেমিক্যাল মানেই খারাপ কিছু। তার প্রমাণ বাজারে গেলেই মিলে। বাজারে আমরা কেমিক্যাল ফ্রি জিনিস খুঁজি, তা খাবারই হোক বা কসমেটিকস (কেমিক্যাল ফ্রি ১০০% ভেষজ পাতাঞ্জলি ক্রিম)। ছাত্র জীবনে ফিজিক্স বা বায়োলজি কে যতটা ভালবেসে পড়েছেন সেটুকু ভালোবাসা রসায়ন সাবজেক্টটার জন্য দেখালে এত দিনে এটা জানা বাকি থাকত না যে সব কিছুই কোনো না কোনো কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি (হ্যাঁ, ভাই, সব কিছু বলতে সবকিছু। আপনি, আমি, আপনার মাথার উকুন, আমাদের সুযিমামা সবকিছু)।

আচ্ছা **ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান** বলতে আসলে আমরা কোন বিজ্ঞানকে বোঝাই? ব্যাঙের ছাতায় আদৌ কোন বিজ্ঞান আছে কি?
মোটাদাগে বলতে গেলে বায়োলজি আর কেমিস্ট্রি দুটোই আছে। আবার রসায়ন এর সাথে বায়োলজি বা ফিজিক্স দুটোরই ডিরেক্ট লিংক আছে। এখানে আমরা রসায়নের ডাবল ধামাকা দিয়ে দেখার চেষ্টা করব ব্যাঙের ছাতা (মাশরুম) এর আদ্যোপান্ত। সাথে আছে দারুণ দারুণ এক্সপেরিমেন্ট!

ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম কী?

মাশরুম হলো ফাঙ্গাই (Fungi) যা কিনা উদ্ভিদ বা প্রাণী কোনোটাই না! এরা সুগঠিত নিউক্লিয়াস যুক্ত, তার মানে এরা ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়া থেকেও আলাদা। এরা গাছের মতো অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জৈব অণু আহরণ করে কিন্তু এদের গঠন আর প্রজনন গাছ থেকে ভিন্ন। আবার প্রাণীর মতো এরা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না, খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। দৈহিক দিক থেকে এর দুটি অংশ রয়েছে, এক- মাইসেলিয়াম যা কিনা মাটির নিচে থাকে এবং জৈব অণু সংগ্রহে সাহায্য করে, দুই - ফ্রুটবডি (এটাকেই অনেক সময় মাশরুম বলা হয়ে থাকে)।

অনেক মাশরুমই খাবার উপযোগী এবং পুষ্টিকর ও বটে। মাশরুম অনেক রাসায়নিক যৌগ সমৃদ্ধ যা সহজেই পরীক্ষা করে বের করা যায়। শর্করা, আমিষ, চর্বি ভিটামিন, খনিজ লবণ কি নেই এতে! পুষ্টিগুনের দিক থেকে এতে আছে সোডিয়াম (Na), ক্লোরাইড (Cl^-) এবং ফসফেট(PO_4^{3-}) আয়ন যা আমাদের পানি সাম্যতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফসফেট(PO_4^{3-}) আয়ন দাঁত ও হাড়কে দৃঢ়তা প্রদান করে এবং লোহিত রক্তকনিকা তৈরিতে ভূমিকা রাখে। এতে আছে Vitamin C (এসকরবিক এসিড : $C_6H_8O_6$) যা কোষের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করে এবং আয়ন সঙ্গবদ্ধনে ভুমিকা রাখে।
এবার চলুন এইগুলার উপস্তিতি প্রমাণ করি বেশ কিছু এক্সপেরিমেন্ট এর মাধ্যমে।

এক্সপেরিমেন্ট -০১: প্রোটিন টেস্টঃ
Biuret Test এর মাধ্যমে মাত্র ৫ মিনিটেই মাশরুমে প্রোটিন উপস্থিত কিনা তা নির্ণয় করা সম্ভব।

কী কী লাগবে:

1. কপার(II) সালফেট / ব্লু বিট্রিয়ল বা তুতে ($CuSO_4.5H_2O$) সলিউশন (1mol/L)
2. সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH) সলিউশন (1mol/L)
3. ফ্রেশ মাশরুম, ছুরি এবং পিপেট/ড্রপার

পদ্ধতি:

মাশরুম কে দুভাগে কেটে কাটা সার্ফেসে পিপেট দিয়ে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড(NaOH) সলিউশন এর পাতলা লেয়ার যোগ করি।

এরপর সেখানে কয়েক ফোটা কপার(II) সালফেট($CuSO_4 . 5H_2O$) যোগ করি।

প্রোটিন উপস্থিত থাকলে কপার(II) সালফেট এর হালকা নীল রঙ চেঞ্জ হয়ে গাঢ় নীল বা বেগুনি রঙ ধারন করবে(চিত্র-০৬)।

কারণ:

প্রকৃত পক্ষে এই পরীক্ষা দ্বারা পেপটাইড বন্ধন(দুটি অ্যামিনো এসিড এর মাঝে C—N বন্ধন) শনাক্ত করা হয়। প্রোটিন অসংখ্য পেপটাইড বন্ধন দিয়ে তৈরি, সুতরাং এর মাধ্যমে প্রোটিন শনাক্তও সম্ভব। ক্ষারীয় মাধ্যমে কপার(II) আয়ন পেপটাইড বন্ধনে প্রোটিন-কপার কমপ্লেক্স গঠন করে। তার কারনেই রঙের পরিবর্তন ঘটে। এখানে NaOH ক্ষারীয় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

এক্সপেরিমেন্ট -০২ঃ ভিটামিন-সি (এসকরবিক এসিড : $C_6H_8O_6$) পরীক্ষা

কী কী লাগবে:

1. পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড $K_3[Fe(CN)_6]$ এর 1% w/w সলিউশন স্প্রে যন্ত্রতে।
2. আয়রন(III) ক্লোরাইড ($FeCl_3$) সলিউশন
3. ফিল্টার পেপার, ফ্রেশ মাশরুম ও ছুরি।

পদ্ধতি:

আয়রন(III) ক্লোরাইড ($FeCl_3$) সলিউশন দিয়ে ফিল্টার পেপার ভালো করে শেক করে নিতে হবে, এরপর ৩০ মিনিট ধরে এটাকে শুকাতে হবে। ফিল্টার পেপার এর রং হবে ফেরিক ক্লোরাইড এর উজ্জ্বল হলুদ রং।

অর্ধেক করে কাটা মাশরুম এর কাটা অংশ ফিল্টার পেপারে চাপ দিয়ে ধরে এর ছাপ নিতে হবে। এরপর নিরাপত্তা সহকারে পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড সলিউশন ফিল্টার পেপারে স্প্রে করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ ও কারণ:

পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড ফিল্টার পেপারের রং কে হালকা নীল এ রুপান্তর করবে কারণ সেখানে পরশিয়ান ব্লু বা টার্নবুলস ব্লু উৎপন্ন হবে। ভিটামিন সি উপস্তিত থাকলে Fe(III) আয়ন এর বিজারন ঘটে Fe(II) উৎপন্ন হবে ফলে গাঢ় নীল রং দিবে।

পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড এর সাথে বিক্রিয়া

$K^+ + Fe^{3+} + [Fe^{II}(CN)_6]^{4-}$

$\rightarrow KFe^{III}[Fe^{II}(CN)_6]$
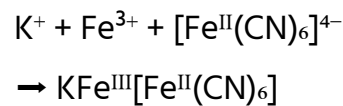
এসকরবিক এসিড ($C_6H_8O_6$) এর সাথে বিক্রিয়া

$2Fe^{3+} + C_6H_8O_6 \rightarrow 2Fe^{2+} + C_6H_6O_6^+ + 2H^+$
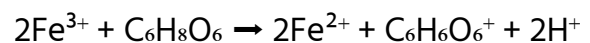
পটাসিয়াম(K) ও সোডিয়াম(Na) টেস্টঃ

শিখা পরীক্ষা (Flame Test) এর মাধ্যমে পটাসিয়াম ও সোডিয়াম টেস্ট করা সম্ভব।

কী কী লাগবে:

1. শুকনো মাশরুম
2. বুনসেন বার্নার
3. চিমটা ও কোবাল্ট গ্লাস

পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত:

চিমটা দিয়ে এক টুকরো শুকনো মাশরুম বুনসেন বার্নার এর শিখায় ধরো। শিখার রং পর্যবেক্ষণ করো। সোনালি হলুদ শিখা দেখা যাচ্ছে। এটা সোডিয়াম উপস্থিতি প্রমাণ করে। কিছুক্ষণ পর হালকা বেগুনি ও হলুদ মিশ্র রঙের শিখা দেখা যাবে। বেগুনি রং পটাসিয়াম এর উপস্থিতি নির্দেশ করে। বেগুনি রং ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য কোবাল্ট গ্লাসের ভিতর দিয়ে শিখা দেখতে হবে। কোবাল্ট গ্লাস সোডিয়াম এর হলুদ রং কে ফিল্টার করে পটাসিয়াম এর বেগুনি রঙের শিখা পর্যবেক্ষণে সাহায্য করে।

ফসফেট আয়ন (PO_4^{3-}) টেস্টঃ

যা লাগবে:

1. অ্যামোনিয়াম হেপ্টা-মলিবডেট $[(NH_4)_6Mo_7O_{24}]$ সলিউশন
2. লঘু নাইট্রিক এসিড (HNO_3) (2 mol/l)
3. মাশরুম এর ছাই
4. পাতিত পানি, ফিল্টার পেপার, টেস্ট টিউব, ফ্লাস্ক, বুনসেন বার্নার ইত্যাদি

পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ:

শুকনো মাশরুম পোরসেলিন ডিস্কে করে পুড়িয়ে তার ছাই করতে হবে। এরপর তা ১০ মি.লি পাতিত পানিতে দ্রবীভূত করে ফিল্টার পেপার দিয়ে ছেকে ফিল্টার করা তরল টেস্ট টিউব এ সংরক্ষণ করতে হবে। এরপর সংরক্ষিত তরলে ২/৩ মি.লি লঘু নাইট্রিক এসিড যোগ করে এসিডিক করি (এই সলিউশন পরবর্তী টেস্ট এর জন্য সংরক্ষণ করে রাখব)।

৫ মি.লি পরিমাণ এসিডিক ক্রিত মাশরুম ছাইয়ের সলিউশন নিয়ে ১০ ফোটা অ্যামনিয়াম হেপ্টা-মলিবডেট $[(NH_4)_6Mo_7O_{24}]$ সলিউশন যোগ করি। এরপর ২ মিনিট বুনসেন বার্নার এ উত্তপ্ত করি।

অম্লীয় মাধ্যমে ফসফেট আয়ন অ্যামনিয়াম হেপ্টা-মলিবডেট $[(NH_4)_6Mo_7O_{24}]$ এর সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামনিয়াম ফসফো-মলিবডেট $[(NH_4)_3PMo_{12}O_{40}]$ যৌগ তৈরি করে যা হলুদ বর্ণের অধঃক্ষেপ দেয়।

ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) টেস্টঃ

যা যা লাগবে:

1. এসিডিক ক্রিত মাশরুম ছাইয়ের সলিউশন (পুর্বের টেস্ট থেকে সংরক্ষিত)
2. সিলভার নাইট্রেট ($AgNO_3$) সলিউশন (5%w/w)
3. টেস্ট টিউব, পিপেট

পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ: ২/৩ মি.লি এসিডিক ক্রিত মাশরুম ছাইয়ের সলিউশন নিয়ে তাতে কয়েক ফোটা সিলভার নাইট্রেট ($AgNO_3$) সলিউশন যোগ করি।
ক্লোরাইড আয়ন সিলভার নাইট্রেট ($AgNO_3$) এর সাথে বিক্রিয়া করে সিলভার ক্লোরাইড($AgCl$) এর সাদা অধঃক্ষেপ দিবে।

এতক্ষণ আমরা ব্যাঙাচি ম্যাগাজিনে দেখলাম ব্যাঙের ছাতায় রসায়ন এর সামান্য চিত্র!

দীপ্ত লুচি পাতা

আসিফ আফতাব সোহাগ

'দীপ্ত লুচি পাতা' নামটা হয়তো অনেকের কাছে নতুন কিন্তু **Peperomia** (পেপেরোমিয়া) নামটা অনেক জনপ্রিয়। পৃথিবীতে অনেক প্রজাতির পেপেরোমিয়া পাওয়া যায়। এর কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখা কিছুটা স্বচ্ছ হওয়ার কারণে এটার মূলগুলো রঙিন পানিতে চুবিয়ে দিয়ে সহজেই উদ্ভিদের পানি শোষণ প্রক্রিয়া পরীক্ষা করা যায়। আজ আমরা জানবো অবহেলায়, অনাদরে বেড়ে ওঠা এবং বেশিরভাগ মানুষের নিকট আগাছা হিসেবে পরিচিত পেপেরোমিয়া পেলুসিডা গাছ সম্পর্কে।

বৈজ্ঞানিক নাম *Peperomia pellucida* (যা পেপার এল্ডার, শাইনিং বুশ প্লান্ট এবং ম্যান টু ম্যান নামেও পরিচিত)। বাংলাদেশে এটি এর অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় বেশি পাওয়া যায়। এটি একটি বার্ষিক, অগভীর শিকড় এর ভেষজ যা সাধারণত প্রায় ১৫-৪৫ সেন্টিমিটার (৬-১৮ ইঞ্চি) লম্বা হয়ে থাকে। এটি রসালো ডালপালা, চকচকে হৃদয় আকৃতির মোটা পাতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং এর ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো বীজগুলির সাথে বিভিন্ন ফলজ স্পাইক সংযুক্ত থাকে।

এটি **Piperacea** (পাইপেরাসাই) পরিবারের সদস্য। পাইপেরাসাই পরিবারটি প্রায় এক ডজন গণ এবং প্রায় তিন হাজার প্রজাতি নিয়ে গঠিত।

আবাসস্থল:
বছরব্যাপী ফুল ফোটানো এই গাছটি পুরো এশিয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ছায়াযুক্ত, স্যাঁতসেঁতে আবাসস্থলগুলিতে পাওয়া যায়। এটি জন্মায় গুচ্ছাকারে, আলগা, আর্দ্র মাটিতে এবং ক্রান্তীয় থেকে উপক্রান্তীয় জলবায়ুতে। উদ্ভিদটির বেঁচে থাকার জন্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬০° প্রয়োজন। তাই শীতপ্রধান দেশে এটি খুব একটা পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের সর্বত্র স্থানে জন্মালেও এগুলো একেক অঞ্চলে একেক নামে পরিচিত। সাধারণত নরম বেলে দোঁআশ মাটিই বেশি উপযোগী। লবণে খুব কমই জন্মে। রাস্তার পাশে, পুকুর পাড়, বিল, ধানক্ষেতের আল ও সবজি ক্ষেতের নরম মাটিতে গাছটি বেশি জন্মাতে দেখা যায়। পতিত জায়গায়ও এটি জন্মে।

সাধারণ ব্যবহারসমূহ:
এটি খাবারের পাশাপাশি ঔষধি ভেষজ হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। যদিও এটি বেশিরভাগ মানুষের কাছে তার শোভাময় পাতার জন্য পরিচিত, পুরো গাছটি ভোজ্য। রান্না করে এবং কাঁচা উভয়ভাবেই খাওয়া যেতে পারে। বলা হয়ে থাকে এটি একটি ভালো তাপনাশক ঔষধ। কান্ড থেকে কচি পাতাসহ কান্ডের ডগা কেটে নিলে সেখান থেকে আবার নতুন কান্ড গজায়। কান্ডে ফুলও হয়। ফুল দেখতে সাদা, আকৃতিতে ছোট। ফুলের পাপড়ির উপরিভাগ সাদা কিন্তু নিচের দিকটা সবুজ। ফল দেখতে অনেকটা জিরার মতো। ফলের মধ্যের বীজ কাঠের ঘুণের চেয়েও ক্ষুদ্রাকৃতির। বসন্তের শেষের দিকে বীজ হয়। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেকেই একে ঘরের মধ্যে টবে রেখে যত্ন করতে পছন্দ করেন। সংস্কৃতে এটি পরিচিত গ্রীষ্ম সুন্দরক হিসেবে। এটির সুগন্ধযুক্ত স্বাদ রয়েছে, এটি ক্ষুধা এবং হজমকে উদ্দীপিত করে। পাতাগুলি রসালো এবং মশলাদার স্বাদযুক্ত। শুঁয়োপোকা কামড় দিলে দীপ্ত লুচি পাতা ব্যবহারে উপকার হয়। পাচন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সালাদ হিসেবেও কাঁচা খাওয়া হয়ে থাকে।

ফার্মাকোলজিতে এর ব্যবহার:
এর বেদনানাশক বৈশিষ্ট্যের সাথে এর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সংশ্লেষণের ওপর প্রভাবের মিল আছে বলে মনে করা হয়। স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, ব্যাসিলাস সাবটিলিস, সুডোমোনাস অ্যারুগিনোসা এবং এসচেরিসিয়া কোলির ওপরে করা পরীক্ষার ফলাফল পেপেরোমিয়াকে **broad spectrum antibiotic** (ব্রড স্পেক্ট্রাম এন্টিবায়োটিক) হিসেবে ব্যবহারের

সম্ভাব্যতাকে তুলে ধরে। ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক হলো এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক যা দুটি প্রধান ব্যাকটেরিয়া গ্রুপগুলির ওপরে কাজ করে, গ্রাম-পজিটিভ এবং গ্রাম-নেগেটিভ বা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক যা রোগ-ব্যাধিজনিত ব্যাকটেরিয়ার বিস্তৃত বিস্তারের বিরুদ্ধে কাজ করে। পেপেরোমিয়ার মৃত পাতা থেকে ক্লোরোফর্ম নিষ্কাশিত হয় যেটাকে ট্রাইকোফাইটন মেন্টাগ্রোফাইটস এর বিরুদ্ধে এন্টিফাঙ্গাল ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করতে দেখা যায়। ইঁদুরের ও পরীক্ষা করে এদের প্রদাহ বিরোধী এবং বেদনানাশক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা গেছে।

যদিও উদ্ভিদটি হাইপারস্পেনসিটিভ প্রতিক্রিয়াযুক্ত রোগীদের মধ্যে হাঁপানির মতো লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে তবে মানুষের প্রতি বিষাক্ততার বিষয়ে এখনো কোনো ক্লিনিকাল তথ্য পাওয়া যায়নি।

ঐতিহ্যবাহী ওষুধ হিসেবে ব্যবহার:

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে এটি একটি আগাছা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে উদ্ভিদটিকে **Ethnomedicine** (এথনোমেডিসিন) হিসেবে নানান ভাবে ব্যবহার করা হয়। এথনোমেডিসিন হলো উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জৈব ক্রিয়াশীল যৌগের উপর ভিত্তি করে ঐতিহ্যবাহী ওষুধের একটি গবেষণা বা তুলনা যা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর দ্বারা অনুশীলন করা হয়। বিশেষ করে পশ্চিমা ওষুধগুলোতেও এথনোমেডিসিনের একটা অংশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পেটে ব্যথা, ব্রণ, ফোঁড়া, শ্বাসকষ্ট, ক্লান্তি, গাউট, মাথা ব্যথা, রেনাল ডিজঅর্ডার এবং বাতজনিত জয়েন্ট ব্যথার চিকিৎসা করতে পেপেরোমিয়া ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বলিভিয়ায়, আল্টেনোস ইন্ডিয়ানরা রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পুরো গাছটি ব্যবহার করে।

..

শিকড়গুলি জ্বরের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বায়বীয় অংশগুলি ক্ষতের জন্য ড্রেসিং হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উত্তর-পূর্ব ব্রাজিলে, উদ্ভিদটি কোলেস্টেরল কমাতে ব্যবহৃত হতো। গুয়ানা এবং অ্যামাজন অঞ্চলে এটি একটি জনপ্রিয় কাশি দমনকারী, ত্বকের কোমলতা বর্ধক এবং মূত্রবর্ধক। এটি ব্রণ এবং ফোড়ার মতো ত্বকের উপরিভাগের ব্যাধিগুলোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। ফিলিপাইনে এটি স্বাস্থ্য অধিদফতর দ্বারা অনুমোদিত ১০ টি ঔষধি গাছের মধ্যে একটি। এটি ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা হ্রাস করতে ব্যবহৃত হয় যা আর্থ্রাইটিস এবং গাউট এর একটি কারণ।

পেপেরোমিয়ার ওষুধি গুণাগুণ নেহাৎ কম নয়। এটা দিয়ে যে শুধু উদ্ভিদের মূল দ্বারা পানি শোষণ পরীক্ষা করা হয় না তা তো আজকে জানা গেল। কিন্তু আমাদের আশেপাশে এমন অনেক গাছপালা আছে যাদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে আমরা অবগত নই। ফলজ গাছগুলোর পাশাপাশি ভেষজ এবং শোভাবর্ধক গাছগুলোও যে আমাদের নানা উপকারে আসতে পারে সেই ধারণা আমাদের সকলের মাঝেই থাকা উচিত।

লজ্জাবতী বানর

তাজউদ্দিন আহম্মদ

"বাঁদরের বাঁদরামি" -কথাটা যাদের সাথে একেবারেই যায় না। শান্ত, ধীর-স্থির প্রকৃতির অনন্য সুন্দর এই প্রাণীটি বাংলার বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের খাতায় নাম লিখিয়েছে। নির্বিচারে বন ধ্বংস ও চোরাশিকারিদের দৌরাত্ম্যে ক্রমেই বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা।

International Union for Conservation of Nature বা IUCN এদেরকে Red list এ বিপন্নপ্রায় প্রাণী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ১৯৭৪ ও ২০১২ এর তফসিল ১ অনুযায়ীও সংরক্ষিত প্রাণীর তালিকায় রয়েছে এরা।

লজ্জাবতী বানরের অনেকগুলো প্রজাতি রয়েছে। আমাদের দেশে যাদের দেখা যায় তারা হলো Bengal Slow Loris। ধীরগতি ও অলস স্বভাবের কারণে এই নাম পেয়েছে এরা। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়েই এই বানরের দেখা পাওয়া যায়। নিশাচর লজ্জাবতীরা দিনের বেলায় দেখা দেয় না সহজে। তবে যখনই কারুর দেখা পায়, দু-পায়ের মাঝখানে মাথা গুঁজে দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলে। যেন ভীষণ লজ্জা পেয়েছে। এমন মুখ লুকোনো স্বভাবের কারণে এদেরকে আদর করে মুখচোরা বানর নামেও ডাকা হয়।

শ্রেণিবিন্যাস-

ইংরেজি নামঃ Bengal Slow Loris বা Northern Slow Loris

বৈজ্ঞানিক নাম : Nycticebus bengalensis.

জগৎ : Animalia

পর্ব : Chordata

শ্রেণি : Mammalia

বর্গ : Primates

উপবর্গ : Strepsirrhini

পরিবার : Lorisidae

গণ : Nycticebus

প্রজাতি : N. bengalensis.

লজ্জাবতীরা অন্যান্য বানরের চাইতে গঠন ও চেহারায় আলাদা। অন্য বানরদের তুলনায় সহজেই পৃথক করা যায় তাদের। মাঝারি আকৃতির বানরগুলোর পিঠ ধূসর বাদামি পশমে আবৃত হয় এবং নিতম্বের দিকটা সাদা পশমে আবৃত থাকে। সামনের অংশে বুক এবং পেট সাদা কিংবা ধূসর পশমে ঢাকা থাকে, এর উপর কালো বা বাদামী ছোপও থাকতে পারে। গোলগাল মাথার উপরে মাঝখান বরাবর একটি লম্বা কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়। মাথার দুপাশে দুদিকেও অনেক সময় কালো ছোপ থাকে। হাতগুলো ছোটো এবং সাদা, পা মসৃণ ও বিবর্ণ, এর সাথে থাকে ছোটো একটি লেজ। মাথার সামনে থাকে দুটো বড়ো বড়ো চোখ। বড়ো চোখগুলোয় রঙিন আলোকচ্ছটার প্রতিফলন দেখা যায়। এমন অনন্য গড়নের কারণে সহজেই চিহ্নিত করা যায় তাদের।

লজ্জাবতী বানরেরা নিশাচর। দিনের বেলায় এদের খুব কম দেখা যায়। লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে তারা। খুব প্রয়োজন ছাড়া এরা সহজে বের হয় না, সবসময় গাছের মগডালে থাকে। তারা উলটো হয়ে ঝুলতে ভালোবাসে, মগডালে থেকে গাছের কঁচি পাতা চিবিয়ে খায়। এছাড়া এদের খাদ্য তালিকায় ছোটো ছোটো পোকামাকড়, ছোটো পাখি ও বিভিন্ন প্রাণীর ডিম রয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এরা হাত দিয়ে খাবার না খেয়ে সরাসরি মুখ দিয়ে খায়, একদম পাখিদের মতো। স্ত্রী বানরেরা সাধারণত বছরে একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। কিউট এই বানরগুলো ২০ বছরের কাছাকাছি বাঁচে। প্রাইমেটদের মধ্যে এরা ভেনোমাস অর্থাৎ বিষধর। এদের কামড় ভয়ানক হতে পারে, যদিও এরা খুবই শান্ত এবং সহজে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর সংস্পর্শে আসে না।

ভারতীয় উপমহাদেশ এবং ইন্দোচীনে এই বানরদের দেখা পাওয়া যায়। তারা ঘন চিরসবুজ বনে বাস করে। আমাদের দেশে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ঘন সবুজ বন, রেমা কালেঙ্গা, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানসহ আরো কিছু জায়গায় এদের দেখা পাওয়া যায়। মাঝেমধ্যে খাবারের অভাবে তারা লোকালয়ে চলে আসে। প্রায়ই বিভিন্ন জায়গা থেকে লজ্জাবতী উদ্ধার করার খবর শোনা যায়। কেউ কেউ আবার বনে ফিরে যেতে পারে, কারো ঠিকানা হয় চিড়িয়াখানার খাঁচায়।

দেখতে ভীষণ সুন্দর এই বানরেরা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। বন উজাড়করণ ও শিকারের বলি হচ্ছে প্রকৃতির অনন্য জীব বৈচিত্র্যগুলো।

বর্তমানে বাংলাদেশের জীবকুলের এমন অনন্য অনেক প্রাণীই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যা প্রাকৃতিক ও বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্যপ্রাণীদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হওয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। বন উজাড় বন্ধ করে নিরাপদ অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা না গেলে আগামী কয়েক বছরে অনেক প্রাণীই হারিয়ে যাবে বাংলার জীবের তালিকা থেকে। তখন হয়তো আর মিলবে না মুখ লুকোনো লজ্জাবতী বানরদের দেখা।

আলকুশি/বিলাই খামচি

আবু রায়হান

সময়টা ছিল প্রায় ৬২-৬৩ বছর আগে। বয়স যখন ৪/৫ বছর ছিল তখন থেকেই গাজীপুরে থাকতাম, সাভার বিকেএসপির পাশেই। ঢাকার পাশে হলেও তখনকার গাজীপুর বেশ গ্রাম্য টাইপ ছিল।

যাহোক, বন্ধুরা মিলে প্রতিদিন বিকেলে ক্রিকেট খেলতে বাড়ির পাশে এক বড়ো মাঠে যেতাম। মাঠের মালিকের নাম ছিল বুদ্ধু মিয়া। আমরা মজা করে 'বুদ্ধুর বাপ' ডাকতাম।

মাঠটা উন্মুক্তই ছিল, উনি কোনো ফসল তাতে চাষ করতেন না বা কোনো আবাসনও তখন উনি তৈরি করেননি। তবুও সে দজ্জাল বুদ্ধুর বাপ উনার মাঠে আমাদের খেলতে দেখলেই আমাদের দৌড়ানি দিতেন। (পেটের চর্বি কমাতেই দৌড়ানি দিত কি না তা নিয়ে এখন ভাবনায় পড়ে গেছি!)

হয়তো উনাকে আমরা খ্যাপাতাম বলে আমাদের দেখতে পারতেন না।

চর্বিযুক্ত ফুটবলের মতো পেট নিয়ে দৌড়িয়ে এসে যখন আমাদের দৌড়ানি দিতে আসত, তখন আমরা উনার ঢোলের মতো পেটের নড়াচড়া দেখে মনে করতাম এক পটকা ব্যাং বুঝি দৌড়িয়ে আসছে আমাদের দিকে। খুব উপভোগ করতাম উনার দৌড় দেওয়াটা। তাই আমরা আরও বেশি বেশি উনাকে খ্যাপাতাম যাতে উনি আরও বেশি করে প্রতিদিন আমাদের দৌড়ানি দেন এবং যাতে আমরা আরও মজা নিতে পারি।

দৌড়ানি খেয়ে আমরা দৌড়াতাম আর দৌড়ানোর সাথে সাথে
'বুট্টু বুদ্ধুর বাপ' বলে খ্যাপাতাম, আর হাসতাম। উনার সাথে আমাদের টম অ্যান্ড জেরি সম্পর্ক ছিল বলতে পারেন।যাহোক, উনার এহেন আচরণে আমরা কিছুটা মজা পেলেও যখন-তখন এসে খেলা ভন্ডুল করে দেওয়ায় আমরা উনার ওপর যারপরনাই ক্ষিপ্তও ছিলাম। প্রতিশোধের ধান্ধায় থাকতাম।

একদিন বন্ধুরা মিলে জঙ্গলে পাখি শিকার করতে গিয়ে শিমের মতো এক প্রকার ফল দেখতে পেলাম। এক বন্ধু তা দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠে বলল,"পাইছি !"
আমরা বললাম, " কী পাইছস ?"
বলল, "বিলাইহুঙ্গা পাইছি !"
আমরা বললাম, "তো?"
-"বুদ্ধুর বাপের খবর আছে, বুদ্ধুর শার্টে বিলাইহুঙ্গা ভরাই দিমু। তারপর বুদ্ধু বুঝব খামচানি কারে কয়।"
আমরা বুদ্ধিটা শুনে তো বেজায় খুশি। এতদিনে ব্যাটাটাকে শায়েস্তা করার একটা মোক্ষম উপায় পেয়েছি বলে ভেবে আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম।

ওই দুষ্টু বন্ধু (জহিরুল) একদিন তার বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উনার শুকাতে দেওয়া শার্টে বিলাইখামচি লাগিয়ে দেয়।
আর তারপর থেকেই আমরা ওত পেতে থাকতাম বুদ্ধর বাপ বিলাই খামচির জ্বলুনির মজা টের পেল কিনা সেটা উপভোগ করতে।
তারপর দুদিন পরেই বিকেলে খেলতে গিয়ে শুনি উনার বাড়িতে ভীষণ চেঁচামেচি।

"ও আল্লাহ রে! মইরা গেলাম রে! কী চুলকানি রে!"
আমাদের বোঝা শেষ যে অপারেশন সাকসেসফুল।
তারপর আমরা যে যার মতো করে ভয়ে ভয়ে বাড়ি চলে এলাম। কারণ উনার আর বুঝতে বাকি থাকার কথা না যে কাজটা কে বা কারা করতে পারে। আর একবার যদি আমাদের হাতেনাতে ধরতে পারেন তাহলে খবর আছে! যাহোক, আমাদের অবাক করে দিয়ে এরপর থেকে আর তিনি আমাদের আর দৌড়ানি দেননি, তবে তারপরে বেশ কয়েকদিন আমাদের দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। বুঝেছিলেন হয়তো যে, আমাদের সেই বিচ্ছুবাহিনীর সাথে উনি হয়তো পেরে উঠবেন না।

হ্যাঁ, সেই গাছটাই বৈজ্ঞানিকভাবে *Mucuna pruriens* নামে পরিচিত, যাকে প্রমিত বাংলায় আমরা আলকুশি নামে চিনি। তাছাড়া এটি বিলাইখামচি নামেও পরিচিত। ময়মনসিংহে এটাকে বিলাইহুঙ্গা বলে ডাকে।

আলকুশি বা বিলাই খামচি
বৈজ্ঞানিক নাম : *Mucuna pruriens*
ইংরেজি : Velvet bean, Cowitch, Cowhage, Kapikachu,
নাইজেরিয়াতে এটি 'Devil Beans' নামে পরিচিত।
বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস :
জগৎ : Plantae
বিভাগ : Magnoliophyta
শ্রেণী : Magnoliopsida
বর্গ : Fabales
পরিবার : Fabaceae
উপপরিবার : Faboideae
গোত্র : Phaseoleae
গণ : Mucuna
প্রজাতি : M. pruriens

দ্বিপদী নাম : *Mucuna pruriens (L.) DC.*

Subspecies :

Mucuna pruriens ssp. deeringiana (Bort) Hanelt

Mucuna pruriens ssp. pruriens

Varieties :

Mucuna pruriens var. hirsuta (Wight & Arn.) Wilmot-Dear

Mucuna pruriens var. pruriens (L.) DC.

Mucuna pruriens var. sericophylla

Mucuna pruriens var. utilis (Wall. ex Wight) (L.H.Bailey, Honduras) জন্মে যাতে চুলকানি উদ্রেককারী কোনো লোম নেই।

এটি এক প্রকার গুল্ম জাতীয় গাছ। এটা কিন্তু শিম পরিবারের উদ্ভিদ যার কারণে ফল দেখতে অনেকটা শিমের/তেঁতুলের মতো। ৪ থেকে ৬টা বীজ থাকে। শুকনো ১০০টি বীজের ওজন প্রায় ৫৫-৮৫ গ্রাম। বর্ষজীবী এ গাছে বেগুনি রঙের ফুল ফোটে। পাকা ফলের উপরিভাগে ছোটো ছোটো লোম থাকে। তাছাড়া পাতাতেও লোম থাকে। স্থানীয় ভাষায় এই লোমকে আমরা 'হুঙ্গা' বলে চিনি। নড়াচড়া হলেই লোম বা হুঙ্গাগুলো আলগা হয়ে বাতাসে ছড়ে যায়। উড়ে যাওয়া এসব হুঙ্গার স্পর্শ ভয়ংকর। গায়ে লাগলে প্রচণ্ড চুলকানি শুরু হয়।

ফলগুলো কাঁচা অবস্থায় সবুজ ও পাকলে বাদামি ও কালচে রং ধারণ করে। ফলগুলো শিমের চেয়ে মোটা এবং বীজও শিমের চেয়ে বড়ো। এ গাছটি প্রায় ১৫ মিটার (৫০ ফুট) পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। যখন গাছটি ইয়াং থাকে তখন এতে চুলকানি সৃষ্টিকারী লোমগুলো দেখা যায়, কিন্তু বুড়িয়ে গেলে সেসব লোমগুলো দেখা যায় না বললেই চলে।

বানরের আর এদের বিশেষ এক কথা প্রচলিত আছে। কথাটা হলো, যখন আলকুশি ফল পুষ্ট হতে থাকে তখন চুলকানির ভয়ে বানরের দল ওই এলাকা ছেড়ে চলে যায়, কারণ এর হুল বাতাসেও ছড়িয়ে পড়ে। বানরেরা ফিরে আসে যখন মাটিতে ফল পড়ে যায়। তারপর সেগুলো তারা নাকি খেয়েও থাকে।

আসলেই বানরের দল এর ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালায় কি না তা নিশ্চিত না হলেও পালানোর বিষয়টা একদম অযৌক্তিক নয়।

কিছু আলকুশি আছে যার রোম নেই বললেই চলে যেমন : কাকাণ্ডোল, *Mucuna pruriens var. utilis* নামে পরিচিত।

বোটানিক্যাল নামের Pruriens শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে, যার অর্থ চুলকানির অনুভূতি। ফলের খোসা ও পাতায় serotonin এবং mucunain আছে।

যার কারণে চুলকানির উদ্রেক হয়।

তবে ইন্দোনেশিয়া বিশেষত জাভায় এর বীজ খাওয়া হয় যা 'Benguk' নামে পরিচিত।

অন্যান্য দেশেও একে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়।

সারা বছর ফুল ফুটলেও শীতকালে বেশি ফুল ফোটে। এই গাছে একদিকে ফল পাকে অন্যদিকে ফুল ফোটে। চুলকানির উদ্রেক করাতে ওস্তাদ হলেও এটা কিন্তু উপকারি গুল্মও বটে। এটা আয়ুর্বেদ, ইউনানিসহ বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতিতে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

তাছাড়া Naja spp. (cobra), Echis (Saw scaled viper), Calloselasma (Malayan Pit viper)

এবং Bangarus (Krait)-এসব সাপের কামড়ে এর ইফেক্ট নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। বিভিন্ন উপজাতিরা একে বিভিন্ন সাপের কামড়ে বিষ প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বিছার কামড়ে এটির বীজের গুঁড়ো ব্যথা উপশমে ব্যবহার করেন অনেকেই।
যেহেতু গাছটি শিমের মতো লিগিউম সেহেতু গাছটি মাটিতে নাইট্রোজেন ফিক্সিং-এ কাজ করে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

আমরা এর দ্বারা সৃষ্ট চুলকানির উপশম করতে চামড়ায় ধুলা ও বেলে মাটি দিয়ে ঘষতাম আর সাথে সাথে গোসল করে ফেলতাম।

তবে যাই করেন ভুলেও কিন্তু কারও সাথে এটা নিয়ে মশকরা করতে যাইয়েন না। তাহলে মাইর একটাও মাটিতে পড়বে না কি না তার নিশ্চয়তা আমি দিতে পারলাম না।

মিমস

ভালোবাসা...
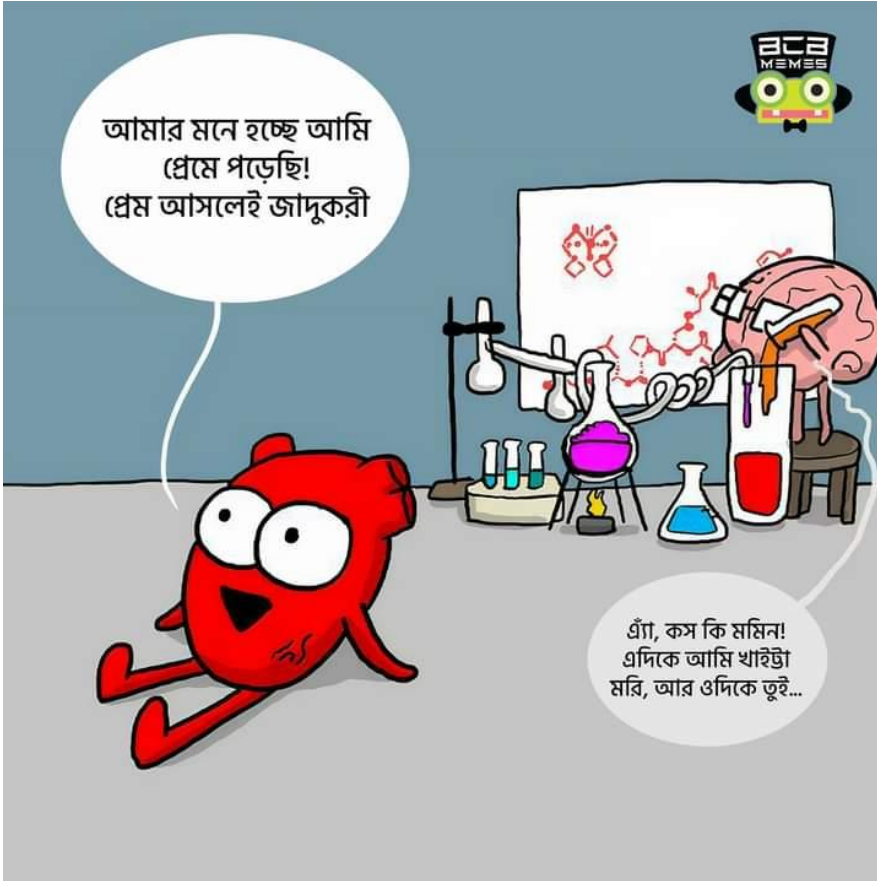
বিস্তারিত এখানে পড়ুন; Stolen Love from Brain to Heart

credit: u/tanvirranarabbi

কাঁঠাল
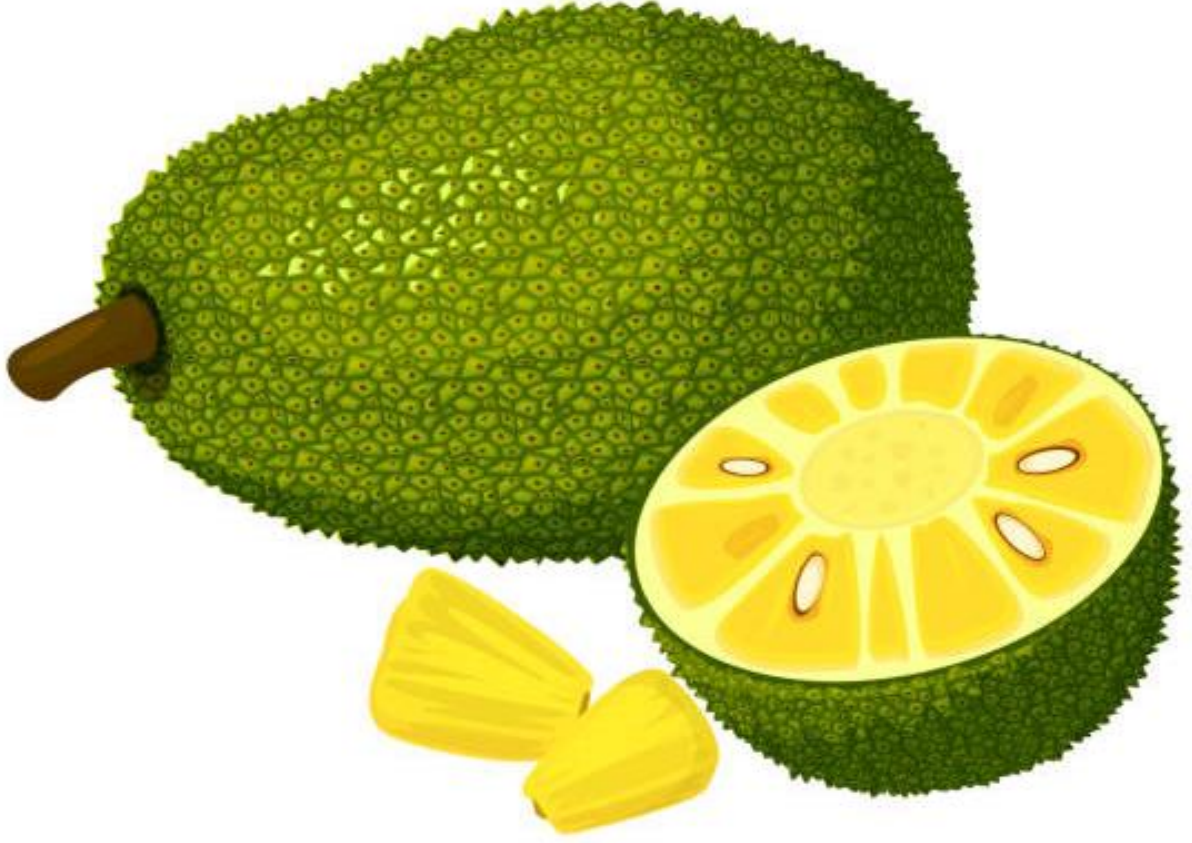
রওনক শাহরিয়ার

ফলের প্রজাতিসমূহের মধ্যে কাঁঠাল আকারে সবচেয়ে বড়ো। ভারতীয় উপমহাদেশ এবং পূর্ব এশিয়াতে কাঁঠালের ব্যাপক চাষ হয়। বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কা এর আদিম জন্মস্থান। এছাড়াও গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চল ও ক্রান্তীয় বনাঞ্চল এলাকা এর ভালো উৎপাদন হয়। আমাদের দেশে সর্বত্র এর দেখা মেলে। কাঁঠাল উৎপাদনের দিক দিয়ে ভারতের অবস্থান শীর্ষে। এরপর বাংলাদেশের স্থান। বাংলাদেশ ও কেরালায় এটা জাতীয় ফল হিসেবে স্বীকৃত। একটা বৃহৎ আকৃতির কাঁঠাল প্রায় ৫৫ কেজিও হতে পারে।

কাঁঠাল শব্দটি এসেছে পর্তুগিজ জ্যাকা থেকে, যা ঘুরেফিরে মলালাম ভাষার শব্দ চক (মালায়ালাম: চাক্কা পাজম) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তবে প্রচলিত ইংরেজি নাম **Jackfruit** চিকিৎসক এবং প্রকৃতিবিদ **গার্সিয়া দে অর্টা** তার গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। তার কিছু সময় পর ব্রিটিশ শাসক ইউলিয়াম জ্যাকের নামে এই ফলের নামকরণ করা হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম: *Artocarpus heterophyllus।*

বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস:

Kingdom: Plantae

Order: Rosales

Family: Moraceae

Genus: Artocarpus

Species: *A. heterophyllus*

কাঁঠাল একটা বহুমুখী ফল। এর কোনো অংশ ফেলে দেওয়া হয় না। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। এর সাদা জাতীয় আঠা কাঠ সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। পাকা কাঁঠালের সার বা কোষ হিসেবে পরিচিত মিষ্টি ও রসালো অংশটি খাওয়া হয়। আটি বা বীচি রান্না ও ভর্তা করা যায়। এছাড়াও কাঁচা কাঁঠাল দিয়ে করেক রকমের পদ তৈরি করা সম্ভব। মানুষের ফেলে দেওয়া অতিরিক্ত অংশ পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এদেশে কাঁঠালের প্রচলনের সীমাবদ্ধতা থাকলেও অন্যান্য দেশে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে ওঠেছে।

কাঁঠালের বেশ কিছু জাত রয়েছে। এদেশের প্রচলিত কাঁঠালের জাতগুলোকে খাজা, গিলা, দোসরা জাতে ভাগ করা যায়। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র তিনটা উচ্চফলনশীল বারি কাঁঠাল-৬, বারি কাঁঠাল-২ ও বারি কাঁঠাল-৩ অবমুক্ত করেছে।

তাছাড়া কাঁঠাল প্রচুর পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ একটা ফল। এতে আছে থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন, সোডিয়াম, জিঙ্ক এবং নায়াসিনসহ বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদান। অন্যদিকে কাঁঠালে প্রচুর পরিমাণে আমিষ, শর্করা ও ভিটামিন থাকায় তা মানব দেহের জন্য বিশেষ উপকারী।

কাঁঠাল সংস্কৃতির সাথেও জড়িত অনেকটা। ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ৩০০০ থেকে ৬০০০ বছর আগে ভারতে কাঁঠালের চাষ হয়েছিল। এর কাঠের আলাদা গুরুত্ব আছে অনেক সংস্কৃতিতে। দামে কম হওয়ায় এদেশের সাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষের কাছেও বেশ পরিচিত ফলটি। গ্রাম বাংলায় প্রচলিত আছে, ‘কাঁঠাল আর মুড়ি, হয় না এমন জুড়ি’। আবার ইঁচড়ে পাকা প্রবাদটি অপরিপক্ক কাঁঠাল পাকানো থেকে এসেছে। গ্রাম বাংলায় পান্তা, দুধ, চিঁড়া বা খইয়ের সাথে পাকা কাঁঠাল কিংবা সিজা কাঁঠাল বা সিদ্ধ কাঁঠাল খাওয়ার প্রচলন আজও বিদ্যমান।

ভারতীয় ধূসর নকুল

খন্দকার আবু শিহাব

এক.
নকুলের এই প্রজাতির দেখা মিলে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং পশ্চিম এশিয়ায়। শহরাঞ্চলের নির্জন বা পরিত্যক্ত বাড়ি- ঘরে এদের দেখা মিলবে। এছাড়াও বনে, চাষযোগ্য জমিতে এদের দেখা পাওয়া যায়। মানুষের কাছাকাছি বসবাস করলেও এরা মানুষের উপর নির্ভরশীল নয়।

দুই.
ভারতীয় এই নেউলের বৈজ্ঞানিক নাম *-Herpestes edwardsii*। এদের গাঁয়ের রং ধূসর এবং অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় কড়া এবং মোটা। এরা স্তন্যপায়ী প্রাণী।

এদের দেহ ও লেজের দৈর্ঘ্য সমান (প্রায় ৪৫ সে.মি.)। নারীদের দেহের আকৃতি পুরুষদের তুলনায় বড়ো হয়।

মার্চ থেকে অক্টোবর এদের প্রজনন মৌসুম। স্ত্রীরা ৬০-৬৫ দিন গর্ভধারণ করে এবং এরা ২-৩ টি বাচ্চার জন্ম দেয়। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির তথ্য অনুযায়ী, এরা বন্দি অবস্থায়ও ২০ বছর বাঁচতে পারে।

তিন.
ভারতীয় ধূসর নকুল এর শ্রেণিবিন্যাস :

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Carnivora
Family: Herpestidae
Genus: Herpestes
Species: Edwardsi
এদের ৩৪ টি ভিন্ন প্রজাতি রয়েছে।

চার.
এরা খাদ্য হিসেবে টিকটিকি, ইঁদুর, ব্যাঙ, সাপ, ফড়িং গ্রহণ করে। এছাড়াও এরা ফলমূলও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ

করে। এরা অন্য প্রাণীদের ডিম নষ্ট করে। এই প্রজাতিটি কোবরাদের সাথে লড়াই করার জন্য বিখ্যাত।

এদের সাথে সাপের লড়াইটা মূলত এদের টিকে থাকার জন্য। সাপ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এদের মেরে ফেলে, আপরদিকে এরাও নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য সাপদের মেরে ফেলে। শুনলে আবাক হতে হয়, সাপ আর নেউলের লড়াইয়ে নেউলের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা ৮০%।

পাঁচ.
এরা সাধারণত মানুষের কোনো ক্ষতি করে না। যতটা পারে মানুষকে এড়িয়ে চলে (আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লুকিয়ে গেছে)।

তবে এরা জলাতঙ্কে আক্রান্ত হলে, শুধু মানুষ নয়, যে-কোনো পশুপাখিদের পাগলের মতো আক্রমণ করে থাকে। জলাতঙ্কে আক্রান্ত হলে যে-কোনো প্রাণী এরূপ আচরণ করে। এরা সাপ নিধন করে মানুষের অনেক কল্যাণ সাধন করে। তবে এদের কামড় খেলে, আপনি জলাতঙ্কে আক্রান্ত হতে পারেন। সুতরাং এদের এড়িয়ে চলাই ভালো।
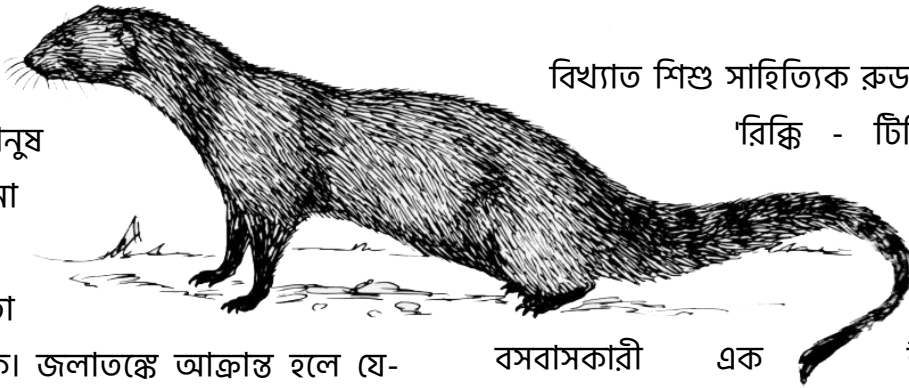
(ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা: আমাদের বাড়ির অনেক মুরগি ও মুরগির ডিমকে এরা নষ্ট করে দিয়েছিল।)

ছয়.
১৮০০ সাল। হাওয়াই দ্বীপের কৃষকরা আখ চাষ করত। তবে ইঁদুররা তাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করত। এজন্য তারা তাদের দ্বীপে বাইরে থেকে নেউল নিয়ে আসে। তবে নেউলগুলোই সেখানকার অনেক প্রজাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় (বিশেষ করে পাখিদের জন্য)।
মিশরের পিরামিডে নেউলের মমি করা দেহ আবিষ্কৃত হয়েছে।
ভারতের চণ্ডীগড়ের জাতীয় পশু এটি।

বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক রুডইয়ার্ড কিপলিং এর 'রিক্কি - টিক্কি -টাবি' নামক গল্পগ্রন্থের নায়ক এক নেউল, যে ভারতে বসবাসকারী এক ইংলিশ পরিবারের গৃহপালিত পশু।

বাংলাদেশের বন (পর্ব- ১)

নাঈম হোসেন ফারুকী

১.

আমি বসে আছি মাচার উপর। গায়ে একটা কম্বল, হাতে একমগ হট কফি। আমার চারদিক পাহাড়ে ঢাকা। একটু বনমোরগ ডাকছিল, কুকুর ডাকছিল, হনুমানের দল হুপহুপ শব্দে মাতাল করছিল বনভূমি। এখন সব চুপ। শোঁ শোঁ করে বাতাস হচ্ছে, আকাশ চিরে যাচ্ছে বিদ্যুতের লকলকে শিখা। তার অপার্থিব গুমগুম শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আশেপাশের পাহাড়ে।

কম্বলটা গায়ে টেনে আমি মাচায় বসে ঠকঠক করে কাঁপছি। বাঘ দেবতার দেখা মিলবে কি আজ রাতে?

২.

এই গল্পগুলো ছিল আমার ছোটোবেলার সঙ্গী। চাহালার মানুষখেকো, এবার চম্পাঝাড়, রুদ্রপ্রয়োগের চিতা - এই টাইপ শিকার কাহিনিগুলো পড়ে আমি বড়ো হয়েছি। শিকারি যখন ঝড় বৃষ্টির অন্ধকার রাতে একা মাচায় বসে ঠকঠক করে কেঁপেছে, ঠিক তার পাশে বসে আমিও কেঁপেছি। শিকারি যখন আফ্রিকার ঘাসবনে অন্ধকারে জ্বলন্ত জোনাকির দিকে রাইফেলের ঘোড়া টিপেছে, আমি ছিলাম ঠিক তার পাশে দাঁড়িয়ে। তিন গোয়েন্দা যখন আমেরিকার বনে তাবুর পাশে বসে ক্যাম্পফায়ার করতো, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমিও বার্বিকিউর ঘ্রাণ নিতাম।

জঙ্গল ছিল আমার আজন্ম ফ্যাসিনেশনের জিনিস, তাবুর নিচে রাত কাটানো ছিল ছোটোবেলার স্বপ্ন। এখন বড়ো হয়ে একটু হলেও চেষ্টা করছি ছোটবেলার অপূর্ণ স্বপ্নগুলো পূরণ করতে। না, শিকারির মাচায় বসে রাত কাটানোর সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু তাবুতে রাত কাটিয়েছি দুবার। নাহ, বাঘের মুখোমুখি এখনও হতে পারিনি, কিন্তু অন্য জিনিস দেখেছি। বাংলাদেশের সাত আটটা বনে ঘোরাঘুরি করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অল্প কিছু অভিজ্ঞতা বলি; এলোমেলো, খাপছাড়া কিছু মুহূর্ত, পুরো গল্প না।

৩.

আমি মালদ্বীপে গিয়েছি, লঙ্কায় গিয়েছি। এসব দেশে বিচের ধারে সাদা ধবধবে বালু পাওয়া যায়। মালদ্বীপে এই বালু বোতলে ভরে ট্যুরিস্টদের কাছে বিক্রি করে, পাঁচ ডলার, দশ ডলারের একেকটা বোতলের গায়ে লেখা থাকে Sands of Maldives.

মালদ্বীপের ওই সাদা পরিচ্ছন্ন বালি আমি বাংলাদেশের একটা জায়গায় পেয়েছি, হবিগঞ্জের সাতছড়ির জঙ্গলে। পুরো ট্রেইল জুড়ে সাদা পাউডারের মতো বালু, আর তাতে পড়ে আছে নানান জাতের জংলি ফল। কিছু আবার কুড়িয়ে খাওয়া যায়। এই জঙ্গলে আমি প্রথম প্রাকৃতিক ফসিল দেখি, বহু লাখ বছর আগের গাছ ফসিল হয়ে শুয়ে আছে সাদা বালির সবুজ জঙ্গলে। এই জঙ্গল থেকে জংলি মাশরুম কুড়িয়ে এনে গাইড কুচি কুচি করে কেটে ভেজে খাইয়েছিল, আজও সেই স্বাদ মুখে লেগে আছে।

সাতছড়ির জঙ্গলে আছে বানর, হনুমান আর বিরাট বড়ো ধনেশ পাখি, আমি নিজে দেখেছি।
এখানে আরও দেখা মেলে উড়ন্ত কাঠবিড়ালিদের। আমরা যেবার গিয়েছিলাম, জাবির প্রাণীবিজ্ঞানের একদল ছাত্রছাত্রী তখন সার্ভে করতে গিয়েছিল। রাতে ক্যামেরা ট্র্যাপ দিয়ে তারা উড়ন্ত অবস্থায় কাঠবিড়ালির ছবি তুলেছিল। উড়ন্ত কাঠবিড়ালি আমার দেখা বাংলাদেশের আরও একটা বনে পাওয়া যায়, নাম রেমা কালেঙ্গা। সেটা আমার সবচেয়ে প্রিয় জঙ্গল। তাকে নিয়ে পুরো আর্টিকেল লিখেছি, দু লাইনে লিখে সেই স্মৃতিগুলোকে আর অপমান না করে বরং অন্য জঙ্গলে চলে যাই।

৪.

গভীর রাত।
আকাশে বিরাট বড়ো একটা চাঁদ উঠেছে।
সুন্দরবনের গভীরে তিনকোনা দ্বীপের কাছে নৌকায় ঘুরছে একদল যাত্রী। উদ্দেশ্য চ্যানেল সাফারি।
নৌকার ইঞ্জিন আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। চারদিক ভূতের মতো নিরবতা। পাড়ের বেঁটেখাটো গাছগুলো সব যেন জরোসরো হয়ে জোছনা গিলছে।
দূরের কালিগোলা অন্ধকারে টর্চ মারলে মাঝে মাঝে অদ্ভুত নড়াচড়া চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে লাইট পড়ে অজানা জ্বলজ্বলে চোখে।

নৌকা থেকে একটু দূরে কিম্ভুতকিমাকার একটা স্ট্রাকচার। পানিতে ভাসছে। নৌকা থেকে টর্চ মারা হলো।

একটা কাঠের গুড়ি। একঝাঁক পাখি ঘুমাচ্ছিল। ভয় পেয়ে উড়াল দিলো তারা। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

আরেকদিন সন্ধ্যা।
আরও এক নাইট সাফারি।
এবার রাত ৯টার দিকে।

জামতলা বিচের কাছ দিয়ে বোট যাচ্ছে। আকাশে চাঁদ নেই। নদীর তীর আরও অন্ধকার হয়ে আছে।

ট্যুর কোম্পানির লোক তীরে আলো টর্চের আলো মারছে। দূরে নানান জাতের চোখ সেই আলো পেয়ে জ্বলজ্বল করছে। কেউ হরিণ, কেউ শুকর।

সেই সময় ঠিক পাড়ের পাশে টর্চের আলো মারাতে একটা বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল। একটা ৮-৯ ফুট লম্বা কুমির মানুষের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষন সামনে এগিয়ে পানিতে ডুবে গেল।

সেই সময় আমার DSLR টাকে একশো বার গালি দিয়েছি। বারবার চেষ্টা করেও সেটা ফোকাস করতে পারেনি, ফ্ল্যাশ মারতে পারেনি। ওটুকু সময়ে মুড সুইচ করে ম্যানুয়ালে নেওয়াও সম্ভব ছিল না। আর সেই সময় আমার টেলি লেন্সও ছিল না।

সুন্দরনে আছে আমার অসংখ্য ছোটো ছোটো অভিজ্ঞতার গল্প। দুইবার ট্যুরে গেছি, প্রতিবারই বহু ছোটো ছোটো গল্প জমেছে। শীতের রাতে ডেকে বসে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে রাজীবের গলায় গান, রাতের বার্বিকিউ পার্টি, ডিনারের পর খুলনার বিখ্যাত ঘোষ ডেইরির মিষ্টি, জাহাজে ছাত্রলীগের সহযাত্রী ভাইদের দেওয়া এক ঝুড়ি কুচো চিংড়ি ভাজার ট্রিট (সেই স্বাদ। এরা বারবার জাহাজে ভাইসব, প্রিয় সভাপতি, প্রিয় সম্পাদক এসব বলে বলে যে কান ঝালাপালা লাগিয়েছিল কুচো চিংড়ি খেয়ে ওসব অনেকটাই ভুলে গেছি)।

আর আছে বাঘের গল্প।
না, উত্তেজিত হওয়ার আগেই বলি, আমি কোনোদিন সুন্দরবনে বাঘ দেখিনি। চিড়িয়াখানার বাইরে কোথাও দেখিনি। বাঘ জিনিসটা সুন্দরবনে ইয়েতির মতো, খালি গল্প শোনা যায়, দেখা যায় না। আসল গল্প শুরু করার আগে বলি, বনের কোনো প্রাণীই সহজে দেখা দিতে চায় না। বানররা বহু দূরে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। করমজল, হাড়বাড়িয়া টাইপ ট্যুরিস্ট স্পট না হলে এরা গায়ের কাছে আসে না, আর হরিণের পাল বহু দূরে ঝোঁপে ঝাড়ে গাছপালা খেয়ে বেড়ায়। আর বাঘের দেখা পাওয়া মানে হচ্ছে তুমি বিরাট বড়ো কপাল নিয়ে জন্মেছ, বাঘের পেটে যাওয়া মানে ওই তোমার চৌদ্দ গোষ্ঠী বিরাট বড়ো বড়ো কপাল নিয়ে জন্মেছে।

যাহোক, সাধারণত কপাল যা-ই হোক না কেন আর বাঘ যত রেয়ারই হোক না কেন, বাঘের পেটে যাওয়ার শখ কারোই থাকে না। প্রতিটা ট্যুরিস্ট দলের সাথে বন্দুকধারী গার্ড থাকে, এরা বনে ঢোকার আগেই ফাঁকা গুলি ছুড়ে বাঘকে জানিয়ে দেয় *ভাই আমরা আসছি, একটু দূরে যেয়ে হাঙ্কি পাঙ্কি করো*। এই কথা বাঘ যদি শুনে তো ভালো, না শুনলে আসলেই কিছু করার নেই। সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট স্পটগুলোর নিচে থাকে কাঁদা, উপরে কাঠের ব্রিজের মতোলম্বা ট্রেইল, সেটার উপর দিয়ে ট্যুরিস্টরা হাঁটে। জঙ্গলে কীভাবে চলাচল করতে হয়ে এদের বিন্দুমাত্র আইডিয়া নাই, এরা ছোটো বড়ো নানান দলে ভাগ হয়ে যায়, একেকটা দলের মাঝে বিশাল গ্যাপ থাকে, আর এরা নিজেরা ব্যস্ত থাকে হই হুল্লোরে আর সেলফি তোলায়। গার্ড থাকে অনেক দূরে, বাঘ আসলেই আসলে তার কিচ্ছু করার নাই।

তো এমনি এক ট্যুরিস্ট পার্টির সাথে জামতলা বিচের ওপাশে আমি আর আমার ভাই ট্রেইল ধরে যাচ্ছিলাম। ট্যুরিস্ট পার্টি হই হুল্লোর আর সেলফি তোলায় ব্যস্ত ছিল, তাদের চিৎকার চেচামেচিতে বনের সব নিরীহ পশু দূরে ভাগছিল (বাঘ পেট ভরা থাকলে বিরক্ত হচ্ছিল, নাহলে দু একটাকে ধরে পেট ভরানোর ফন্দি আটছিল।) আমার ভাই ট্রেইলে কোনো পশুপাখি দেখতে না পেরে বিশাল বিরক্ত, সে ঠিক করল ট্যুরিস্টরা একটু চলে গেলে সে ট্রেইল ধরে ব্যাক করবে (এতে বাঘের রিস্ক আরও বাড়বে বলার অপেক্ষা থাকে না, কিন্তু বুঝাবে কে! আমার ভাই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘাড়তেড়া মানুষদের একজন।)

যেই ভাবা সেই কাজ, সে ব্যাক করল। পিছে পিছে আমিও। এটা সেই ১৭ সালের কথা, ট্যুরে আমার বাবা মাও আছে সাথে, তারা অন্য ট্যুরিস্টদের সাথে সামনে

এগিয়ে গেছে। এইবার ভয়ে ভয়ে বনের আড়াল থেকে বের হয়ে আসলো পশুপাখি। মা শুকর, বাচ্চা শুকর বহু দূরে বনের আড়াল থেকে ঘাস খেতে বের হলো। সেতু থেকে নামার পর একটা বনবিড়াল আমাদের আত্মা কাঁপিয়ে দিয়ে রাস্তা ক্রস করে এক ঝোঁপ থেকে অন্য ঝোঁপে লাফ দিলো। একটু দূরে একটা পুকুর, সেটার ওই পাড়ে বাঘের সন্ধান পাওয়া যায় শুনেছি!

তো বাঘ নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা কী হলো? গল্পের বাকিটা মিলবে আগামী ব্যাঙাচিতে।

বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান: আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত বিশেষ ধরনের জায়গা। তা হতে পারে কোনো বন, পাহাড়, হ্রদ, মরুভূমি, স্মৃতিস্তম্ভ, দালান, প্রাসাদ কিংবা শহর। প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্যে সুন্দরবন স্থান পেয়েছে।

বেঙ্গল ফ্লোরিকেন

কে এস বড়ুয়া

পাখি দেখাটা আমার একটা প্রিয় শখ। তাই গ্রামে আমি সবসময় যাই। একদিন গ্রামের রাস্তায় হাঁটার সময় একটি গাছের দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে এবং দাঁড়িয়ে যাই এবং এই পাখিটি দেখার সৌভাগ্য আমার হবে আমি জীবনে ভাবিনি। আমার ঠাকুরদা বিজ্ঞান এবং পাখি প্রেমী ছিল, তার থেকেই পাখির প্রতি ভালোবাসা আমার মনে জন্মায়। উনার ব্যক্তিগত পাখি পর্যবেক্ষণের নোট থেকেই আমি এই পাখিটি প্রথম ছবি দেখি যা তার নিজের হাতে আঁকা এবং পাখিটির নাম বেঙ্গল ফ্লোরিকেন বা বেঙ্গল বাস্টার্ড।

বাংলাদেশে একসময় সব জায়গায় পাওয়া যেত বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান। বাংলাদেশে এখন এই পাখিটি প্রায় নেই বললেই চলে। এই পাখিটি ভারতীয় উপমহাদেশ, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, নেপালে বাস করে। পাখিটির রং কালো, বাদামি এবং সাদা হয়। এই পাখিটি ভারতের তরাইয়ের বনভূমি, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়া এবং অরুণাচলপ্রদেশে এখনো দেখা যায়। IUCN (International Union for Conservation of Nature) এর জরিপে ২০১৩ সাল হতে বর্তমানে এদের সংখ্যা কমে ৯৫০০তে এসেছে। এর বৈজ্ঞানিক নাম (*Houbaropsis bengalensis*)।

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
class : Birds,
Order : Otidiformes
Family : Otididae

বহুরঙা উড়ন্ত কাঠবিড়ালী

রাজেশ মজুমদার

২০১৭ সালের কথা। গরমের ছুটিতে কয়েকজন বন্ধুর সাথে সিলেটের 'সাতছড়ি ন্যাশনাল পার্ক'এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। মূলত অন্যান্য অনেক দর্শনীয় স্থানে বেড়ানোর সাথে সংযুক্ত হয়েছিল এটি। প্রায় ৬০০ একরের বিরাট একটা বন! তো আমরা বিকালে ঘুরতে বেড়িয়েছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়াতে ফিরে আসছিলাম। দুই পাশে বন, আর মাঝের ট্রেইল ধরে হাঁটছিলাম আমরা। চারিদিকে পাখির ডাকাডাকি। প্রায় ২০০ প্রজাতির পাখির দেখা পাওয়া যায় এখানে। পাখির ডাকাডাকিতে যেন অন্য জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। হয়তো এরাও আমাদের মতো সারাদিনের পরিশ্রম ও ঘোরাঘুরির শেষে বাসায় ফিরে এসেছিল। হঠাৎই এক বন্ধু আমাদের থামিয়ে দিয়ে একটু দূরে একটি গাছের দিকে ইশারা করলো। আমি প্রথমে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলাম না। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে ভালো দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর খেয়াল করে দেখলাম, ছোট্ট এক কাঠবিড়ালী। গাছের উপর বসে কী যেন খাচ্ছে! প্রথমে ভেবেছিলাম এরকম কাঠবিড়ালী তো হরহামেশাই আমাদের গ্রামে দেখা যায়, সারাদিন খালি

গাছের ফল চুরি করতে এবং গাছে গাছে লাফালাফি করতে ব্যস্ত থাকে। পাশের বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করতেই বললো,"এটি 'বহুরঙা উড়ন্ত কাঠবিড়ালী'। এই বনের স্পেশাল একটা প্রাণী!" ছবি তুলতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পাতার আড়ালে থাকার কারণে ছবি তুলতে পারিনি। এর মধ্যেই যেন বাতাসে ভেসে অন্য একটি গাছে চলে গেল কাঠবিড়ালীটি। কিছুক্ষণ পর আরো কিছু গাছ পেরিয়ে বনের ভেতর হাওয়া হয়ে গেল! তখনো জানতাম না যে, এটি বাংলাদেশে একটি বিরল প্রজাতির প্রাণী। তবে এখনো ওই ঘটনার কথা মনে পড়লে রোমাঞ্চিত হই। আমাদের ভাগ্য অত্যন্ত ভালো ছিল কারণ এরা সাধারণত নিশাচর প্রাণী। দিনে এদের দেখা পাওয়া খুব মুশকিল। গাছের কোটরে থাকে এসময়

তারা। হয়তো সন্ধ্যার সময় খাবারের খোঁজে বেরিয়েছিল এটি। এছাড়া উড়ন্ত অবস্থায় এদের ছবিও কেউ তুলতে পারেনি। ওদের কথা বলার আগে উড়ন্ত কাঠবিড়ালী সম্পর্কে কিছু বলে নিই।

'উড়ন্ত কাঠবিড়ালী' নাম শুনলেই মনে হয় তারা পাখির মতো উড়তে পারে। কিন্তু আসলে তা নয় অন্যান্য কাঠবিড়ালীর মতো দেহের গড়ন হলেও এদের সামনের দুই হাতের এবং পেছনের দুই পায়ের আঙ্গুলের মাঝে একটা পাতলা চামড়া যুক্ত থাকে। এরা শরীরকে প্রসারিত করে হাওয়ায় ভেসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। অনেকটা প্যারাশুট পরে গ্লাইড করার মতো। তাদের লম্বা লেজ এই গ্লাইড করার সময় তাদের সাহায্য করে। গ্লাইড করার সময় এরা প্রায় ৯০ মিটারের মতো দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। সারা বিশ্বে প্রায় ৫০ প্রজাতির উড়ন্ত কাঠবিড়ালী দেখা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৩ প্রজাতির উড়ন্ত কাঠবিড়ালীর দেখা পাওয়া যায় বাংলাদেশে। তন্মধ্যে অন্যতম একটি প্রজাতি হলো 'বহুরঙা উড়ন্ত কাঠবিড়ালী'। বহুরঙা উড়ন্ত কাঠবিড়ালী (ইংরেজি: Particolored flying squirrel) (বৈজ্ঞানিক নাম:Hylopetes alboniger) হচ্ছে হিলোপিটিস গণের একটি ছোটো উড়ন্ত কাঠবিড়াল।

তবে বর্তমানে বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির তালিকায় এদের নাম দেখতে পাওয়া যায়। বন ধ্বংস ও চোরাশিকারিদের হামলায় ক্রমেই বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। International Union for Conservation of Nature বা IUCN এদেরকে Red list এ ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তবুও এখন এদের দেখা পাওয়া খুবই মুশকিল।

শ্রেণিবিন্যাসঃ
জগৎ:Animalia
পর্ব:Chora
শ্রেণী:Mammalia
বর্গ:Rodentia
পরিবার:Sciuridae

গণ:Hylopetes
প্রজাতি:H. alboniger

এদের দ্বিপদী নাম: *Hylopetes alboniger* (Hodgson, 1836)। বহুরঙা উড়ন্ত কাঠবিড়ালীর কান তুলনামূলকভাবে বড়ো, কানের গোড়া বাঁকানো নয়। এদের চ্যাপ্টা লেজ স্পষ্ট ডিস্টিকিউয়াস, লেজের নিচের পৃষ্ঠে খাটো চুল থাকে। পায়ের তলে সহায়ক কোনো প্যাড থাকে না। এদের কর্তন দাঁত ফ্যাকাসে হলুদ। পিলেজ মাঝারি ধরনের পুরু; দেহতল কালচে ধুসরাভ-বাদামি কিংবা লালচে-বাদামি ও পিঠ সাদা। পা ও লেজ কালচে বাদামি। অপ্রাপ্তবয়স্ক কাঠবিড়ালীর পিঠ কালো ও দেহতল সাদা। এদের মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্য ২৫-৩০ সেমি এবং লেজ ২৫-৩০ সেমি।

কাঠবিড়ালী সাধারণত গাছের ফলমূল, বাদাম, বাকল, বাকলের নিচের পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে। তবে বহুরঙা উড়ন্ত কাঠবিড়ালির পছন্দের খাবার তেঁতুলের বীজ।
এরা মূলত নিশাচর, সন্ধ্যার সাথে সাথে বের হয়। এছাড়াও রসালো ফলমূল, বীজ, কুড়ি, পাতা ইত্যাদিও খেয়ে থাকে। এরা সচরাচর লোকালয়ে আসে না। এই প্রজাতির কাঠবিড়ালী জোড়ায় জোড়ায় থাকতে পছন্দ করে। এরা পাতা, খড়কুটো, শৈবাল ও অন্যান্য নরম উপকরণ দিয়ে তৈরি গাছের গর্তে অথবা মগডালে অগোছালো বাসা বানায়। নিরাপদ মনে হলে একই জায়গায় ওরা বারবার বাসা করে। আর এই বাসা কেবল প্রজননের জন্য নয়, ঘুমানোর জন্যও ওরা ব্যবহার করে। মেয়ে কাঠবিড়ালী বছরের মার্চ-এপ্রিল মাসে দুই থেকে চারটি বাচ্চা প্রসব করে। জন্মের সময় এরা অন্ধ ও লোমহীন থাকে।

সিলেটের চিরসবুজ বন ও বান্দরবানের বনাঞ্চলগুলোতে কদাচিৎ দেখা মেলে। এক গবেষণায় দেখা গেছে,'সাতছড়ি ন্যাশনাল পার্কে' প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ০.৬ টি 'বহুরঙা উড়ন্ত কাঠবিড়ালী' খুঁজে পাওয়া যায়। লাউয়াছড়া, রেমা-কালেঙ্গা এবং আদমপুরে এই হার আরো কম। বেশিরভাগ গবেষক বলে থাকেন, খাবারের অভাব এবং চোরা শিকারিদের কারণে এদের হার অত্যন্ত কমে গিয়েছে। এদের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশ ছাড়াও ভুটান, কম্বোডিয়া, চীন, ভারত, লাওস, মিয়ানমার, নেপাল, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামেও এই 'বহুরঙা উড়ন্ত কাঠবিড়ালী'দের দেখা পাওয়া যায়। আমাদের আশেপাশেই এরকম অনেক জীব প্রজাতি আছে যারা বিলুপ্তির পথে যেতে চলেছে। এখন থেকেই ব্যবস্থা না নিলে একসময় তারা হয়তো কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। তাই কোনো কাঠবিড়ালী যদি আপনার গাছের ফল খেয়ে ফেলে তাহলে তাড়ানোর চেষ্টা করবেন, দয়া করে কখনো মেরে ফেলবেন না। কারণ, আমাদের চারপাশের সব পশু-পাখি-উদ্ভিদ নিয়েই আমাদের পরিবেশ। আর পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সবুজ ময়ূর, বৈজ্ঞানিক নাম: *Pavo muticus*। বাংলাদেশে বিলুপ্ত।

কালোমুখ প্যারাপাখি বা মুখোশপরা জলার পাখি, বিপন্ন এখন। বৈজ্ঞানিক নাম: *Heliopais personatus*।

ডোরাকাটা হায়না, বৈজ্ঞানিক নাম: *Hyaena hyaena*

মেঘলা চিতা, কিউট প্রাণীটা এখন শঙ্কাগ্রস্ত (VU) । বৈজ্ঞানিক নাম: *Neofelis nebulosa*

বাদা/জলার হরিণ (বারো শিঙা হরিণ), বৈজ্ঞানিক নাম: *Rucervus duvaucelii*।

সারস, বৈজ্ঞানিক নাম: *Grus antigone*।

গোলাপি হাঁস, বৈজ্ঞানিক নাম: *Rhodonessa caryophyllacea*, মহাবিপন্ন প্রজাতির প্রাণী।

লাইফ অফ প্রোটন

তানভীর রানা রাব্বি

হেই হোয়াটস আপ? আজকে কথা হবে 'লাইফ অফ পাই' থুক্কু 'লাইফ অফ প্রোটন' বা প্রোটন কণার জীবকাল নিয়ে। আমি যখন ৯-১০ এ পড়তাম তখন এই প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, আলো, ইত্যাদির আয়ু বা জীবনকাল নিয়ে মনে অনেক প্রশ্ন জাগত কিন্তু সেসয় সেগুলো জানতে পারতাম না। তো এখন ইন্টারনেটের খাতিরে এসব বিষয়ে নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে জানতে পেরেছি। তো চলুন দেখা যাক প্রোটনে ব্যাপারটা।

বিজ্ঞানের রহস্যের বেড়াজালে ঘূর্ণনরত অসংখ্য অমীমাংসিত রহস্যের একটি হলো দ্যা গ্রেট লাইফ অফ প্রোটন। প্রোটনের জীবনকাল নিয়ে বিজ্ঞান মহলে আজও অমীমাংসিত সমাধান প্রবাহিত হচ্ছে। যে প্রবাহটার শেষ কোথায় বা আদৌ শেষ হবে কি না তা প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের চরম উন্নতির এ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কেউ সমাধান দিতে পারছেন না। প্রোটনের জীবনকাল ব্যাপারটা এখনো পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান রহস্যগুলোর একটি। তো চলুন দেখে আসা যাক।

ব্যাপারটা। রহস্যটা জানার আগে আমাদের জানা দরকার এই প্রোটনটা আসলে কী? প্রোটনের অবস্থানই বা কোথায়? প্রোটনের অস্তিত্বই বা কী?

প্রোটন:

মানব সভ্যতার শুরুর দিকে যদিও মনে করা হতো প্রকৃতির প্রত্যেকটি পদার্থ বা বস্তু চারটি মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত। আর সেই চারটি উপাদান হলো আগুন, পানি, বাতাস এবং মাটি। এই ধারণাটি অবশ্য সেই প্রাচীন গ্রিক আমলের। কিন্তু সময় আর বিজ্ঞান বিপ্লবের কারণে প্রাচীন সেই মতবাদটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়। ধীরে ধীরে বিজ্ঞান মহলে 'পরমাণু তত্ত্ব' ধরা দিতে শুরু করে। পরমাণু তত্ত্বের প্রথম পর্যায়ে ধারণা করা হতো প্রত্যেক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থকে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্লেষণ করলে যে জিনিসটি পাওয়া যায় তা হলো পরমাণু। অর্থাৎ পরমাণুই হলো যেকোনো পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। এই পরমাণুকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যাবে না। উপরোক্ত এই ধারণাটির প্রবক্তা ছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন। যিনি একাধারে রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, এবং বায়ুবিজ্ঞানবিদ ছিলেন।

যদিও মহান এ বিজ্ঞানীর ধারণা বা আবিষ্কারটি ভুল ছিল, তবুও তার হাত ধরেই বর্তমান 'পরমাণু তত্ত্ব' পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে পূর্ণতা বলা ঠিক হবে না। কেননা পরমাণুর অসীম রহস্যের খুবই সামান্য আমাদের কাছে উম্মোচিত হয়েছে। তবে বলতে গেলে তার হাত দিয়েই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে তাই তাকে ক্রেডিট দেওয়া যেতেই পারে।

জন ডাল্টনের মতবাদকে পেছনে ফেলে বিজ্ঞানীরা তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর গবেষণার মাধ্যমে পরমাণু তত্ত্বকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিলেন। গবেষণায় বেরিয়ে আসলো পরমাণু যদিও পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, কিন্তু এই ক্ষুদ্রতম অংশকেও আরো বিভক্ত করা যায়। অর্থাৎ পরমাণুকেও ভাঙা যায়। আর ভাঙার ফলে যা বেরিয়ে আসে তা হলো তিনটি মৌলিক কণিকা- ইলেকট্রন, নিউট্রন এবং প্রোটন। নিউট্রন এবং প্রোটন পরমাণুর ভেতরে একই সাথে অবস্থান করে। তাদের সমন্বিত রূপকে বলা হয় নিউক্লিয়াস। আর সেই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে ইলেকট্রন। ইলেকট্রন ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত। অপরদিকে প্রোটন ধনাত্মক চার্জ যুক্ত এবং নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই।

পরমাণু তত্ত্বের বিরাট এই উন্নতির ফলে বিজ্ঞান জগতসহ স্বাভাবিক পৃথিবীর সর্বত্র নেমে আসে উন্নতির জোয়ার। পরমাণুর এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যা করতে থাকে আমাদের চিরচেনা পৃথিবীর অজানা অনেক রহস্যকে। পরমাণুর মাঝে অবস্থিত মৌলিক তিনটি কণার মধ্যে ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন নোবেল বিজয়ী ব্রিটিশ পদার্থবিদ জে.জে থমসন (Judith Jarvis Thomson) ১৮৯৭ সালে তার 'ক্যাথোড রে' পরীক্ষার মাধ্যমে। নিউট্রন আবিষ্কার করেন আরো এক ব্রিটিশ নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ জেমস চ্যাডউইক ১৯৩২ সালে। আর প্রোটন আবিষ্কার করেন নিউজিল্যান্ডের পদার্থ বিজ্ঞানী এবং নোবেল পুরুস্কার বিজয়ী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড ১৯১৯ সালে।

ইলেকট্রন, নিউট্রন, প্রোটন এবং এদের গঠন, এদের অবস্থান, একে ওপরের প্রতি এদের বন্ধন, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যার জন্যে রয়েছে হাইজেন বার্গের অনিশ্চয়তার নীতি, আউফবাউ নীতি, ফার্মি তত্ত্ব, হিগস বোসন তত্ত্ব, ডিরাক তত্ত্ব , কোয়ান্টাম তত্ত্ব, কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরি, স্ট্যান্ডার্ড মডেল সহ আরো বিভিন্ন তত্ত্ব। ওই সকল তত্ত্ব আর বিশ্লেষণে মৌলিক কণিকা গুলোর গভীর আলোচনা করা হয়ে থাকে। যেখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক, ফোটন, গ্লুয়ন, গ্রাভিটি, কণার তরঙ্গ, কণার শক্তি, কণার ভরবেগ, কণার উপস্থিতির সম্ভাব্যতা ইত্যাদি জটিল বিষয়াদি।

আমি সেদিকে যাব না। কেননা ইতিমধ্যে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু বা কোন 'প্রোটন' পেয়ে গেছি। স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুসারে প্রোটন গঠিত হয় দুটি আপ কোয়ার্ক এবং একটি ডাউন কোয়ার্ক এর সমন্বয়ে। প্রোটনকে বলা হয় ব্যারিওন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কণিকা এবং এটি ফার্মি পরিসংখ্যান মেনে চলে। প্রোটনে অন্তর্গত দুটি আপ কোয়ার্ক এবং একটি ডাউন কোয়ার্ক যে শক্তির মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে থাকে বলা হয় স্ট্রং ফোর্স এবং এদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অবস্থান করে গ্লুয়ন। এর স্পিন হলো ½। প্রোটনের ভর হলো $1.673*10^{-27}$ কে.জি।

প্রোটনই হলে আমাদের আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। প্রোটনের গড় আয়ুষ্কাল ধরা হয় $2.1*10^{29}$ বছর। প্রোটনের এই আয়ুষ্কাল নিয়ে রয়েছে বহুত জল্পনা কল্পনা (প্রোটনের এই আয়ুষ্কাল সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে যা আমরা এখন আলোচনা করব না)।

পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় হাফ লাইফ (Half Life) বা অর্ধায়ু, ডিকে (Decay) বা ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, রেডিওএকটিভ ডিকে (Decay) বা তেজস্ক্রিয় ক্ষয় বলে কয়েকটি শব্দ রয়েছে। যারা আমার মত ইন্টারমিডিয়েটে পড়েন বা পার করে এসেছেন তাদের কাছে এগুলো পরিচিত। এগুলো দিয়ে বিভিন্ন পদার্থের বা কণিকার জীবনকাল বা অর্ধায়ু নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ একটি পদার্থ কতদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে বা কতদিনে এটি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে পরিমাপ করা হয়।
যদিও আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু বা পদার্থের বা মৌলিক ওই কণিকাগুলোর জীবনকাল নির্ধারণ করা হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রোটনের ক্ষয়প্রাপ্ত (Decay) হওয়ার ব্যাপারটা এখনো বিজ্ঞান জগতে প্রকল্পিত (Hypothetical) রয়ে গেছে।

ধারণা করা হয় পাইওন এবং পজিট্রন নামক অতি পারমাণবিক কণা তেজস্ক্রিয় নিঃসরণের মাধ্যমে প্রোটন আরো হালকা কণায় পরিণত হয়। কিন্তু এই ধারণাটি পরীক্ষামূলকভাবে সত্য নয়।

স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুসারে ব্যারিওন শ্রেণির কণিকা স্থায়ী। সেজন্য স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুসারে প্রোটন ব্যারিওন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এবং প্রোটন ক্ষয়ের মাধ্যমে অন্য কণিকায় রূপান্তরিত হয় না। কেননা ব্যারিওন নাম্বার (কোয়ার্ক নাম্বার) কে সবচাইতে হালকা বলে ধরা হয়।

স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক কণা বা বস্তু নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তা পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত অবস্থা অবলোকন করা যায়। কিন্তু এই প্রোটনের জীবনকাল এতই দীর্ঘ যে বিগ ব্যাং (Bing Bang – বৃহৎ বিস্ফোরণ) হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবী সৃষ্টির বয়স প্রায় বারো থেকে চৌদ্দ বিলিয়ন বছর ($14*10^{9}$ বছর) হওয়া সত্ত্বেও প্রোটনের অন্তিম দশা অবলোকন করতে বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়েছে। কোনো পদার্থ বা কণার অন্তিম দশা পূর্ণ রূপে জানতে হলে পদার্থ বিজ্ঞানে যে প্রক্রিয়াটি অবলম্বন করা হয় তা হল অর্ধায়ু বা হাফ লাইফ (Half Life)।

তো ধরা যাক – ১০০ গ্রাম ভরের কোনো পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ৫০ গ্রামে পরিণত হতে সময় লাগে ১০ বছর। ৫০ গ্রাম থেকে ক্ষয় হয়ে ২৫ গ্রামে পরিণত হতে সময় লাগে আরো ১০ বছর। ২৫ গ্রাম থেকে ১২.৫ গ্রামে পরিণত হতে সময় লাগে আরো ১০ বছর। ১২.৫ গ্রাম

থেকে ৬.২৫ গ্রামে পরিণত হতে সময় লাগে আরো ৯০ বছর। ৬.২৫ গ্রাম থেকে ৩.৯২৫ গ্রামে পরিণত হতে সময় লাগে আরো ৯০ বছর। এভাবেই ওই পদার্থ শূন্য অবস্থানে এক সময় পৌঁছাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের ধরে নেয়া পদার্থের হাফ লাইফ (Half Life) বা অর্ধায়ু হল ৯০ বছর।

যদিও ধারণা করা হয় প্রোটন নামক ওই ব্যারিওন শ্রেণির কণিকার ক্ষয় হয় না। সেটা স্থায়ী একটি কণিকা। কিন্তু গ্র্যান্ড ইউনিফাইড থিওরি (GUTs) অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে যে প্রোটনের ক্ষয় হওয়া সম্ভব। প্রোটনের ক্ষয় হওয়া সম্পর্কে সর্বশেষ গবেষণা পাওয়া গেছে জাপানের সুপার কামিওকান্ডি (Super-kamiokande) ওয়াটার চেরেনকোভ রেডিয়েশন (Cherenkov Radiation) ডিটেক্টরের মাধ্যমে। ওই ডিটেক্টরের পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রোটনেরও অর্ধায়ু রয়েছে। আর তা হল- $1.6710*10^{34}$ বছর। ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার সময় প্রোটন থেকে পজিট্রন নিঃসরিত হয়। আরো একটি পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, প্রোটন ক্ষয়ের সময় এন্টিমিওন (Antimuon) নিঃসরিত হয় এবং তখন হিসাব নিকাশের মাধ্যমে দেখা যায় যে প্রোটনের অর্ধায়ু $1.0810*10^{34}$ বছর।

এই হিসাবটা আবার সুপার সিমেট্রি (Super Symmetry) তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুপার সিমেট্রি অনুসারে বলা হয়ে থাকে প্রোটনের অর্ধায়ু 10^{34} থেকে 10^{36} বছর।

গ্রান্ড ইউনিফিকেশন থিওরী – যেমন SU(5), Georgi-Glashow Model অনুসারে প্রোটন ক্ষয়ের সময় তা থেকে পজিট্রন (Positron) এবং নিউট্রাল পাইওন (Neutral Pion) নির্গত হয় এবং তার সাথে গামা রশ্মিও নির্গত হয়। বিভিন্ন থিয়োরি আর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে ধারণা করা হয় প্রোটন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এর অর্ধায়ু রয়েছে।

প্রোটনের অর্ধায়ু থাকুক আর না থাকুক, প্রোটনের যে জীবনকাল রয়েছে তার গড় হিসাব ধরা হলো 10^{32} থেকে 10^{34} বা মতান্তরে 10^{36} বছর অর্থাৎ প্রোটনের অন্তিম দশা অবলোকন করা আদৌ সম্ভব কি না বিজ্ঞান এ ব্যাপারে এখনো কোনো সদুত্তর দিতে পারছে না।
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রোটনের অর্ধায়ু 10^{32} থেকে 10^{34} বছর।

ধরা যাক প্রোটনের অর্ধায়ু 10^{32} বছর।

তাহলে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বা পরিমাণের প্রোটন অর্ধেকে পরিণত হতে সময় লাগবে 10^{32} বছর। তারপর অবশিষ্ট অর্ধেক আবার আরো অর্ধেকে পরিণত হতে সময় নেবে 10^{32} বছর। এভাবেই চলতে থাকবে (উপরে প্রদত্ত হাফ লাইফ (Half Life) হিসাব অনুসারে)। আর হয়তো একসময় প্রোটন শূন্য পর্যায় উপস্থিত হবে। কিন্তু কথা হলো সে পর্যায় উপস্থিত হতে কত বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়...ন.....ন ……………… বছর লাগবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

উল্লেখ্য যে ,
১। বিগ ব্যাং (Bing Bang – বৃহৎ বিস্ফোরণ) অনুসারে এই মহাবিশ্বের বয়স প্রায় ১৪ বিলিয়ন বছর (১৪ টাইমস ১০ টু দি পাওয়ার ৯ বছর = ১৪০০০০০০০০০ বছর)।
২। একটি প্রোটনের জীবনকাল হতে পারে 10^{32} থেকে 10^{34} বছর মতান্তরে 10^{29} বছর।

৩। প্রোটনের অর্ধায়ু প্রায় 10^{32} থেকে 10^{34} বছর।

দেখা যাচ্ছে বিগ ব্যাং (Bing Bang – বৃহৎ বিস্ফোরণ) অনুসারে মহাবিশ্বের যে বয়স তা দিয়ে কোনোভাবেই প্রোটনের সম্পূর্ণ বয়সকে পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিজ্ঞান এখনো প্রোটনের চিরচেনা রূপকে অন্তিম দশায় নিয়ে বর্ণনা করতে সত্যি ব্যর্থ। কেননা প্রোটনের অন্তিম রূপ কী হতে পারে তা আমরা এখনো জানি না।

একটা বিষয়, সাধারণ ভাবে পড়তে গেলে লেখাটির মধ্যে কিছু অজানা নাম বা তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। লেখা সংক্ষেপের তাগিদে সেগুলো ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে সেসব ব্যাপারে জানার ইচ্ছা থাকলে অবশ্যই সেটা গুগল মামাকে জিজ্ঞেস করবেন। আর এতক্ষণ ধরে আজাইরা এই বকবকানি পড়ার জন্য ধন্যবাদ।

সায়োনারা!
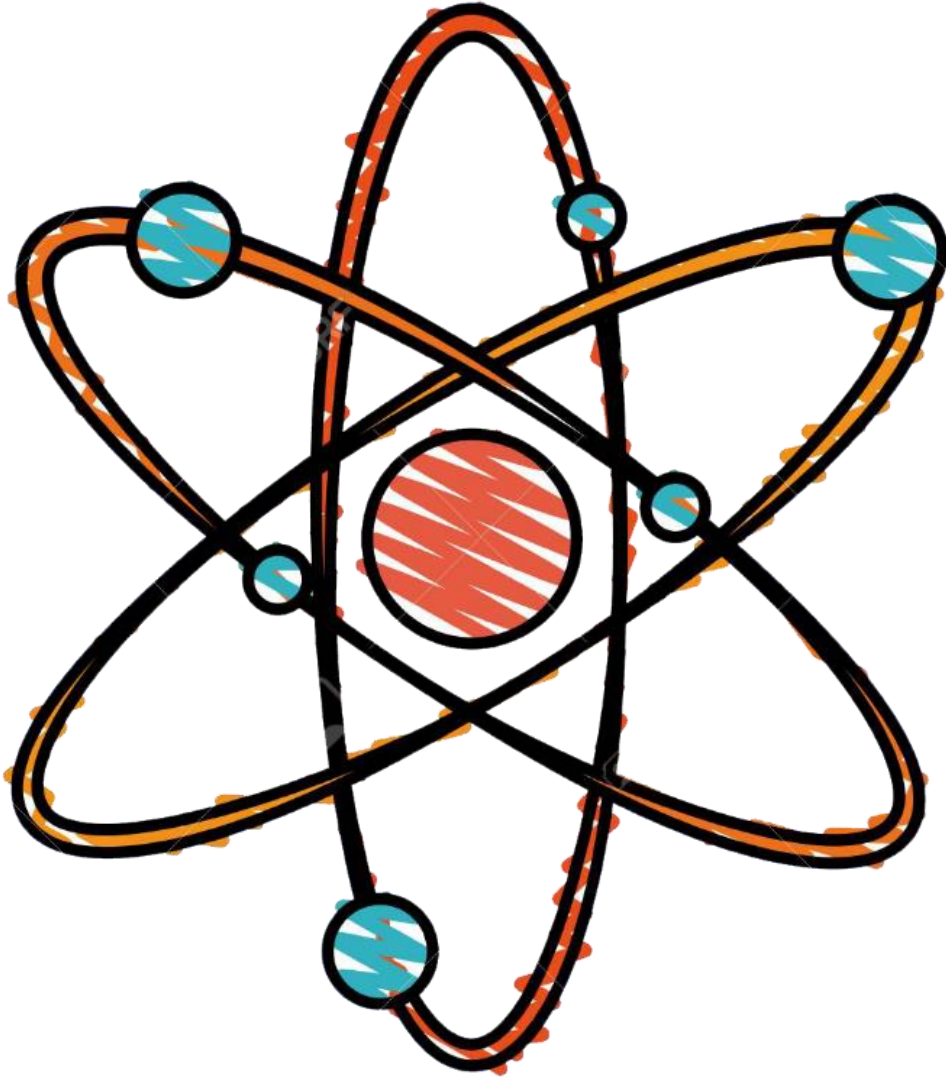
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী

রিজুফা জামান শোভা

"হঠাৎ কীসের মন্ত্র এসে
ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে
বাদল বেলার কথা,
হারিয়ে পাওয়া আলোটিরে
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
বেড়ার ঝুমকোলতা।"

-(রবি ঠাকুরের 'বৃষ্টি রৌদ্র' কবিতার কিয়দংশ)

বুনো ঝুমকোলতা'/'জংলি ঝুমকোলতা

এই মনোহারিণীর পোশাকি নাম হচ্ছে 'শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী'। উচ্চারণ করতে যেন দাঁত ভেঙে যায়। Kidding! মানবদেহের সবচেয়ে শক্ত পার্ট হলো টুথ এনামেল। এত সহজে ভাঙবে না। অ্যানিওয়ে, এই এত্ত বড়ো নামকরণের হেতু যতটুকু জানতে পেরেছি তা হলো:

ভারতের কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশের হিন্দুধর্মাবলম্বীরা এ ফুলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবদের মিল খুঁজে পান। তাঁদের মতে নীলবর্ণ চতুর্ভুজা সত্যনারায়ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। তাঁর চার হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম; আর ঝুমকোলতা ফুলের কয়েকটা অংশ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম সদৃশ। So...
ঝুমকোলতার অন্যান্য ও আঞ্চলিক নাম: রাধিকা নাচন, কৃষ্ণকমল, রাখি ফুল, রাখালিয়া, কৌরভ পাণ্ডব পুষ্প, পঞ্চপাণ্ডব পুষ্প।

৫০০+ প্রজাতির ঝুমকোলতা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে *Passiflora foetida* একটি, যেটাকে আমরা 'বুনো ঝুমকোলতা' বা 'জংলি ঝুমকোলতা' বলে থাকি। ইংরেজিতে Stinking Passion flower.

ওয়েট, Stinking? মিনস দুর্গন্ধযুক্ত?! Oops!

এত সুন্দর ফুল থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ আসলে কি মানা যায়?

মোটেই না।

বাই দ্য ওয়ে, ল্যাটিন শব্দ ফোয়েটিডাই (foetida) হচ্ছে ইংলিশে স্টিঙ্কিং।

এর আরো কিছু ইংরেজি কমন নাম: Wild Maracuja, Bush Passion Fruit, Wild Waterlemon, Stoneflower, Love-in-a-mist or Running Pop.

ঝুমকোলতা সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মতো চিরসবুজ, বহুবর্ষজীবী লতানো স্বভাবের গাছ। সাধারণত বর্ষাকালে ফুল বেশি ফোটে। ফুল বড়ো, চক্রাকার। বুনো ঝুমকোলতার রং সাদা থেকে কিছুটা বেগুনি বর্ণের। পাতাগুলো গভীর খাঁজে বিভক্ত, অগ্রভাগ সুচালো, ত্রি বা পঞ্চকোণাকৃতির।

ফলের ওপরে প্রাথমিক পর্যায়ে জালের মতো আবরণ থাকে। পরিপক্ক হলে ফলটা হলুদাভ কমলা রং ধারণ করে। এর মধ্যেই আবরণ নষ্ট হয়ে যায়।

Passiflora edulis প্রজাতিটি সাধারণভাবে 'প্যাশন ফ্রুট' নামে পরিচিত। প্যাশন ফ্রুটের রস খাওয়ার উপযোগী এবং ব্রাজিল, কলোম্বিয়া, মেক্সিকো, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি জায়গায় বেশ জনপ্রিয়।

ওহ্ সরি। অন্য প্রজাতিতে ঢুকে গেছি।

তাতে কী? জানতে তো ক্ষতি নেই।

একটা পাঁকা প্যাশন ফ্রুটে আছে ৭৩% পানি, ২২% কার্বোহাইড্রেট, ২% প্রোটিন ও ০.৭% ফ্যাট। ৫০ গ্রামের একটি প্যাশন ফ্রুট থেকে পাওয়া যায় (ডেইলি ভ্যালুর হিসেবে) ৯৮% ভিটামিন সি, ২৯% ডায়েটারি ফাইবার, ৬% আয়রন, ৫% ফসফরাস, ৫.৫% ভিটামিন বি রাইবোফ্লাবিন। প্যাশন ফ্রুটের কেক বানানো যায়। শুনেছি, খেতে ভীষণ ডেলিশিয়াস।

এই প্রজাতির ঝুমকোলতার তেলও পাওয়া যায়, যা চুল ও ত্বকের জন্য বেশ উপকারী।

বইপত্র

'টিনিমিনিদের ক্যালকুলাস'

নাঈম হোসেন ফারুকী

মূল্য: Free

পৃষ্ঠা: ৪২

ক্যালকুলাস যে শুধু কিছু সূত্র আর শর্টকাট না সে সম্পর্কে জানতে, আর তাকে ভেতর থেকে অনুভব করতে 'টিনিমিনিদের ক্যালকুলাস' বইটি সংগ্রহ করুন এখান থেকে।

ডাউনলোড করুন: http://www.bcbiggan.com/2021/04/tini-minis-calculus.html

আকাশজোড়া গল্পগাথা

হৃদয় হক

প্রান্ত প্রকাশন

মূল্য: ৩০০

পৃষ্ঠা: ১৯২

এই বইতে আছে আকাশের গল্প, তারার গল্প, আছে উল্কাবৃষ্টি আর গ্রহাণুর গল্প। আছে ভ্রান্ত ধারণার কথা। সেইসাথে পাবেন জ্যোতির্বিদ্যার একগাদা বইয়ের তালিকা আর ছোট্ট করে রিভিউ। যাতে করে আপনিও হতে পারেন একজন শখের জ্যোতির্বিদ।
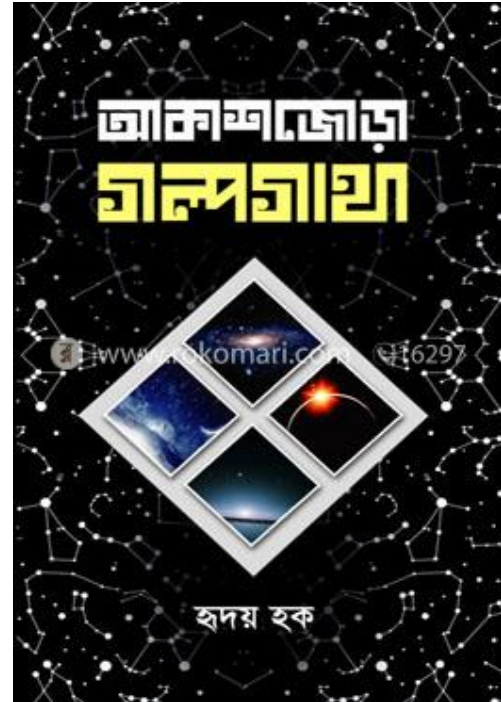
মহিষমতি সমীকরণ
নাঈম হোসেন ফারুকী
প্রান্ত প্রকাশন
মূল্য: ২০০
পৃষ্ঠা: ৯২৮

ধরুন, আপনি ঘুরতে ঘুরতে একটা কুয়ার কাছে গেলেন, গিয়ে শুনলেন এক অদ্ভুত কাহিনি। কিংবা হুট করে চিঠির সাথে কেউ একজন আপনার জন্য বেলি ফুলের সুবাসওয়ালা হরলিক্স এর প্যাকেট পাঠাল। অবাক হবেন না? এমনই হয়েছিলো আকবর সাহেবের সাথে। কী হলো তারপর?
'রহিমার মা' নামক এই উপন্যাসিকা আর টুইস্টে ভরপুর আরো ৯২ টি ছোটোগল্প নিয়ে সাজানো হয়েছে এই কল্পগল্পের বই।

এটাই সায়েন্স
হাসান উজ-জামান শ্যামল
তাম্রলিপি
মূল্য: ৩০০
পৃষ্ঠা: ৯৬০

আমাদের দেশেও গবেষণা হয়, আমাদের জনস্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য কিছু মানুষ করে যান পরিশ্রম। কিন্তু সেইসব গবেষণা আর গবেষক সবই থেকে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। এই বইয়ের মাধ্যমে জানা যাবে সেই কাহিনিগুলো। সাথে বোনাস হিসেবে আছে বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার উপায়, আরো অনেককিছু।
এই গল্প বাংলাদেশের, এই গল্প আমাদের সবার।
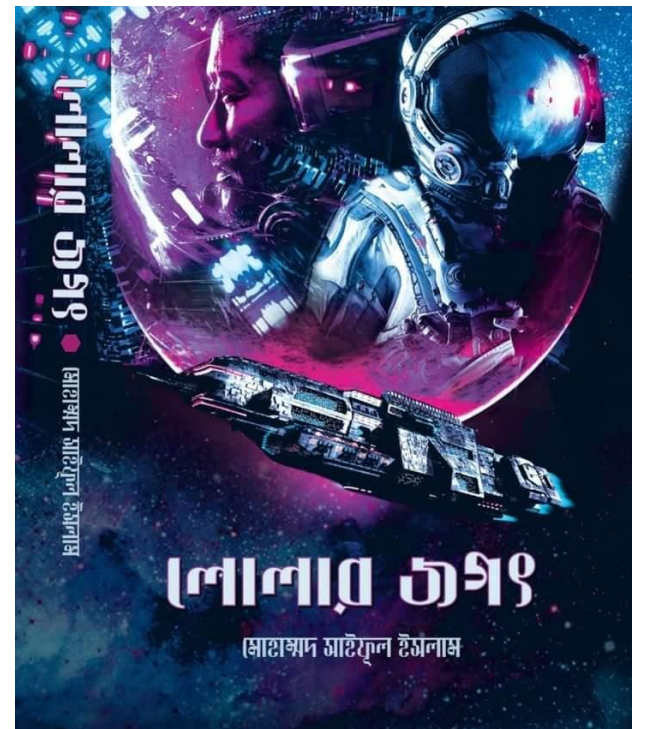
লোলার জগৎ

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
বাতিঘর
মূল্য: ৩৫০
পৃষ্ঠা: ৩০৪

কী এই লোলার জগৎ? পৃথিবীর সাথে এর কীইবা সম্পর্ক? মানুষ কি আসলেই তার জ্ঞানের প্রান্তিক সীমায় পৌঁছে গেছে? কী হবে এরপর মানবজাতির?
এইরকম অনেক প্রশ্নের উত্তর আর সাথে হার্ড সাইফাইয়ের ছোঁয়া পেতে পড়তে পারেন এ বইটি।
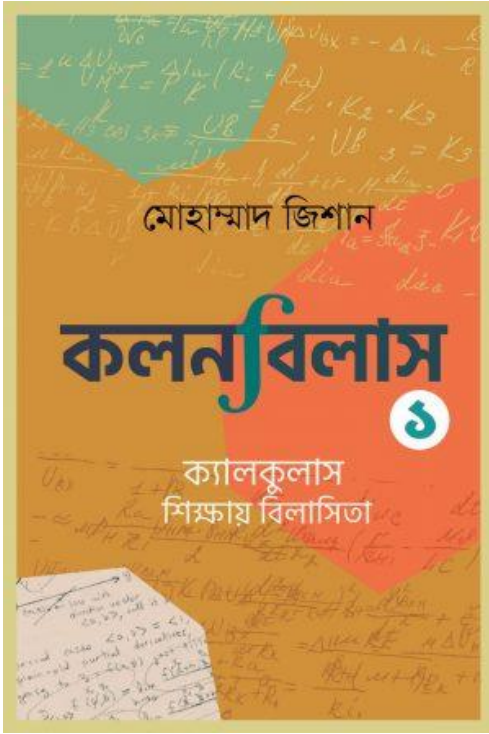
কলনবিলাস ১ ও ২
মোহাম্মদ জিশান
আদর্শ
মূল্য: (১) ৫৪০
(২) ৪০০
পৃষ্ঠা: (১) ২৮৮
(২) ২০৮

ক্যালকুলাস নিয়ে একদম বেসিক থেকে হাই লেভেলের কথাবার্তা বলা আছে এ বই দুটোতে। যারা নতুন ক্যালকুলাস শুরু করতে চান তাদের জন্য তো বটেই, একইসাথে ক্যালকুলাসকে ফিল করার জন্য এ বই উপযোগী। ক্যালকুলাস নিয়ে বিলাসিতায় স্বাগতম।
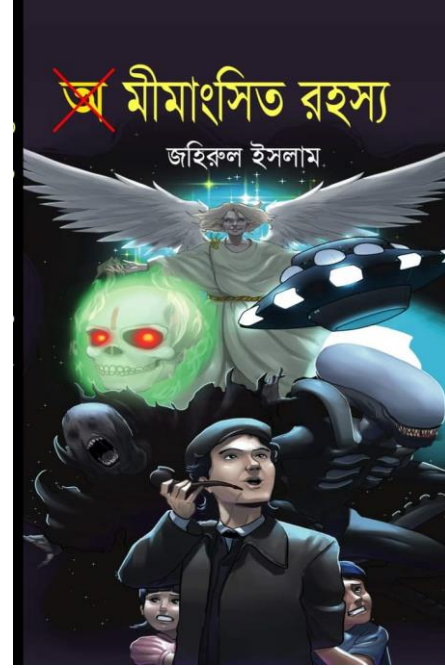
(অ) মীমাংসিত রহস্য
জহিরুল ইসলাম
প্রান্ত প্রকাশন
আপকামিং

ফেইসবুক জগতে ফ্যাক্ট-চেকারখ্যাত জহিরুল ইসলামের এটাই প্রথম বই। ১৭ টা দেশি বিদেশি ভূতের গল্পের ব্যবচ্ছেদ নিয়ে সাজানো হয়েছে এই বইখানা। প্রথমে ভূতদের উৎপাত তারপর তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে ভূতের ভবলীলা সাঙ্গ করা হয়েছে।

বিলিম্বি

সায়্যিদা মুবাশ্বিরা

অনেকের কাছে হয়তো অনেক পরিচিত আবার অনেকে হয়তোবা নামই শোনেন নি। এই ফল কামরাঙার নিকট আত্মীয়। তবে যারা খেয়েছেন তারা জানেন যে এটা কামরাঙা থেকেও অনেক বেশিই টক। যাহোক, খেতে কিন্তু মন্দ নয়!

বাংলা নাম: বিলিম্বি
ইংরেজি নাম: Bilimb
বৈজ্ঞানিক নাম: *Averrhoa bilimbi*
জগৎ: Plantea
বিভাগ: Magnoliophyta
শ্রেণি: Magnoliopsida
বর্গ: Oxalidales
গোত্র: Oxalidaceae
গণ: Averrhoa
প্রজাতি: Averrhoa bilimbi

বিলিম্বি পটলের চেয়ে খানিকটা ছোটো। রং হালকা সবুজ। ফলটি ৩-৬ সে.মি. লম্বা হয়ে থাকে, ব্যাসার্ধ হয়ে থাকে ২.৫ সে.মি.। আর গাছকে বাড়তে দিলে ১০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। কামরাঙার মতো এত বেশি খাঁজ না থাকলেও পাঁচটির মতো খাঁজ থাকে বিলিম্বিতেও। এশিয়ায় সর্বপ্রথম বিলিম্বির দেখা মেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার 'শাহশাহের বাড়ি' অঞ্চলে। একটি পূর্ণ গাছে প্রায় ৩০০ কেজি বিলিম্বির ফলন হয়। এই ফলের পুষ্টিগুণও কিন্তু কম নয়! চলুন জেনে নেওয়া যাক ১০০ গ্রাম বিলিম্বিতে কী কী পুষ্টি উপাদান কী পরিমাণে থাকে,

আমিষ: ০.৬১ গ্রাম
তন্তু: ০.৬ গ্রাম
ফসফরাস: ১১.১ মিলিগ্রাম
ক্যালসিয়াম: ৩.৪ মিলিগ্রাম
লৌহ: ১.০১ মিলিগ্রাম
থায়ামিন: ০.০১০ মিলিগ্রাম
রিবোফ্লাভিন: ০.০২৬ মিলিগ্রাম
ক্যারোটিন: ০.০৩৫ মিলিগ্রাম
Ascorbic Acid: ১৫.৫ মিলিগ্রাম
Niacin: ০.৩০২ মিলিগ্রাম

বিলিম্বি গাছে ফল ধরে থাকে গাছের শাখা-প্রশাখায় এমনকি কান্ডেও। সেই সাথে মজার ব্যাপার হলো বিজ্ঞানীরা বিলিম্বির একটি মিষ্টি জাতও উদ্ভাবন করেছেন!
বিলিম্বি অসুখ-বিসুখেও কাজ করে কিন্তু! এর পাতা বেটে মলমের মতো শরীরের কোথাও জ্বালাপোড়া, বাতব্যাথা, ফোলা কিংবা ঘাম হলে সেখানে বিলিম্বির পেস্ট দিয়ে প্রলেপ দিলে উপশম হয়। উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বিলিম্বির শরবত খেতে পারেন। ডায়াবেটিস রোগীরাও বিলিম্বির রস খেয়ে থাকেন। লিখতে লিখতে আমার জিভে জল চলে আসছে!
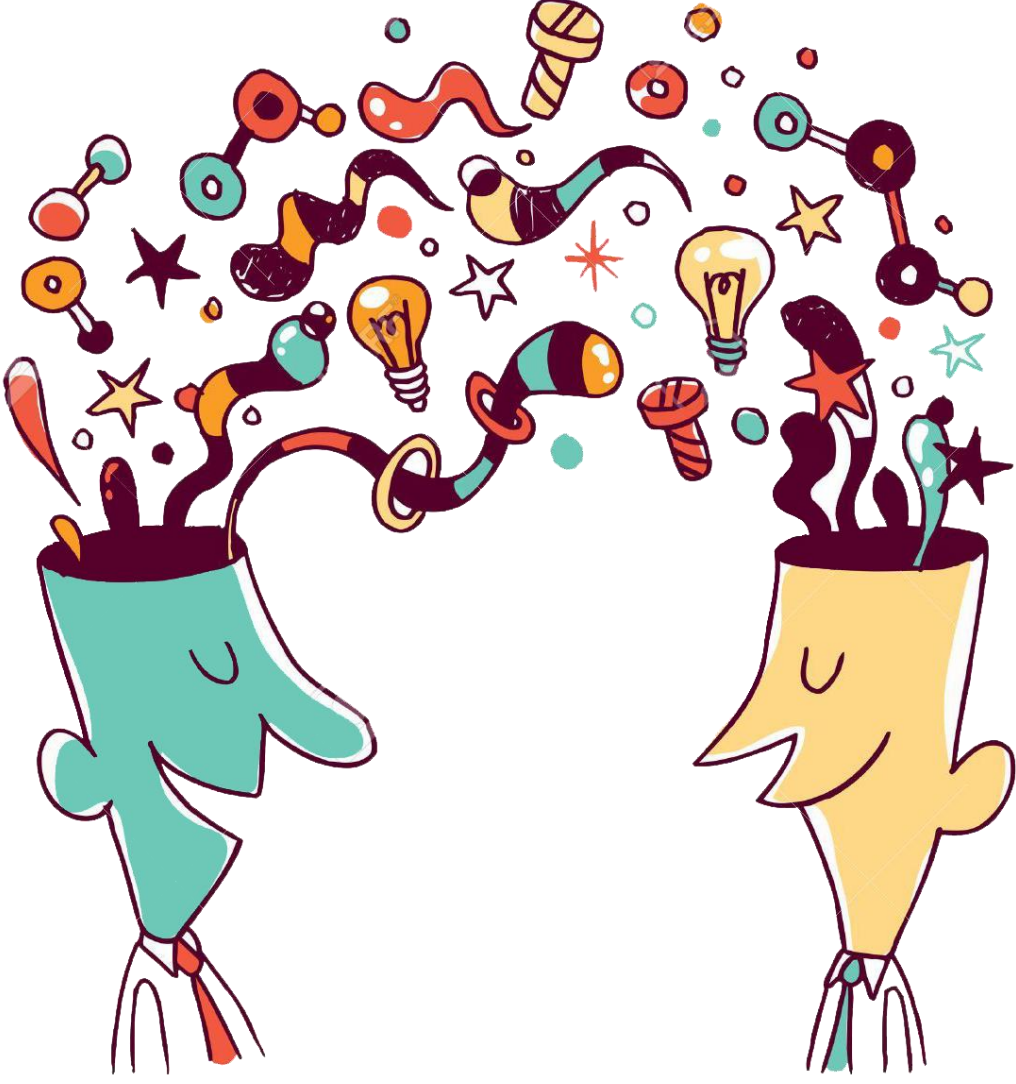
হাসান ইমাম এবং তাঁর পতঙ্গভুক উদ্ভিদের জগৎ

পেশাগত জীবনে চিকিৎসক। বর্তমানে কর্মরত আছেন রংপুর শিশু হাসপাতালে। পেশাগত জীবনের প্রচণ্ড ব্যস্ততা আর সংসারের চাপ সামলেও ঠিকই সময় বের করে নেন নিজের প্রিয় শখের জন্য। পতঙ্গভুক উদ্ভিদের বাগানের শখ। যারা এই ধরনের উদ্ভিদের সাথে অপরিচিত তাদের জন্য, নামেই পরিচয়। সহজ বাংলায় যেসব উদ্ভিদ পতঙ্গ 'খায়'। গাছের তো মুখ নেই, তাই খায় বলা যায় না। কোনো না কোনো ভাবে হজম করে নিজেদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ দিয়ে পোকামাকড় আটকে। পোকার ওপর নির্ভর করে থাকে নিউট্রিশনের জন্য। আর এসব এসব উদ্ভিদ নিয়েই পড়ে থাকেন হাসান ইমাম। পতঙ্গভুক উদ্ভিদ প্রচার ও প্রসারেও

হাসান ভাইয়ের ছবি

নিয়োজিত তিনি। চালান পতংগভুক উদ্ভিদ- Carnivorous plants Bangladesh নামের ফেইসবুক গ্রুপও। আজকের ইন্টারভিউ তার সাথেই। ব্যাঙাচির হয়ে ইন্টারভিউ নিয়েছি সমুদ্র জিত সাহা।

সমুদ্র: আপনার পতঙ্গভুক উদ্ভিদের প্রতি আগ্রহ কখন ও কীভাবে শুরু হলো?

হাসান ইমাম: পুরান কথা মনে করায় দিলো রে! অক্কে, একেবারে নির্ভুলভাবে সময় মনে করতে পারছি না, তবে পতঙ্গভুক নিয়ে মাথাচাড়া দিয়েছিল ২০০৭ এর শেষ দিকে। "সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে" — একটা কথা আছে জানেন তো? এটা ছিল আরও আগে থেকেই, ২০০২/৩ থেকে। তখন শুধু স্বপ্ন দেখা আর নেট এ খোঁজা। কিন্তু অ্যাক্টিভলি মাথাচাড়া দিয়েছিল ২০০৭ এর দিকে। এখন আমার হাতে আসলেই গাছ আছে। গাছপালা নিয়ে আগ্রহ ছোটোবেলা থেকেই। ডাক্তার হয়ে বিধিবাম। ব্যস্ততা আমাকে অনেক কিছু থেকে দূরে রেখেছে। তথাপি বিদেশি বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ অনেকটা সহজ করে দিয়েছিল। আমি অনেক মিশনারী ডাক্তার এবং অন্য পেশার মানুষের সাথে মিশেছি। পরিচিতি, কাজ করার সুবাদে আমাকে অনেকেই আগ্রহী করে তুলেছিল। যারা বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের দেশে আসত এবং এখনো আসেন এরাই আমাকে সাহায্য করেছে নানা সময়। গাছ এনে দিয়ে বা নিজে বাইরে গেলে কখনো নিয়ে এসেছি। এভাবেই শুরু হয়েছিল।

সমুদ্র: বাংলাদেশে এসব উদ্ভিদ কীভাবে সংগ্রহ করেন? এদেশের মাটি আর আবহাওয়া কি এসব উদ্ভিদের জন্য উপযোগী?

হাসান ইমাম: ভালো প্রশ্ন। অনেকটা সময় আমার ব্যায় হয়েছে এদের সম্পর্কে জানতেই। একবার দুইবার না, বছরের পর বছর গেছে তাদের বুঝতেই। টিকে থাকে না; না থাকে, না বাঁচে, না মরে যায়! একটা সময় দেখলাম — না, কিছু প্রজাতি থাকে, বাঁচে, বংশবিস্তারও করে।

কিন্তু এই বিষয় অনেকেরই অজানা। তাই এইগুলা এতটা প্রসার পায়নি। একটা সময় মাথাচাড়া দিলো এক্সপেরিমেন্ট করার। হেলথ রিলেটেড। কিন্তু একটা দুইটা গাছ দিয়ে তো আর এক্সপেরিমেন্ট হবে না। নিজের থেকেই একে ওকে দিতে থাকলাম। কিন্তু কেউ বুঝেই না, দাম দেয় না। একে তো অ্যাভেইলেভেল না, তার ওপর অনেক দাম। যন্ত্রণা!
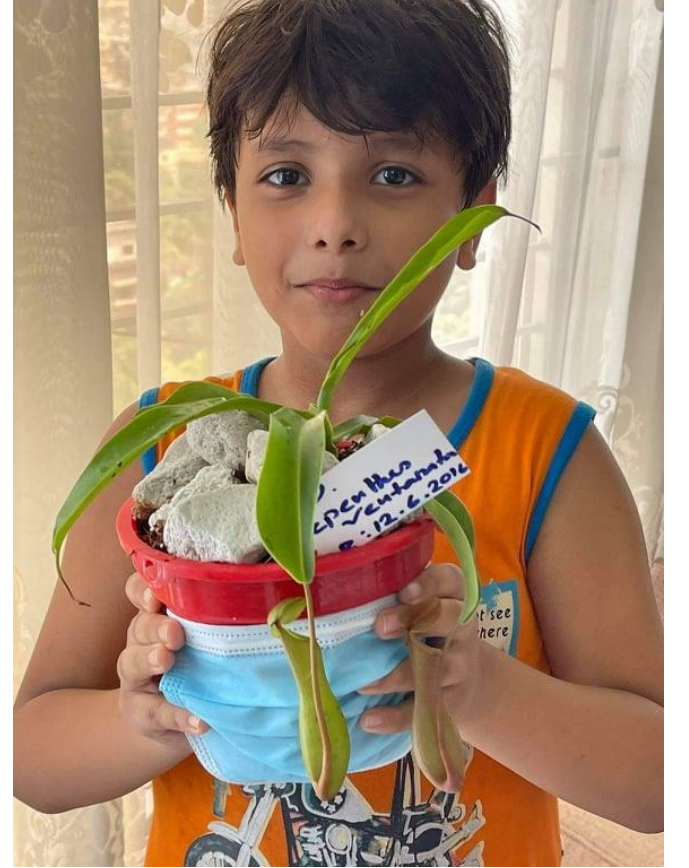
উনার ছেলের হাতে পিচার প্লান্ট।

ভাবতে থাকলাম কীভাবে বাড়াতে পারি। একা এগুলা করতে গেলে বাসায়ও অনেক অশান্তি। গাছ নিয়ে প্রায়ই বাসায় মিটিং বসে। পুলিশ, ডাক্তার, জেলার ডিসি সবাই বাসায় বিচার বসায়। "এগুলা কী কাম তুমার?" তাও ছাড়ি না। চলতেই থাকো। আগে তো ফেইসবুকে থাকলেও এত অ্যাক্টিভ ছিলাম না। গাছের গ্রুপ বা মানুষকে এত সহজে জানার কৌশল জানাও ছিল না।

গেল ২/৩ বছর ধুমছে সকাল-বিকাল এগুলা সম্পর্কে জানাইতে শুরু করলাম। একেবারে কাজ হয়ে গেল। অনেকেই বড়ো বড়ো বাগানিরা আনা শুরু করছে এখন। এটাই সার্থকতা।

২ বছর আগেও যে গাছ সম্পর্কে হাতে গোনা ২/৩ জন জানতেন আর ২০/৫০টা রেখেছিলেন সংগ্রহে, তারাই এখন ধুমছে রাখা শুরু করছেন। কারণ আমি চেষ্টা করেছি "এদেরকে বাঁচানো যায়" জানাতে। গাছের গ্রুপগুলোতে দেখা যায় এখন এই গাছগুলা।

বেশ কিছু প্রজাতি ১০০% আমাদের আবহাওয়াতে পারফেক্ট ভাবে টিকে থাকতে পারে। শুধু অ্যাডজাস্ট করার সময় দিতে হবে। আর মাটির ব্যাপারে, সাধারণ মাটিতে। কৃত্রিম ভাবে সম্ভব হয় নাই। তবে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আর এক্সপেরিমেন্টে আমাদের দেশি মিডিয়ার মধ্যে ১০০% পারফেক্ট।

সমুদ্র: আপনার সংগ্রহে থাকা আপনার প্রিয় কিছু পতঙ্গভুক উদ্ভিদ সম্পর্কে বলুন।

হাসান ইমাম: সব গাছ আমার প্রিয়। তবে সূর্যশিশির, নেপেন্থিস, সারাসেনিয়া ফ্লাভা এবং পারপুরা আমাদের দেশের এবং বাগানপ্রেমি প্লাস পরিবেশের জন্য মানানসই, টেকসই এবং উপকারী। ভেনাস ফ্লাই ট্রাপ সবচেয়ে সুন্দর কিন্তু অনেকটা গাঁদা ফুল এর মতো। প্রতি বছর লাগাতে হয়।

সমুদ্র: দিনের কীরকম সময় ব্যয় হয় এই শখের পেছনে?

হাসান ইমাম: এখন পারি না। আগেও এতটা পারতাম না। সংসারে সময় দেওয়া খুবই জরুরি। রাত ১১টার পর ভালো সময়। দিনে তো সারাদিন বাইরেই থাকি। ছুটির দিনে কিছুটা সময় পাওয়া যায়, তাও অপ্রতুল। নিজে পারি না বলেই তো অন্যকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে চলেছি। রোজা রেখে ক্লান্ত, তাই দুই দিন ছুটি নিয়েছি বিধায় কথা বলার সুযোগ হলো তাও।

সমুদ্র: যতদূর জানতাম, এসব গাছের বেশ রক্ষণাবেক্ষণ দরকার হয়। এটা কি সত্য?

হাসান ইমাম: ইহা সত্যি। কিন্তু সিস্টেম। ওই যে বললাম অ্যাডজাস্ট করতে পারলে সব ঠিক। অনেকটা অতি তাড়াতাড়ি বিবর্তনের মতো। পানির বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সমুদ্র: পতঙ্গভুক উদ্ভিদ কি বাসা পতঙ্গমুক্ত রাখতে সাহায্য করে না কি উলটো পতঙ্গ ধরে তাদের খাওয়াতে হয়? আর খাওয়ার পর অবশিষ্ট পতঙ্গের দেহাবশেষ পরিষ্কারেও তো মনে হয় অনেক সময় ব্যয় করতে হয়?

হাসান ইমাম: না, পতঙ্গ ধরে ধরে খাওয়ার দরকার হয় নাই। আমি দেখেছি যে তারা নিজেরাই খায়। আর পরিষ্কার করারও দরকার নেই। এগুলো প্রাকৃতিক নিয়ম, এই যা একটু শুকিয়ে যায় — স্বাভাবিক। আমার অভিজ্ঞতায়, মশার কামড়ের সাথে গাছগুলোর তেমন সম্পর্ক নেই।

সমুদ্র: এই গাছগুলো পরিবেশের উপকারে আসে কী?

হাসান ইমাম: হ্যাঁ, পোকামাকড়ের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এই গাছগুলো বেশ উপকারী। ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য বজায় রাখতেও তাই পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। ঢাকা শহরে সব জলাশয়ে আফ্রিকার মাগুর চাষ করে হুদাই, যেটা খাইলে গা ঘিন ঘিন করে। আরে! এর চেয়ে অতি সস্তা জলজ পতঙ্গভুক সস্তায় লাগালে মশার লার্ভা শেষ হবে আগেই কোনো কষ্ট ছাড়া। সূর্যশিশির এর বিলুপ্ত করা এই মশার বিস্তারের জন্য অনেকটাই দায়ী। আমরা অনেক কিছুই বুঝতে চাই না। আগে কি এত মশা ছিল? না কি আগে এত মানুষ ছিল না? মশা কেন এত বিস্তার লাভ করল? জানি, আমার কথা অন্য রকম লাগবে কিন্তু বাস্তবতা এরকমই।

সমুদ্র: আপনি কি তাহলে পতঙ্গভুক উদ্ভিদ বাসায় পালন করতে উৎসাহী করবেন নিশ্চয়ই? যারা এই বিষয়ে আগ্রহী, নতুন, তাদের আপনি কী বলবেন?

হাসান ইমাম: অবশ্যই। সবার কাছে কি গোলাপের ৬০০ প্রজাতি আছে? না কি ক্যাকটাসের ৫০ প্রজাতি? ঠিক সেই ভাবে পতঙ্গগভুক-এর ২৫০ প্রজাতি কেউ রাখবে না আমার মতো পাগল এর মতো। আর বাসায় সব কিছুই শখে রাখা। বাচ্চারা এটা দেখবে নিজের চোখে — এর চেয়ে আনন্দ আর কী হতে পারে? প্রকৃতি কী দিয়েছে তা দেখার সুযোগ কেন হাতছাড়া করবে?

সূর্যশিশির বা সানডিউ। পোকামাকড় এর আঠালো পাতায় আটকে ধীরে ধীরে হজম হয়।

সমুদ্র: ব্যাঙাচি পাঠকদের প্রতি কিছু বলে শেষ করতে চান?

হাসান ইমাম: গাছের সবুজ আমাকে অনেক কাছে টানে। আর জীবন্ত গাছ মাছ-মাংস খায় — চরম একটা অনুভূতি। আমি নেশা করি না, ইভটিজিং করি না, পেশাগত কারণে আমার অবসর বলে কিছু নাই, কিন্তু যা পাই তা আমি গাছের প্রতি পুরাটাই দিই। ভালো কাজে থাকার জন্য এই উদ্ভিদ একটা অনুপ্রেরণা, বিশেষ করে নতুন বাগানিদের জন্য।

সমুদ্র: অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকে ব্যস্ততার মাঝে ব্যাঙাচির জন্য সময় দেওয়ার জন্য। নিঃসন্দেহে এই ইন্টারভিউ হাজার হাজার পাঠকের মনে পতঙ্গভুক উদ্ভিদের জন্য আগ্রহ তৈরি করবে।

ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ। পোকামাকড়, বিশেষ করে মাছি কামড়ে ধরে হজম করে।

পিচার প্লান্ট বা কলসী উদ্ভিদ। পোকাদের কলসীতে আটকে হজম করে।

[বানান সংশোধন: আবু রায়হান]
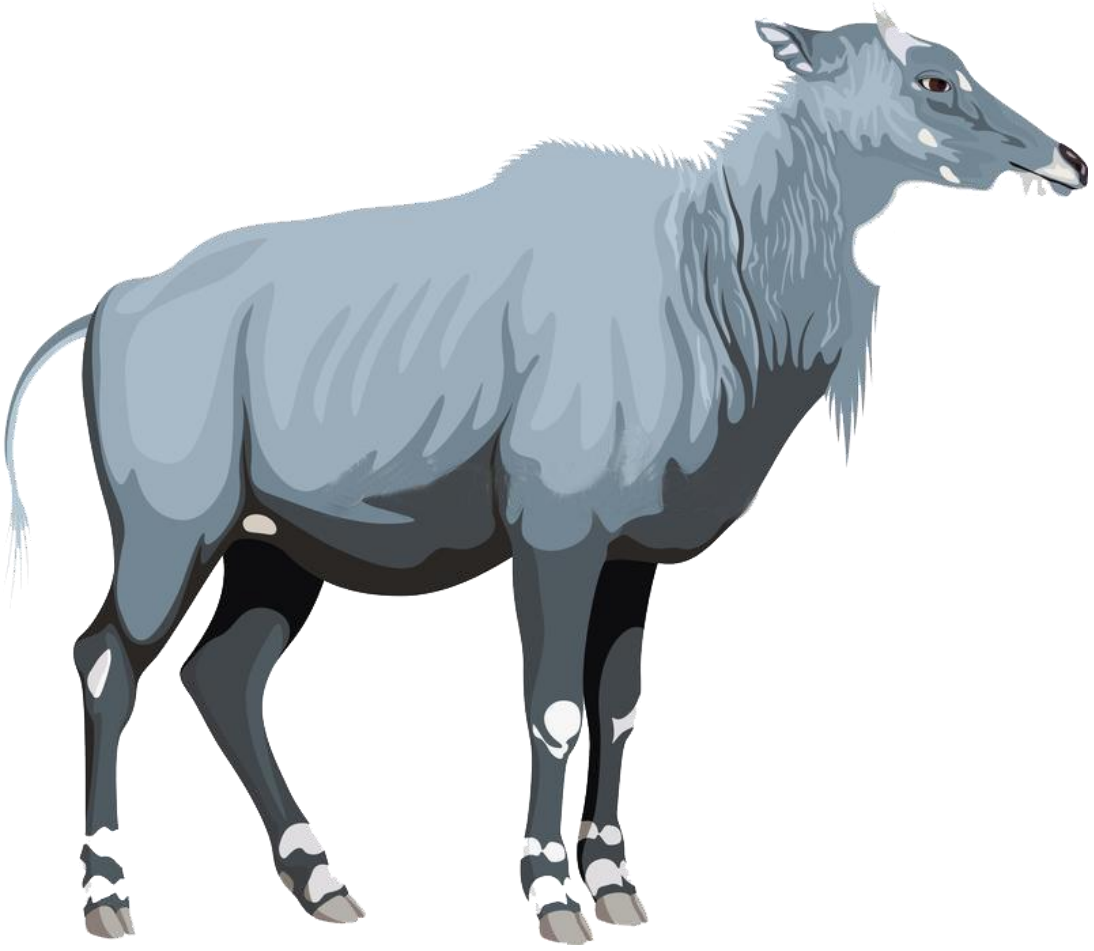
নীলগাই

ভাস্কর রায়

নীলগাই? এটা আবার কী? গাই সাদা হয় লাল হয় কালো হয়। নীল? না, না, নীল হতেই পারে না।

এটা আমারও মনে হয়েছিল। চলুন আজ এই নীল গাই নিয়ে জানি। আমি ঠাকুরগাঁও জেলাতে থাকি। এই জেলার একটি বিপন্ন বা বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী হলো এই নীল গাই। অতীতে সমতল ভূমিতে এই প্রাণীটির অবাদ বিচরণ ছিল। আর আজ আমরা জানিই না যে নীল গাই নামে কোনো প্রাণী ছিল।

নীলগাই বাংলাদেশের একটি বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ী প্রাণী। ১৯৪০ সালের দিকে বর্তমান বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া অঞ্চলে নীলগাই পাওয়া যেত বলে জানা যায়। এক সময় ধারণা করা হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে

এরা বিলুপ্ত। এরা সমতলভূমিতে বাস করে থাকে। প্রজনন সময় ছাড়া সাধারণত বছরের অন্যান্য সময় ষাড় ও গাভী পৃথকভাবে বিচরণ করে। অর্থাৎ আলাদা হয়ে থাকে। গাভীর লোম হলুদ, বাদামি হয়ে থাকে তবে প্রাপ্তবয়স্ক ষাড়ের শরীরের লোম নীল ধূসর। আর এ কারণেই একে বলা হতো নীল গাই। 4 সেপ্টেম্বর, 2018 ঠাকুরগাঁও এর রানিশংকেল থেকে স্থানীয়রা একটি গর্ভবতী নীলগাই উদ্ধার করে। বনবিভাগ সেই নীলগাইটাকে রামসাগর জাতীয় উদ্যান এ নিয়ে এসেছে। আঘাতপ্রাপ্ত থাকার কারণে গর্ভপাত হয় এবং বাচ্চাটি মারা যায় তবে মা নীল গাইটিকে সুস্থ করে তোলা হয়েছে। এখন এটি রামসাগর জাতীয় উদ্যানে আছে। এর কিছুদিন পর নওগাঁর মান্দা উপজেলার বাজার এলাকায় আরো একটি পুরুষ নীলগাই ধরা পড়ে। এদেরকে একসাথে রামসাগর জাতীয় উদ্যানে রাখা হয়েছিল। কিন্তু মা নীলগাইটির মৃত্যু হয়েছে গত ১৭ ই মার্চ, ২০১৯ সালে অপঘাতে। এটা অনেক বড় নির্মমতা। এরই মধ্যে আরেকটি পুরুষ নীলগাই ধরা পড়েছে।

নীলগাই (দ্বিপদ নাম:*Bocephalus tragocamelus*) (ইংরেজি: Blue bull)

ভারতীয় উপমহাদেশে অ্যান্টিলোপ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহদাকৃতি প্রাণী। পুরুষ অ্যান্টিলোপ নীলগাই নামেও পরিচিত।

বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাসঃ
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Artiodactyla
Family: Bovidae
Subfamily: Bovinae
Genus: Boselaphus
Blainville,1816
Species:B. tragocame

বায়োম: একইরকম মাটি, জলবায়ু এবং অভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে তৈরি বড়ো আর আলাদা করা যায় এমন ইকোসিস্টেম।

ছুটে গিয়ে জবাই থেকে রক্ষা পেল দুই নীলগাই

টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার দেউলাবাড়ি ইউনিয়নে দুইটি নীলগাইয়ের বিচরণে স্থানীয়দের মাঝে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণী দুটিকে দেখার জন্য উৎসুক জনতা ভিড় করছেন।
সোমবার (১০ মে) বিকেলে মধুপুর উপজেলার লাউফুলা গ্রামের লোকজন নীলগাই দুটিকে বন থেকে আটক করেছে বলে সবশেষ খবরে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার সকালে দেউলাবাড়ি ইউনিয়নের চেড়াভাঙ্গা সংলগ্ন পাহাড়ের টিলার ওপর কয়েকজন শিশু খেলতে গিয়ে নীলগাই প্রথমে দেখতে পায়। তারা বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি অভিভাবকদের জানায়। অভিভাবকরা প্রথমে বিশ্বাস না করলেও নিজেরা দেখার পর বিষয়টি জানাজানি হয়।

দেউলাবাড়ী ইউনিয়নের বাঘেরহাট নচিয়া মামুদপুর গ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী ওষুধ ব্যবসায়ী মো. খাইরুল ইসলাম, হাফিজুর, বোরহান এবং ফুলহারা গ্রামের মশিউর রহমান বাবর, পর্ব আহম্মেদ, শাজাহান খানসহ অনেকেই জানান, গত দুইদিন ধরে নীলগাই দুটি

চেড়াভাঙ্গা সংলগ্ন পাহাড়ের টিলায় বিচরণ করছে। উৎসুক মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে প্রাণী দুটি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে।

সবশেষ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জানা যায়, মধুপুর বনাঞ্চলের লাউফুলা এলাকা থেকে বিকেলে স্থানীয় লোকজন নীলগাই দুটিকে আটক করেছেন।
ঘাটাইলের দেউলাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম খান জানান, তিনি জানতে পেরেছেন দুইদিন ধরে দুটি নীলগাই স্থানীয় টিলায় বিচরণ করছে। প্রতারক কিছু মানুষ প্রাণী দুটিকে আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে জবাই করে গোস্ত (মাংস) বিক্রি করার উদ্দেশ্যে চোরাই পথে ঘাটাইলের পাহাড়ি অঞ্চলে এনে বেঁধে রেখেছিল বলে তিনি জানতে পেরেছেন। সেখান থেকে বাঁধন ছিঁড়ে লোকালয়ে চলে এসেছে।

নীলগাই দুটিকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে ছেড়ে দেয়ার জন্য প্রাণিসম্পদ ও বন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই চেয়ারম্যান।
মধুপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা হারুনুর রশীদ জানান, ধরা পড়া প্রাণীটি দুটি নীলগাই নিশ্চিত হওয়ার পর প্রাণহানি রোধে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করা হয়। পরে বনকর্মীরা সেখানে হাজির হন।

মধুপুর বনাঞ্চলের সহকারী বন সংরক্ষক জামাল হোসেন তালুকদার জানান, এটি ভারতীয় নীলগাই। এক বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে দিনাজপুর এলাকায় ধরা পড়ে। পরবর্তীতে প্রাণীটি গাজীপুরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে ছেড়ে দেয়া হয়। এরপর গত ৯০ ফেব্রুয়ারি সাফারি পার্ক থেকে নীলগাইটি পালিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, জেলার সখীপুর গজারি বনে থাকার সময় সাফারি পার্কের কর্মীরা ট্রাঙ্কুলাইজারে চেষ্টা করে নীলগাইটি ধরতে ব্যর্থ হন। বর্তমানে প্রাণীটি দুটি সুস্থ রয়েছে। গাজীপুর সাফারি পার্কের কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মধুপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীমা ইয়াসমীন জানান, স্থানীয় প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের জন্য বিরল প্রজাতির প্রাণী দুটির প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

[কার্টেসীঃ Jagonews24.com]

ম্যানগ্রোভ বন: লবণাক্ত ও কর্দমাক্ত ভেজা মাটির বন। সুন্দরবন এমন একটি বন যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো।
সোয়াম্প ফরেস্ট: মিঠাপানি বা স্বাদুপানির জলাধার দ্বারা জলাবদ্ধ বন। রাতারগুল এমন।

পাদুরি লতা (গন্ধভাদালি লতা)

আবু রায়হান

হ্যাঁ, পাদুরি লতা গাছ।
নামটা দেখে মোটেই ভাববেন না যে এ গাছটা যেখানে সেখানে
আপনার মতো প্রকাশ্যে বা গোপনে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বায়ু (বাতকর্ম) নিঃসরণ করে।

তবে এ গাছ বায়ু নিঃসরণ না করলেও এ গাছের পাতা ছিঁড়ে শরীরে ঘষলে বা থেঁতলালে যে উৎকট দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় তা একদম বাতকর্মের (Furt) মতোই। একদম মানে একদমই।
পার্থক্য করা মুশকিল।

বাংলার বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ নিয়ে সিরিজ লিখতে গিয়ে কিছু গাছের কথা প্রথমেই মনে পড়ে গেল। আর তার মাঝে এ গাছটা অন্যতম।

১৩ থেকে ১৪ বছর আগে একদিন জঙ্গলে আমরা বন্ধুরা মিলে 'হলদে পাখি' শিকার করছিলাম। হঠাৎ আমাদের নাকে বাতকর্মের মতো উৎকট গন্ধ কোথা থেকে জানি ভেসে আসে। আমার শৈশবের বন্ধুদের মাঝে জহিরুল সচরাচর বায়ু নিঃসরণ করার জন্য বিখ্যাত ছিল। সো, যত দোষ নন্দ ঘোষ। দোষটা ওর ঘাড়ে গিয়েই পড়ল।

আমরা সবাই 'সসি' বলে এবং সবাই যার যার নাকে হাত চেপে ওকে *দুরা বলে ক্ষেপাতে লাগলাম।
তারপর ও তো মিথ্যা মামলায় দোষী হয়ে ক্ষেপে ভূত।
তারপর হঠাৎ আমার নজর আরেক বন্ধুর (লিটন) হাতের দিকে চলে যায়। আমি ওর হাতে কিছু পাতা দেখতে পাই। আমি সেদিনই প্রথমবারের মতো পাতাটা দেখি। চিনতে না পেরে সাথে সাথে হাতে নিই এবং এমনেই পাতাটা ছিঁড়ে হাতে ঘষি। বন্ধুটিও এমনিই জঙ্গলে ওই পাতাটা দেখে না জেনেই, উদ্দেশ্যহীনভাবেকতকগুলো পাতা গাছ থেকে ছিঁড়েছিল। আর দুয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাতে নিয়ে ঘষছিল। তারপর আমি যখন ওই পাতাটা হাতে নিই তখন দেখি আমার হাত থেকে বায়ুর মতো উৎকট গন্ধ বের হচ্ছিল।
বোঝা শেষ সকল কাহিনি।

আমাদের 'বিচ্ছুবাহিনী আদালত' লিটনের ওপর আরোপিত মিথ্যা মামলাটা থেকে ওকে খারিজ করে দিলো। তারপর সে গাছের পাতা নিয়ে কত কত যে মজা করেছি!

যেমন আমি যখন ছোটো ছিলাম, মানে ক্লাস থ্রি/ফোরে পড়তাম তখন আমার বড়ো বোনের বালিশের নিচে এ গাছের পাতা মাঝেমধ্যেই ছিঁড়ে রেখে দিতাম যাতে বোন তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে আমার সাথে খেলতে পারে এবং আমাকে যেন বেশি সময় দেয় তাই। গাছটা আশেপাশের জঙ্গলেই ছিল। আপু সকালে অনেকক্ষণ ঘুমাত।
যা-হোক, এ পাদুরি লতা গাছকে উইকিপিডিয়ায় দেখলাম গন্ধভাদালি লতা নাম দিয়েছে।
এর আরও নাম আছে।
বাংলা : গন্ধভাদালি লতা, ভাদালি লতা, ভাদাল পাতা, ভাদাল, ভাদাইল, গন্ধ ভাদাল, পাদুরি লতা, গুইন্যারী, গন্ধ ভাদুলে, গাঁদাল, গন্ধভাদুরি, বনভাদুরি, ভাদালিলতা,গন্ধালি, ভদ্রা, বরেণ্যা, পুতিগন্ধ্যা, প্রসারণী, সুপ্রসরা, সারণী, সরণী, সরা, চারুপর্ণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতানিকা, প্রবলা, রাজপর্ণী, বল্যা, ভদ্রবলা, চন্দ্রবল্লী, প্রভদ্রা ইত্যাদি।

সংস্কৃত নাম : প্রসারণী, ভদ্রা
ইংরেজি : Skunkvine, slStinkvine, Chinese fever vine
বৈজ্ঞানিক নাম : *Paederia foetida*
বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস :

জগৎ : Plantae
(শ্রেণিবিহীন): Angiosperms
(শ্রেণিবিহীন): Eudicots
(শ্রেণিবিহীন): Asterids
বর্গ : Gentianales
পরিবার : Rubiaceae
গণ : Paederia
প্রজাতি : P. foetida
দ্বিপদী নাম : *Paederia foetida L.*
এর পাতায় তেল/জলীয় পদার্থরূপে উপস্থিত থাকা ডাইমিথাইল ডাইসালফাইড যৌগের জন্য লতাটি থেকে এরকম দুর্গন্ধযুক্ত ঘ্রাণ বের হয়।

এটি একটি লতানো উদ্ভিদ প্রজাতি। এটিকে আলংকারিক উদ্ভিদ হিসেবেও লাগানো হয়। এর অনেক ভেষজগুণ আছে।

এটি দ্রুত বৃদ্ধিসম্পন্ন বহুবর্ষজীবী, ৬.৫ থেকে ৭.০ মিটার লম্বা লতানো উদ্ভিদ। অন্য গাছ বা অবলম্বনকে জড়িয়ে ধরে বেড়ে ওঠে। এর মূল কিন্তু কাষ্ঠল। লতানো কাণ্ড ও পাতার গায়ে সূক্ষ্ম লোম আছে। কাণ্ড থেকে জোড়া জোড়া পাতা হয় অর্থাৎ পাতার বিন্যাস বিপরীত। পত্রবৃন্ত লম্বা, পাতার গোড়ার দিক গোলাকার বা হৃদপিণ্ডাকার, আগার দিক চিকন এবং অগ্রভাগ চোখা, রং সবুজ ও শিরাগুলো স্পষ্ট। কাণ্ডের মাথা ও পাতার কক্ষ থেকে লতার মতো ও শাখায়িত পুষ্পদণ্ড বের হয়। ফুল ছোটো, নলাকার বা ফানেল আকৃতির, রোমশ। পাপড়ি ৫টি, বিস্তৃত, ত্রিভুজাকার থেকে ডিম্বাকার।
বীজ গোলাকার, চ্যাপটা, হলুদ বা লালচে বাদামি রঙের।
বীজ থেকে কাণ্ড কাটিং করে বা কাণ্ড মাটির সংস্পর্শে এলে যে শিকড় জন্মায়, সে শিকড়ওয়ালা কাণ্ড থেকে নতুন গাছের জন্ম হয়।

মূলত এর উৎকট গন্ধের কারণে এই নামকরণ করা হয়েছে। এই গাছ বাংলাদেশ, ভারতের পূর্বাঞ্চল, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ ভুটান, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, চীন, তাইওয়ানে প্রচুর জন্মে।
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের দিকে এর ফুল ধরে এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল হয়। শীতকালে ফল পাকে। বীজ থেকে বা এর কাণ্ড/লতা লাগানো যায়।
গ্রামের মানুষ অনেক আগে থেকেই গন্ধভাদালির ব্যবহার জানেন। এই পাতা তারা সাধারণত উদরাময়, অর্শরোগ, অরুচি, পক্ষাঘাত ও বাত রোগেও ব্যবহার করে থাকেন। পেটের সমস্যায় পাতা পানিতে জ্বাল দিয়ে ঝোল করে ভাতের সঙ্গে অথবা পাতার রস ৩-৪ চামচ অল্প গরম করে মধুর সঙ্গে প্রতিদিন ২-৩ বার করে ৩ দিন সেবন করলে নাকি উপকার পাওয়া যায় (টেস্ট করিনি নিজে)। শারীরিক দুর্বলতা, অরুচি ও বাতের ব্যথায় পাতা ও কচি ডগা কুচি কুচি করে কেটে প্রয়োজনীয় মসলাপাতি দিয়ে পিঁয়াজি বানিয়ে খেলে ভালো ফল পাওয়া যায় বলে গ্রামীণ সমাজে বিশ্বাস আছে।

কবিরাজরা এর ফুল ও পাতা সংগ্রহ করেন। পাতা বড়ো হলে খসখসে হয়ে যায়।
গন্ধ উৎকট হলেও অনেকের অবশ্য এই গাছের গন্ধটা খুব ভালো লাগে।
গাছের পাতা যতই দুর্গন্ধযুক্ত হোক এই পাতার বড়া কিন্তু খুবই সুস্বাদু।

রান্নার পরে অবশ্য এই বিশ্রী দুর্গন্ধ আর থাকে না। অনেকে মাছের সাথে দিয়ে রান্না করে, মাছের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য।
গন্ধ ভাদুলের পাতা বেটে চালের গুঁড়া মিশিয়ে বড়া বানানো যায়। তবে গরম গরম থাকতে খেতে হয়। খেতেও সুস্বাদু।
বেটে/ভর্তা করে গরম ভাতে খাওয়া হয়।

ডাল বাটা ও গন্ধভাদালি পাতার কুচি দিয়ে বড়া তৈরির প্রক্রিয়া :
পাতা পেস্ট করে, মটর ডালের পেস্ট সাথে এই পাতা পেস্ট,
- পরিমাণ মতো আদা বাটা,
- রসুন বাটা,
- পিঁয়াজ, মরিচ কুচি,
- ধনেপাতা কুচি দিতে পারেন,
- হলুদ, লবণ পরিমাণ মতো
মিশিয়ে ডুবো তেলে বড়া বা চপ ভাজতে হয়।

শুশুক

তাজউদ্দিন আহম্মদ

নদীর দেশ বাংলাদেশ।
দেশের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রসহ অসংখ্য নদী। এদেশের নদীগুলো প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের আধার। নদীতে বিচরণ করে নানা প্রজাতির মাছ। এর মধ্যে রয়েছে কিছু বিরল মৎস্যসম্পদ, যারা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।
শুশুক তাদের মধ্যে একটি পরিচিত নাম।

ডলফিন আমাদের সবারই খুব প্রিয়। সমুদ্র বা নদী উপকূলে ডলফিনের মনোমুগ্ধকর জলকেলির দৃশ্য মন ভরিয়ে দেয়। আমাদের দেশেও রয়েছে নদীর ডলফিন, যার দেশীয় নাম শুশুক। পদ্মা, যমুনা, সুরমা, হালদা কিংবা রুপসার বুকে শুশুকেরা একসময় দাপিয়ে বেড়াত। এখন সহজে তাদের দেখা মেলা ভার। বাংলাদেশে শুশুক বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর খাতায় নাম লিখিয়েছে।

শুশুকের অসংখ্য প্রজাতি রয়েছে। এরা মূলত মিঠাপানির ডলফিন। বাংলাদেশে প্রধানত যাদের দেখা মিলে তারা গাঙ্গেয় ডলফিন বা South Asian River Dolphin। স্থানীয়ভাবে অনেক অঞ্চলে 'হুম' বা 'হচ্ছুম মাছ' নামে পরিচিত। জেলেদের জালে ধরা পড়ে,

কারেন্ট জালে আটকে ও নদী দূষণ সহ বিভিন্ন কারণে শুশুকের সংখ্যা দিনে দিনে কমে আসছে। হারিয়ে যেতে বসেছে দেশের জীববৈচিত্র্য থেকে।

শ্রেণিবিন্যাস-

বাংলা নাম : শুশুক, হুম মাছ/হচ্ছুম মাছ, গাঙ্গেয় ডলফিন।

ইংরেজি নাম : Ganges river Dolphin/South asian river Dolphin.

Kingdom: Animalia

Phylum: Chordata

Class: Mammalia

Order: Artiodactyla

Family: Platanistidae

Genus: Platanistidae

Species: *P. gangetica*

শুশুক দেখতে অনেকটা সাধারণ ডলফিনের মতো হলেও দেহের গড়নে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এদের পৃষ্ঠ পাখনা কিছুটা ছোটো আকৃতির হয়, মুখে লম্বা চঞ্চুর মতো ঠোঁট থাকে। স্ত্রী শুশুক পুরুষের চেয়ে আকারে লম্বা। দেহের অন্যান্য স্বাভাবিক গঠন ডলফিনের মতোই। ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে সাধারণ দৃষ্টিতে আলাদা করা যায় না।

এদের জীবনধারণের পদ্ধতি বেশ বৈচিত্র্যময়। শুশুকের প্রধান খাদ্য মাছ বা চিংড়িজাতীয় প্রাণী। তাদের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল, চলাচলের জন্য তারা ইকোলোকেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে। বাদুড়ের মতই এরা আল্ট্রাসনিক শব্দ উৎপন্ন করে এবং প্রতিধ্বনির সাহায্যে চলাচলের পথ বুঝতে পারে। শ্বাস গ্রহণ করার জন্য কিছু সময় পরপর তাদের পানির উপর ভেসে উঠতে হয়, কারণ ফুলকা নেই তাদের। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তারা শিস বাজায় এবং দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে। শুশুকরা স্তন্যপায়ী প্রাণী, সাধারণত দু-তিন বছর পর পর বাচ্চার জন্ম দেয়। শিকার ধরার উপযোগী হয়ে উঠা পর্যন্ত বাচ্চারা মায়ের সাথেই থাকে। সাধারণত ২৬-২৮ বছর বাঁচে তারা।

কিউট এই প্রাণীটিকে বাংলাদেশের প্রায় সব বড়ো নদীতে পাওয়া যায়। সুন্দরবনের নদীগুলোতেও এদের বসবাস রয়েছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত এদের সংখ্যা কমে আসছে। কারেন্ট জালের ছোবলে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাচ্ছে অসংখ্য শুশুক। তাদের ইকোলোকেশন সিস্টেম কারেন্ট জালের সূক্ষ্ম ফাঁক ধরতে পারে না। ফলে সামনে ফাঁকা আছে ভেবে তারা এগিয়ে যায় এবং কারেন্ট জালে আটকা পড়ে। এছাড়া অবাধে মাছ শিকার ও নদীতে নৌযান চলাচলের কারণে শুশুকের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য বিরল জীবদের মত শুশুকও ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এদেশ থেকে। সরকারিভাবে শুশুক বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছে। বণ্যপ্রাণী আইন ২০১২ অনুসারে সংরক্ষিত প্রাণী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এদের। সুন্দরবনের কিছু অঞ্চল ও বড়ো নদীগুলোর কিছু অংশ মৎস্য অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এরপরেও শিকার ঠেকানো যাচ্ছে না। ফলাফলস্বরুপ ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগুচ্ছে তারা।

এভাবে চলতে থাকলে বাংলার বুক থেকে হারিয়ে যাবে আরো একটি জীববৈচিত্র্য। হালদা-রুপসার বালুময় তীরে বসে আর দেখা যাবে না শুশুকের জলকেলি। তাদের লম্ফে আর প্রকম্পিত হবে না স্রোতস্বিনীর বহমান স্রোত।

1. **বৈচি**

   টক জাতীয় এক বিলুপ্তপ্রায় ফল। বৈজ্ঞানিক নাম: *Flacourtia indica*

2. **কাউফল**

   এক অপরিচিত টক স্বাদের ফল। বুনো এই ফলটির বৈজ্ঞানিক নাম: *Garcinia cowa Roxb*

3. **পানিফল**

   দেখতে কাটাযুক্ত ও বিশ্রি ফলটি। কিন্তু খেতে ভালো এবং অনেক পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ। বৈজ্ঞানিক নাম: *Trapa natans*

4. **করমচা**

   ছড়ায় বিচরণ করা টক স্বাদের ছোট্ট ফলটি দেশের সব জায়গাতেই দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক নাম: *Carissa carandas*

5. **চুকাই**

   দেশে সর্বত্র পাওয়া গেলেও একটি অপ্রচলিত ফল। বৈজ্ঞানিক নাম: *Hibiscus sabdariffa*

6. **সাতকরা**

   সিলেটে প্রচলিত সাতকরা দেখতে লেবুর মতো, স্বাদ টক ও তিতা। বৈজ্ঞানিক নাম: *Citrus macroptera*

7. **ভেরেন্ডা**

   এর বীজ থেকে ক্যাস্টর অয়েল তৈরী হয়। বৈজ্ঞানিক নাম: *Ricinus Communis*

8. **দাদমর্দন**

   এর পাতার রস দাদ, পাঁচড়া বা চর্মরোগের ঔষধ। হলুদ ফুলগুলো শোভাবর্ধক হিসেবে কাজ করে। বৈজ্ঞানিক নাম: *Senna alata*

9. **অড়হর**

   এক ধরনের ডাল বীজ। অনেকভাবেই খাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক নাম *Cajanus cajan*।

প্লাস্টিকময় জীবন

স্বপ্নীল জয় ধর

(১)

ধরেন, আপনি ঢাকায় ঘুরতে গেছেন। ঢাকার সব আপনার ভালো লাগল কিন্তু ঢাকার সেই বিখ্যাত ট্রাফিক জ্যামে একদিন আটকে আপনার দম বন্ধ হয়ে গিয়ে আপনার আর ঢাকায় থাকতে কোনো ইচ্ছা হলো না এবং আপনি আপনার বাড়ি ফিরে এলেন। ভাইরে ভাই আপনি কি শুধু ঢাকার জ্যামটুকুই দেখেছেন? আর কিচ্ছু দেখেন নি যা দেখে আপনার ট্রাফিক জ্যামের থেকেও বেশি খারাপ লেগেছে? মাথা গরম হয়ে গেছে? আপনার মাথায় হয়তো অনেক কিছুই আসবে।

কিন্তু আমার যা দেখে সবচেয়ে খারাপ লেগেছে সেটা হলো ঢাকার প্লাস্টিক দূষণ। সেখানে দেখি সব জায়গায় প্লাস্টিক আর প্লাস্টিক।

না! রাস্তার প্লাস্টিকের কথা বলছি না। আমি বলছি ঢাকার জলাশয়গুলোর কথা। হয়তো আপনি আমাকে বলবেন ভাই আপনি এসব কী বলছেন ঢাকায় প্লাস্টিক কই বেশি? তার উপর প্লাস্টিক ফেলা হয় ডাস্টবিনে বা রাস্তায়। তো জলাশয়ে যায় কীভাবে?

যদি ভাই আপনি প্রথম প্রশ্নটা করেন তাহলে হয় আপনি ঢাকা ভালোভাবে ঘোরেননি বা দেখেননি। অথবা আপনি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন না। আর যদি দ্বিতীয় প্রশ্নটা করেন তাহলে আমি বলব যে ভাই আপনি প্লাস্টিক যেখানেই ফেলুন সেই প্লাস্টিক যদি রিসাইকেল না করা হয় তবে তা কোনো না কোনো ভাবে জলাশয় দিয়ে সমুদ্রে পৌঁছাবেই পৌঁছাবে। চলেন আমরা একটা কাল্পনিক হিসাব করে ফেলি। জানি না এটা কতটুকু সত্যি।

ধরি, একদিনে আপনার ঘরে অন্তত ১ টি করে প্লাস্টিকের প্যাকেট ব্যবহার করা হয়। তাহলে ১ মাসে বা ৩০ দিনে ৩০ টি প্যাকেট আপনি ব্যবহার করেন। এভাবে যদি ঢাকা শহরের সকল পরিবার ১ মাস আপনার মতোই প্যাকেট ব্যবহার করে তাহলে পরিস্থিতিটা কেমন হবে আপনি একটু ভাবেন। যদি ভাবতে কষ্ট হয় আমি একটু সাহায্য করি।

ধরি, ঢাকা শহরে পরিবারের সংখ্যা ১০ লাখ। তারা ৩০ দিনে ব্যবহার করে (১০,০০,০০০*৩০) বা, ৩,০০,০০,০০০ টি প্যাকেট। এ তো গেল শুধু ঢাকার কথা। এবার আপনি সারা বাংলাদেশের কথা ভাবুন। সারা বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের কথা তাদের পরিবারের কথা।

আপনি হয়তো ভাবলে অবাক হবেন যে আমাদের মোট ব্যবহৃত প্লাস্টিক প্যাকেটের মাত্র ৯% ই রিসাইকেল করা হয় আর বাকি অংশ হয় ফেলে দেওয়া হয় আর না হয় পুড়িয়ে ফেলা হয়। যা পরিবেশের উপর দারুনভাবে প্রভাব ফেলছে। তাহলে ভাবুন আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম কেমন হুমকির মুখে।

(২)

আসলে ১০০% এর মধ্যে ৯% রিসাইকেল হয় আর বাকি ৯১% এর মধ্যে মাত্র ১২% ই পোড়ানো হয় আর বাকি ৭৯% ফেলে দেওয়া হয়।

তাহলে ভেবে দেখুন কী অবস্থা আমাদের দেশের! না ভুল বললাম এই অবস্থা সারা বিশ্বেই!

হয়তো আপনি বলবেন ভাই আপনি কী বললেন এসব? আসলে এই প্রশ্ন সবারই আসার কথা কেননা আমরা ছোটোবেলা থেকেই একটা বুলি শুনে এসেছি বিদেশ আমাদের দেশের থেকে অনেক অনেক উন্নত। তাই হয়তো আপনার মনে এই প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক। ভাইরে ভাই, আসলে এই যে বুলিটা আসলে একটা কভার। খালি আমাদের দেশে সর্বত্র প্লাস্টিকের প্যাকেট দেখা যায় সেখানে দেখা যায় না। সেখানে যদি আপনি দেখতে চান তাহলে আপনাকে যেতে হবে ভাগারে । বিশ্বাস না হলে যেয়ে দেখতে পারেন। যাকগে সে কথা।

এবার আসল কথায় আসি। আপনি হয়তো আমাকে বলবেন আমি প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে। আসলে আমি তা বলতে চাচ্ছি না। প্লাস্টিকের আবিষ্কার আমাদের জীবনকে কতই না সহজ করে তুলেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অনেকবার ব্যবহার করা যায়, অল্প

খরচে অধিক উৎপাদন করা যায় বলে এর জনপ্রিয়তা অধিক।

কিন্তু আপনি কি এর খারাপ দিকগুলো একবারও ভেবে দেখেছেন?
যে প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলা হয় সেগুলো থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রার বৃদ্ধির জন্য দায়ী। আবার আপনি হয়তো চিন্তা করবেন তাহলে মাটিতে ফেলা হয় না কেন? এর উত্তর যারা একটু হলেও প্লাস্টিক সম্পর্কে বইয়ে পড়ে জানতে পেরেছেন তারা হয়তো বলবে প্লাস্টিক অপচনশীল। এর মাটিতে পচতে সময় লাগে ১৪০০ বছর। এবার একটু ব্যাপারটাকে অন্যভাবে চিন্তা করুন।
যদি প্লাস্টিক মাটিতে ফেলা হয় তবে যদি সেই প্লাস্টিকের মধ্যে থাকা বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হবে এবং তা ভূগর্ভস্থ পানির সাথে মিশে পানিকে বিষাক্ত করবে।

আবার মাটিতে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে যা প্লাস্টিকের অণুকে ভাঙতে সাহায্য করে। তাদের মধ্যে একটা ফ্ল্যাভোব্যাকটেরিয়া(Flavobaceria)। বিদঘুটে নাম তাই না? এরকম আরো আছে কিন্তু বেশি লিখে মাথা নষ্ট করাতে চাই না।

যাহোক, ফ্ল্যাভোব্যাকটেরিয়ার কথায় আসি। এই ব্যাকটেরিয়ার মহাশয়কে বলা হয় নাইলন ইটিং ব্যাকটেরিয়া। সে নিজের দেহ থেকে এক ধরনের এনজাইম যার নাম নাইলোনেজ। এই এনজাইম সে ক্ষরন করে। যা প্লাস্টিকের নাইলোন অণুকে ভাঙতে সাহায্য করে। আপনি হয়তো খুশিই হবেন এই কথা শুনে। কিন্তু এখনও তো কাহিনির আসল টুইস্টই বলা হয়নি। সে মহাশয় আমাদের সাহায্য করেন ঠিকই কিন্তু সেই সাহায্যকে সাহায্য বলবো না অন্যকিছু বলব তা না হয় আপনি পরের কথাটি পড়েই বুঝে নিন।
এই মহাশয় আসলে ব্যাকটেরিয়ার জগতের একটা আস্ত মীর জাফর। সে অনেকটা সিরাজউদ্দৌল্লার মতো আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন রোধে প্লাস্টিকের সাথে যুদ্ধ করতে সাহায্য করে ঠিকই কিন্তু শেষে সে ব্রিটিশদের সাথে হাত মিলাতে পছন্দ করে। সে জলবায়ু পরিবর্তনে সাহায্য করে। আসলে এই মহাশয় প্লাস্টিক অণুকে ভাঙে ঠিকই কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতার উপহার হিসেবে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন করে। যা কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে অনেক বেশি তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে।

আবার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, জাস্ট প্রতিবছর প্লাস্টিক উৎপাদন করতেই ১৭ মিলিয়ন ব্যারেল তেল ব্যবহার করা হয়। এক কেজি প্লাস্টিক উৎপাদনে প্রায় দুই থেকে তিন কেজি পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ভালোভাবেই ভূমিকা রাখে।

সারা বিশ্বে বছরে যে পরিমাণ প্লাস্টিক দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে যার এক-চতুর্থাংশ সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। পরিবেশবিদরা বলছেন, এ দূষণের হার যেভাবে বাড়ছে তাতে বিশ্বে নেমে আসবে বিপর্যয়। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতে, প্রতি বছর আট মিলিয়ন টন প্লাস্টিক সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে। এ ধারা চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রে প্লাস্টিকের ওজন হবে মাছের ওজনের চেয়েও বেশি। এমনকি পৃথিবীব্যাপী প্রতি মিনিটে ১০ লাখ প্লাস্টিক বোতল সাগরে পতিত হচ্ছে।

সমুদ্রবিজ্ঞানী শেরি লিপ্পিয়াট বলেছেন, "আমরা এক পাউন্ড টুনা মাছ সংগ্রহের বিপরীতে দুই পাউন্ড করে প্লাস্টিক সমুদ্রে ফেলছি!"

(৩)

আবারও একটা কাল্পনিক হিসাব করি।

শেষ আদমশুমারী মতে সে সময়ে (সময়টা অবশ্য আমার মনে নেই) জনসংখ্যা ছিল ১৬.৮ কোটি। আবার অনেক সূত্র মতে বর্তমানে জনসংখ্যা ১৮ কোটি। তাহলে যদি জ্যামিতিক গড় করা হয় তবে জনসংখ্যা হবে ১৭.৩৯ কোটি।
(জ্যামিতিক গড় করলাম কারণ গাণিতিক গড় করলে অনেক সময় তথ্য সঠিক আসে না।)

আর যদি একটা পরিবারে সর্বনিম্ন ২ জন আর সর্বোচ্চ ৮ জন মানুষ বাস করে। তাহলে জ্যামিতিক গড় করলে হয় ৪ জন। তাহলে বাংলাদেশে কয়টি পরিবার আছে? (১৭.৩৯ কোটি÷৪) বা ৪.৩৪৫ কোটি পরিবার।
(আগেই বলছি হিসাবটা সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক)

যদি ৪.৩৪৫ কোটি পরিবার একদিনে অন্তত ১ টি করে প্লাস্টিকের প্যাকেট ব্যবহার করে। এভাবে ১ মাসে বা ৩০ দিনে তারা কয়টা প্যাকেট ব্যবহার করে? তারা ৩০ দিনে ব্যবহার করে মোটামুটি ১৩০ কোটি প্যাকেট।
এবার একটু অন্যভাবে আর একটা হিসাব করি।

ধরি, একটা প্যাকেটের ওজন সর্বোচ্চ ৪০ গ্রাম। তাহলে ১ মাসে বাংলাদেশে ব্যবহৃত মোট প্যাকেটগুলোর ওজন মোটামুটি ৫,০০০ কোটি গ্রাম। গ্রাম বেশি বেখাপ্পা লাগছে। তাই ১০০০ দিয়ে ভাগ করে কিলোগ্রামে নেই। ৫ কোটি কিলোগ্রাম! এবার টনে প্রকাশ করি তাহলে হয় ৫০ হাজার টন।

কী? বেশি মনে হচ্ছে? যদি তাই হয় তবে বলছি ১৯৫০ সাল থেকে ৮.৩ বিলিয়ন মেট্রিক টনের বেশি প্লাস্টিক তৈরি হয়েছে। যার মাত্র ৯% ই রিসাইকেল হয় আর বাকি ৭৯% এর কোনো খবর থাকে না তা কোথায় যাচ্ছে? ভাগাড়ে না অন্যত্র। তবে বর্তমানে যে পরিস্থিতি তা চলতে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমান হবে ১২ বিলিয়ন মেট্রিক টন।
তখন কি আমরা প্লাস্টিকের দূর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারব? আমাদের জীবন কি প্লাস্টিকময় হয়ে থাকবে?

তাই ভবিষ্যতের এই দুর্যোগ এড়াতে চলুন না আজ থেকেই প্লাস্টিকের প্যাকেট ব্যবহার থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি। তার বদলে কাগজের ঠোঙা বা পাটের ব্যাগ ব্যবহার করি। বায়োপ্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করতে পারি। ওয়ানটাইম প্লাস্টিকের তৈরি গ্লাস, প্লেট ইত্যাদি ব্যবহারের বদলে ব্যক্তিগত গ্লাস, প্লেট ব্যবহার করতে পারি। তাতে অত্যন্ত সমুদ্রের উপর চাপ কমবে।

আমরা যদি আমাদের তরফ থেকে এই সব অভ্যাস করতে পারি তবে আমরা আমাদের এই সুন্দর ধরণীকে ভবিষ্যতে জঞ্জাল হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারি।

সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের সেই কথা বারবার মনে পড়ছে।

চলে যাব— তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
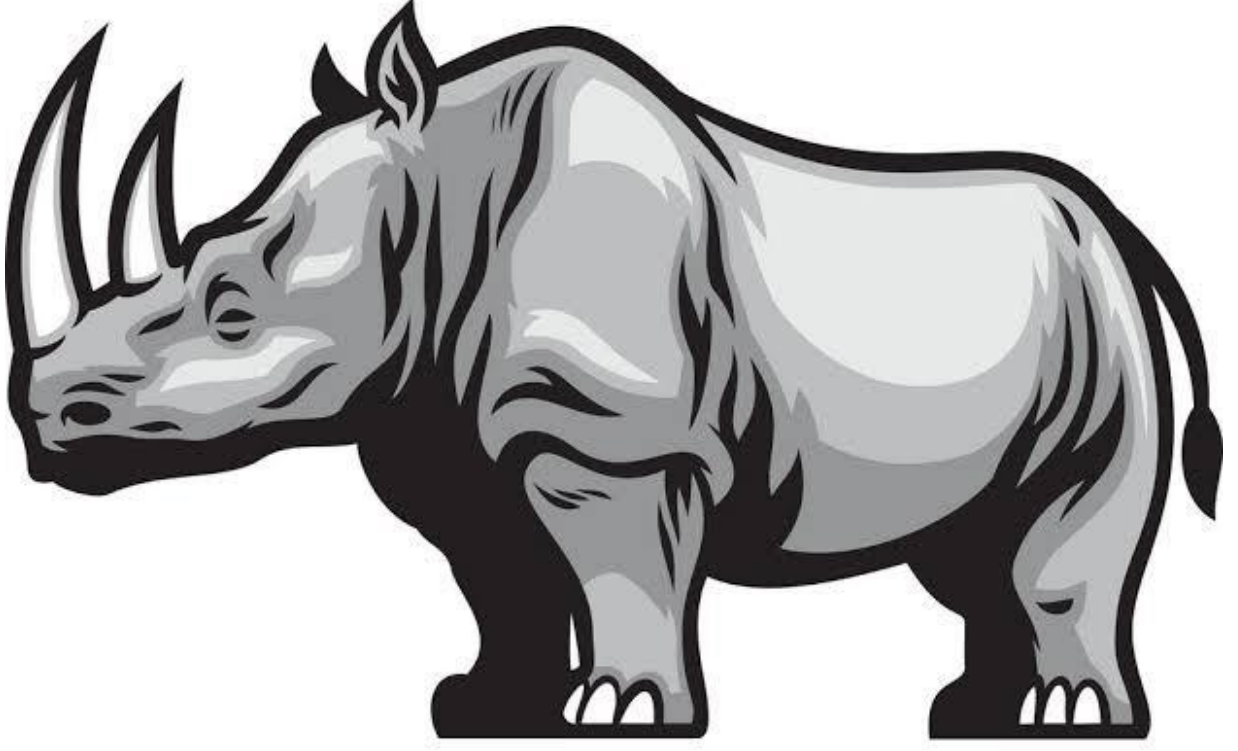
গন্ডার: এক দুঃখবহ স্মৃতি

রওনক শাহরিয়ার

"বাংলাদেশেও একসময় গন্ডার দেখতে পাওয়া যেত" কথাটা প্রথমবার শোনার পর বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম। সত্যিই কি এই বিশাল বপুর প্রাণীটা আমাদের দেশেও থাকত। থাকলেও বিলুপ্ত কীভাবে হলো। বর্তমানে তো চিড়িয়াখানা বাদে কল্পনা করাও দায়। এই গন্ডারের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস 'সুন্দরবনের ইতিহাস' বইতে লেখক তুলে ধরেছেন। তবে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ঘটনা আমাদের জন্য সত্যিই দুঃখজনক বিষয়।

গন্ডার মূলত তৃণভোজী একটা প্রাণী, রাইনোসেরোটিডি পরিবারের সদস্য। এটা আকারে ছয় ফুট বা একটু বেশি এবং উচ্চতা পাঁচ ফুটের মতো হয়। সারা পৃথিবীতে মোট গন্ডারের পাঁচটা প্রজাতির দেখা মেলে। যার মধ্যে চারটিই বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। তবে অবাক করার বিষয় হলো, পাঁচটার মধ্যে তিন প্রজাতির গন্ডারই বাংলাদেশে দেখা মিলত। কালের বিবর্তনে অত্যধিক শিকার, বাসস্থান হারিয়ে আজ কোনো জীবিত গন্ডারের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত এই তিন প্রজাতির গন্ডারের বসতির বিস্তৃতি ছিল যথাক্রমে :

Indian rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*) একশিঙ্গি বড় গন্ডার নেপাল সিকিম থেকে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত।
Javan rhinoceros (*Sunda rhinoceros*)

সুন্দরবন, যশোর থেকে বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহসহ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত। সুন্দরবন ও যশোর থেকে শিকার করা এমন ৬৬টি

একশিঙ্গি ছোটো গন্ডার কলকাতা, বার্লিন ও লন্ডন জাদুঘরে ব্রিটিশ শাসন আমলে নিয়ে যাওয়া হয়।
Sumatran (*Didermoceros sumatrensis*) দুইশিঙ্গি গন্ডারের আবাস কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার পর্যন্ত ছিল। (প্রথম আলোর অংশ বিশেষ)

সুন্দরবনে গন্ডারদের বিলুপ্তির মূল কারণ ছিল এর অত্যাধিক শিকার করা। গন্ডারের চামড়া, শিং ছিল মূল আকর্ষণে। এছাড়াও আদিবাসীরা গন্ডারের মাংস খেত। তৃণাঞ্চলের ঘাটতিও এদের বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। মধ্যযুগে এর চামড়া দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করা হতো। তবে ব্রিটিশ শাসন আমলে ইংরেজদের প্রমোদ বিনোদনের জন্য ব্যাপক শিকারের ফলে গন্ডার অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। এবং উনবিংশ শতকের শেষে দিকেই গন্ডারের এক কষ্টকর ঘটনা ঘটে।

১৮৬৮ সালে চট্টগ্রামে কোনো এক স্থানে একটা দুই শিং এর গন্ডার চোরাবালিতে আটকে পড়ে। স্থানীয় মানুষ তুলে আটকে রেখে প্রসাশনকে জানায়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ক্যাপ্টেন হুড ও মি. উইকস আটটি হাতি নিয়ে ১৬ ঘণ্টা কঠোর চেষ্টার পর একে বন্দী করে। তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। অর্থলোভী কর্মকার্তারা পাঁচ হাজার পাউন্ডে লন্ডন চিড়িয়াখানায় বিক্রি করে দেয় গন্ডারটিকে। এই দুই শিংয়ের গন্ডারটি **বেগম** নামে পরিচিতি পায়।
তার একটা ছবিও পাওয়া যায়, যা লন্ডনের এক চিত্রশিল্পী এঁকেছিল।

এই ঘটনার কিছু বছর পর ইংরেজদের হাতে কুমিল্লায় আরেকটা দুই শিংয়ের গন্ডার হত্যা হয়। তবে শেষ জীবিত গন্ডারটি ছিল এই 'বেগম', দেশে যার জায়গা হয়নি। তার একটা ছবি-

বিংশ শতাব্দির শুরুর পর আর কোনো জীবিত গন্ডারের খোঁজ মিলেনি। মানুষের দ্বারা এই তিন প্রজাতির গন্ডারের বিলুপ্তি ঘটে। তবে পাশ্ববর্তী দেশগুলোতে এখনও গন্ডার পাওয়া যায়।
গন্ডার থেকে একটা মজার জিনিস প্রসিদ্ধ। 'গেঁড়াকল' শব্দটা এই গন্ডার (স্থানীয় গেঁড়া) নিধন কল থেকে এসেছে, যা দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষেরা ব্যবহার করে শিকার করত।
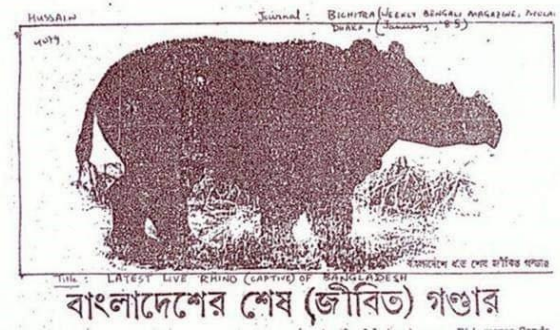
Biodiversity of Protected Areas of Bangladesh

Volume I: Rema-Kalenga Wildlife Sanctuary
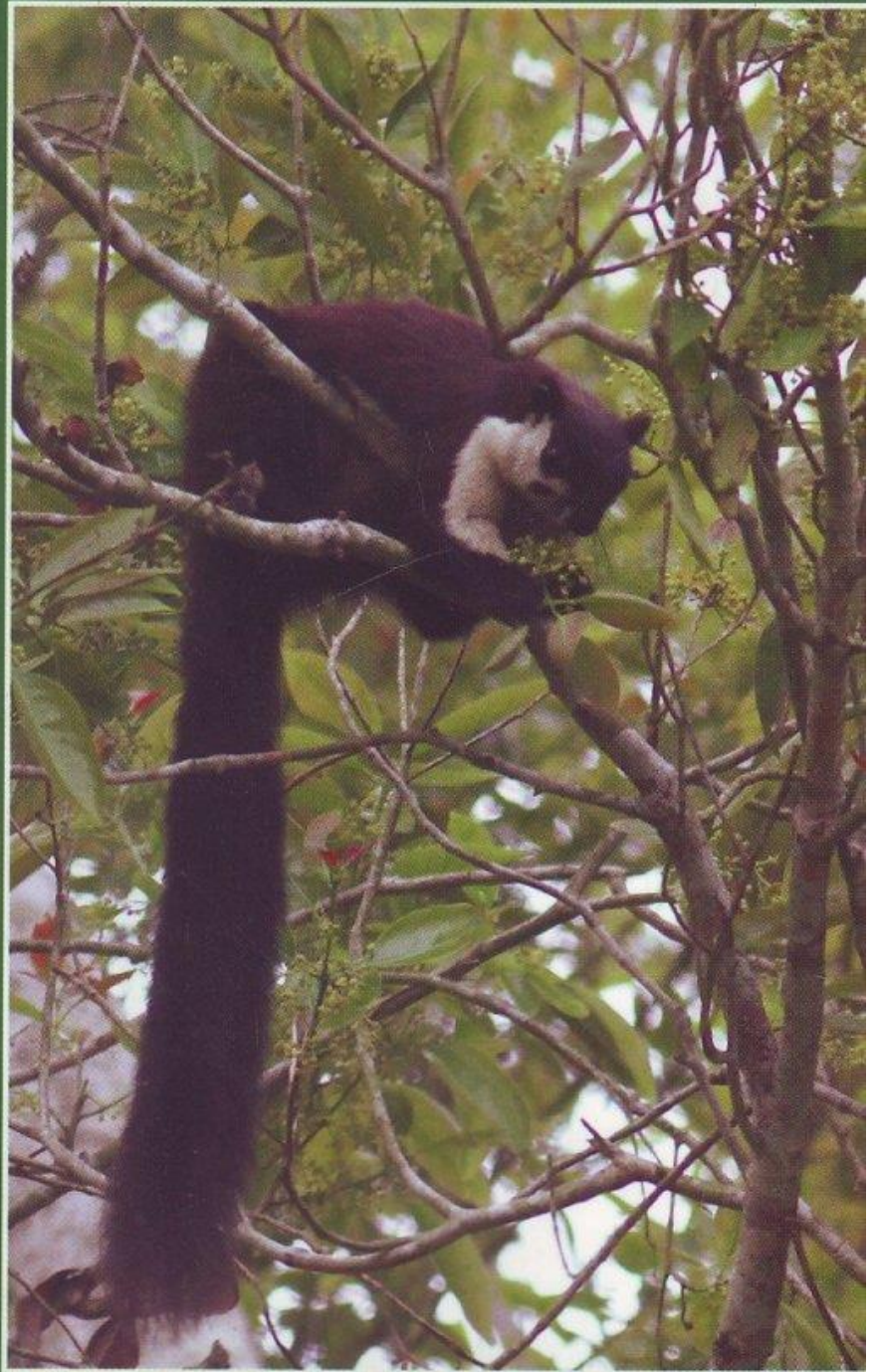
Mohammed Mostafa Feeroz
Md. Kamrul Hasan
M. Monirul H. Khan

Biodiversity of Protected areas of Bangladesh: Rema Kalenga

লেখক: মোস্তফা ফিরোজ, কামরুল হাসান, মনিরুল এইচ খান
রিভিউয়ার: নাঈম হোসেন ফারুকী

অনেকেই জানে না, বাংলাদেশের জঙ্গলগুলো নিয়ে বই আছে। খুব সুন্দর অয়েল পেপারের কাগজে লেখা ছবিওয়ালা বই। রেমা কালেঙ্গার বইটাতে সেখানকার একগাঁদা প্রাণীর ছবি আছে। রাতে ক্যামেরা ট্র্যাপ দিয়ে তোলা সজারুর ছবি আছে। গন্ধগোকুলের ছবি আছে।

শুধু কি ছবি? হাজার হাজার তথ্য, গ্রাফ দিয়ে ভরা এই বই। পিচ্চি এই রেমা কালেঙ্গা যে বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জঙ্গল, এর প্রতি একর জায়গায় এত জিনিস গিজগিজ করছে এই বই না পড়লে জানতে পারতাম না।

এই সিরিজের আরও দুইটা বই আছে, দুধপুকুর আর চুনাটির জঙ্গল নিয়ে। কালেক্ট করার খুব ইচ্ছা।

এবার বই কেনা নিয়ে দুই একটা কথা বলি। এই বই লিখেছেন জাহাঙ্গীরগরের বিজ্ঞানীরা, কিছু কপি রেখে এসেছিলেন লাসো ভাইয়ের কাছে। রেমা কালেঙ্গার জঙ্গলে রাতে খাওয়ার সময় যখন লাসো ভাইয়ের বাসায় খেতে আসি, উনি এই বইয়ের ছবিগুলো দেখিয়ে লোভ দেখাচ্ছিলেন। শেষে এক কপি না কিনে পারলাম না।

সকালে বৃষ্টিতে কাকভেঁজা হয়ে যখন তাবুতে ফিরি, দেখি আমার স্লিপিং ব্যাগ, টর্চ সব ঠিক আছে, খালি একটা জিনিস চুরি গেছে। সেটা হচ্ছে এই বই! পরে লাসো ভাইয়ের কাছ থেকে আরও এক কপি কিনি।

আশা করি, চোর বাবাজি বই পড়ে অনেক কিছু শিখেছে :")
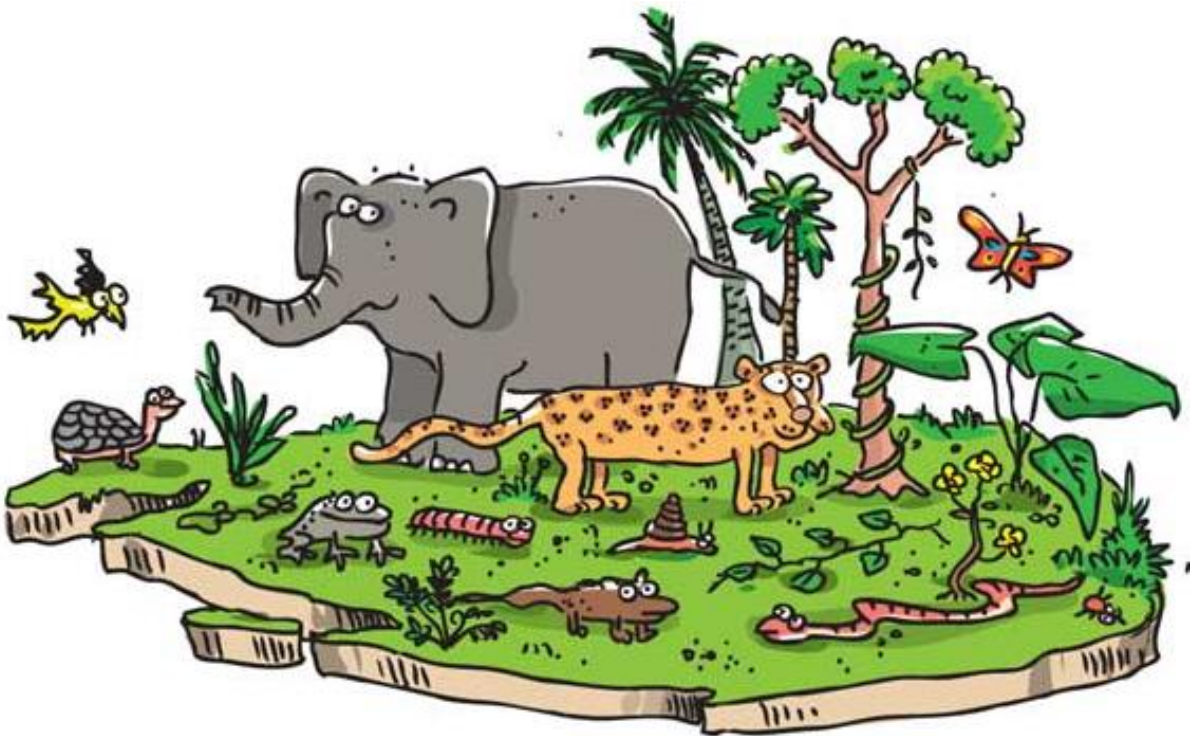
ডুমুর ফুলে পরাগায়ন- প্রকৃতির এক অদ্ভুত সততা, প্রতারণা আর প্রতিশোধের গল্প

ওমর খালিদ সোহাগ

ডুমুর ফল খেয়েছেন কে কে? ডুমুরের ফুল দেখেছেন কখনো? না দেখলেও স্কুলে এই বাগধারা তো পড়েছেন হয়তো- ডুমুরের ফুল, যার অর্থ অদৃশ্য বা দুর্লভ বস্তু। কিন্তু কেন ডুমুরের ফুলের সাথে অদৃশ্য বা দুর্লভের তুলনা করা হয়? এই ফুল দেখা যায় না নাকি খুবই কঠিন খুঁজে পাওয়া?

মজার ব্যাপার হল ডুমুর ফল প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এর ফুল আসলে হয় ফলের ভেতরে! মানে ডুমুর ফল যেটাকে বলে সেই ফলের বাইরের আবরণের ভেতরে থাকে সব ফুল। মানে ডুমুর ফুলকে বাইরে থেকে কখনও দেখা যায় না। এজন্য ডুমুর ফুল বাগধারার অর্থ এমন। কিন্তু বাগধারা না, আসল প্রশ্ন হলো, যদি সব ফুল ভেতরেই থাকে, এই ফুলে তাহলে পরাগায়ন হয় কীভাবে? কারণ পরাগায়ন ছাড়া তো বংশবৃদ্ধি সম্ভব না।

ডুমুর ফল দুই ধরনের হয় - পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গ। পুং ফলের ভেতরে পুং ফুলের মধ্যে থাকে পরাগরেণু যেটাকে কোনোভাবে পৌঁছাতে হবে স্ত্রী ফুল পর্যন্ত। এক ফলের ভেতর থেকে আরেক ফলের ভেতরে। না কোনো প্রজাপতি এই কাজ করতে পারবে, না কোনো পাখি, না ভ্রমর বা অন্য কোনো পতঙ্গ। এই কাজের জন্য আসলে প্রকৃতিতে নিয়োজিত আছে এক বিশেষ ধরনের পতঙ্গ। একে বলা হয় ডুমুরের পোকা (Fig Wasp)। এই পোকার জীবন ডুমুর ফুলের পরাগায়নের উপর নির্ভরশীল, এজন্য এদের নাম ডুমুরের নামেই করা হয়েছে। প্রকৃতি যেন এই পোকাকে তৈরিই করেছে ডুমুর গাছের জন্য। ডুমুর ফলের নিচের দিকে ছোট্ট একটা ছিদ্র থাকে, যেই ছিদ্র দিয়ে ডুমুর পোকা ফলের ভেতরে ঢুকতে পারে। আর এখানেই শুরু হয় জীবন মরণের সব খেলা।

.

এটা একটা চক্র, তো শুরু করা যাক একটা প্রেগনেন্ট স্ত্রী ডুমুর পোকা থেকে। এই পোকারা ডুমুর গাছেই থাকে। এরা আর্থোপোডা পর্বের প্রাণী। এই পোকা ডিম পাড়ার জন্য পুং ডুমুর ফল খোঁজে, কারণ পুং ফলের ভেতরের অবস্থা এই পোকার ডিম পাড়ার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী জায়গা। ডুমুরের ফল যখন সুগঠিত হয়নি তখন এই পোকাগুলো ডিম পাড়ার জন্য ফলের নিচের ছিদ্র দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। কিন্তু এই ছিদ্র খুবই ছোটো, এর ভেতর দিয়ে কষ্ট করে ঢোকার সময় ডুমুর পোকার দেহের নানা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পাখা ঝরে পড়ে। একবার কষ্ট করে ভেতরে পৌঁছে গেলে এরা সেখানে ডিম পাড়ে আর তার জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হয়, সে মারা যায়। ডিম থেকে পোকার লার্ভা জন্ম গ্রহণ করে আর এরা যথেষ্ট পরিমাণ সক্ষম হলে ছেলে পোকা আর মেয়ে পোকার মধ্যে মিলন ঘটে। জন্মের পরে প্রথম কাজ তাদের এটা। মানে ফলের ভেতরে জন্মগ্রহণ করা মেয়ে পোকাগুলো ফল থেকে বের হওয়ার আগেই প্রেগনেন্ট হয়ে যায়। এই স্টেজ সম্পূর্ণ হলে ছেলে পোকাগুলো সবাই মিলে ফল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রাস্তা খুঁড়তে থাকে। আসলে এরা রাস্তা বানায় মেয়ে সঙ্গীগুলোর বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। ছেলে পোকাগুলোর পাখা নেই, এরা দেখতেও পায় না, আবার এই সুরঙ্গ খোড়ার সময় অনেকে আহত হয়। তো এই খোঁড়াখুড়ি শেষ হলে অনেক ছেলে পোকাই মারা যায়, বা যারা বেঁচে থাকে তারা গাছে বাস করে, এগুলো আর কোনো কাজে আসে না। কিন্তু এদের খোঁড়া সেই সুরঙ্গ দিয়ে প্রেগনেন্ট মেয়ে পোকাগুলো পুং ফুলের পরাগরেণু গায়ে, পাখায় লাগিয়ে বেরিয়ে আসে। এই স্ত্রী পোকাগুলো এখন নতুন ফল খোঁজে ডিম পাড়ার জন্য। আর এই পোকাগুলো যখন ডিম পাড়ার জন্য একটা স্ত্রী ফুলে প্রবেশ করে তখন ফুলের পরাগায়ন সম্পন্ন হয়। কিন্তু স্ত্রী ফলের ভেতরের আবহাওয়া পোকার বা ডিমের জন্য অনুকূল না। তো কোনো প্রেগনেন্ট পোকা স্ত্রী ডুমুর ফলে প্রবেশ করলে এর মৃত্যু ঘটে, পুং ফল ছাড়া এরা বাঁচতে পারে না।

স্ত্রী ফলের ভেতরে স্ত্রী পোকার মৃত্যু হলে ডুমুর ফল এক ধরনের এনজাইম নির্গত করে যা পোকার মৃতদেহকে

নষ্ট করে দেয়। ডুমুর পোকার এই লাইফ সাইকেল মাত্র ২ দিনের!

তার মানে ডুমুর গাছের বংশবৃদ্ধির জন্য আসলে দরকার স্ত্রী পোকা যেন ঢুকে স্ত্রী ফুলে, কিন্তু স্ত্রী পোকার বংশবৃদ্ধির জন্য ঢোকা দরকার পুং ফুলে। গাছ বাঁচলে পোকা বাঁচবে না, আর পোকা বাঁচলে গাছ বাঁচবে না, এমন অবস্থা! এই সমস্যার সমাধানও প্রকৃতি নিজেই করে নিয়েছে। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে ডুমুর গাছ এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে এর পুং আর স্ত্রী ফল দেখতে একই রকম, পোকা যেন বাইরে থেকে দেখে কোনোভাবে বুঝতে না পারে যে ভেতরে পুং ফুল না স্ত্রী ফুল আছে। ভেতর পর্যন্ত যাওয়ার আগে কোনো প্রেগনেন্ট পোকা বুঝতেই পারে না যে সে কার ভেতরে ঢুকছে। পোকার সততা আর গাছের প্রতারণা! কিছু পোকা পুং ফুলে ঢোকে, কিছু পোকা স্ত্রী ফলে, আর গাছ-পোকার এই চক্র চলতে থাকে। এক গবেষণায় তো এটাও দেখা যায় যে ডুমুর পোকা যদি যথেষ্ট পরিমাণ স্ত্রী ফলে না ঢুকে পুং ফলে ঢোকে তাহলে গাছ সেই ফলগুলো দ্রুত ঝরিয়ে ফেলে দেয়, যাতে গাছের বংশবৃদ্ধি না হওয়ায় পোকারও বংশবৃদ্ধি না হয়, গাছের প্রতিশোধ!

আমরা খাদ্য হিসাবে প্রধাণত স্ত্রী ডুমুর ফল খাই, এটা খেতে মিষ্টি আর নরম। একটা কুড়মুড়ে ভাব রয়েছে, সেটা হয় ফলের বীজগুলোর স্বাদ। পুং ফল সাধারণত খাওয়া হয় না, স্ত্রী ফলের মতো এর তেমন স্বাদ নেই আর ভেতরে পোকা থাকাটাও স্বাভাবিক।
এই হল ডুমুর ফুলের ইউনিক পরাগায়নের সিস্টেম। কিন্তু প্রকৃতিতে ডুমুরই শুধু এমন ফল না যার ফুল হয় ভেতরে। বটের ফলও এরকম। কিন্তু ডুমুরের মতো স্পেশাল পোকার সাথে মিলবন্ধন অন্য প্রজাতিতে দুর্লভ। যাহোক, এটা ছাড়া আসলে ডুমুর ফল সম্পর্কে আরও জানার বিষয় আছে। এছাড়া ডুমুর উচ্চমানের ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় স্মরণাতীতকাল থেকে ডুমুরের পাতা, কাঁচা ও পাকা ফল, নির্যাস, বাকল, মূল প্রভৃতি কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষজ্ঞদের তথ্য অনুযায়ী, গুটিবসন্ত, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি ও মূত্রসংক্রান্ত সমস্যা, স্নায়বিক দুর্বলতা, মস্তিষ্কের শক্তিবৃদ্ধি, সর্দি-কাশি, ফোড়া বা গ্রন্থস্ফীতি (টিউমার) ও স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় জগডুমুর কার্যকর। এছাড়া ডুমুর ফল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, ওজন কমাতে সাহায্য করে, ফলে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার আশঙ্কা কমায়, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, রক্তের ট্রাইগ্লিসারিডসকে কমায়, হিমোগ্লোবিন ঠিক রাখে, ত্বকের জন্য উপকারী, হাড় মজবুত করে ইত্যাদি আরও অনেক উপকার করে দেহের। 'ডুমুর ফল' লিখে গুগলে সার্চ করলেই এর পুষ্টিগুণ, ঔষধী গুণ, উপকারীতা সবকিছু পেয়ে যাবেন, তো সেটা নিয়ে বিস্তারিত লিখে বড়ো করলাম না। এই লেখার আসল উদ্দেশ্য ছিল ডুমুরের পরাগায়ন সম্পর্কে বলা। সেই সুবাদে একটা ফ্রি মার্কেটিংও হয়ে গেল ফলের।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, যে মিষ্টি নরম ডুমুরের কথা বললাম সেটা সাধারণত বাংলাদেশে পাওয়া যায় না তেমন। বাংলাদেশে সচরাচর যে ডুমুর পাওয়া যায় তার ফল ছোটো এবং খাওয়ার অনুপযুক্ত। এর আরেক নাম 'কাকডুমুর'। এই গাছ অযত্নে-অবহেলায় এখানে সেখানে ব্যাপক সংখ্যায় গজিয়ে ওঠে। গাছ আর ফল তুলনামূলকভাবে ছোটো। অনেক এলাকায় এই ডুমুর দিয়ে তরকারি রান্না করে খাওয়া হয়। এই ডুমুরের পাতা শিরিশ কাগজের মত খসখসে। এর ফল কান্ডের গায়ে থোকায় থোকায় জন্মে। অনেকে এই ডুমুরকে জগডুমুর বা যজ্ঞডুমুরও বলে। কিন্তু মিশর, ইরান ইত্যাদি এলাকায় যে ডুমুর পাওয়া যায় তার ফল বড়ো আকারের এবং এটি বেশ মিষ্টি ও সুস্বাদু একটি ফল। এজন্য এসব দেশে বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদন করা হয়।

চশমা পরা বানর

জীমূতেন্দ্র

চশমা পরা হনুমান(Phayre's leaf monkey/ Phayre's Langur)
শ্রেণিবিন্যাস -
Kingdom-Animalia
Phylum-Chordata
Class-Mammalia
Order-Primates
Genus-Trachepithecus
Species-T.phayrei

"চশমা পরা বানর" শুনতেই কেমন অদ্ভুত লাগে না? এই বানর কি তবে চশমা পরে? না, মোটেও না। মূলত এই বানরের ধূসর গায়ের লোম এবং একইসাথে চোখের চারপাশে ঘন কালো লোমের উপস্থিতির কারণে একে চশমা পরা বলে মনে হয়।

এই বানর বৃক্ষচারী অর্থাৎ গাছে গাছে থাকে। এটি সাধারণত চিরহরিৎ (Evergreen) এবং পর্ণমোচী (Deciduous) ধরনের বনাঞ্চলে থাকে। ঘন চিরহরিৎ বনাঞ্চলে ১৫ থেকে ৫০ পর্যন্ত উচ্চতায় থাকে। বনবাসী ও বৃক্ষচারী হওয়ায় এরা গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। যেসকল জায়গায় উক্ত দুই ধরণের বনাঞ্চলের অস্তিত্ব নেই, সেখানে এরা বাঁশ ও বিভিন্ন ধরণের গুল্ম খেয়ে বেঁচে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, এদের গায়ের লোম ধূসর। তবে এই ধূসর অনেকটা নীলাভ ধরণের। অঙ্কীয় বা সামনের দিকে কিছু সাদাটে এবং পৃষ্ঠীয় বা পেছনের দিকে কিছুটা বাদামি লোমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও, এদের মাথা ও লেজের লোম কিছুটা গাঢ় রংয়ের এবং মাথা ও ঠোঁট সাদা। আকারে নারী বানররা (১.১৫ - ১.৩ মিটার) পুরুষ বানরদের (১.০৭ - ১.১ মিটার) থেকে কিছুটা দীর্ঘ হয়ে থাকে। কিন্তু পুরুষদের গড় ওজন (৭.৪ কেজি) নারীদের গড় ওজনের (৬.২ কেজি) তুলনায় কম হয়ে থাকে। এছাড়াও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের দৈহিক দৈর্ঘ্যের ৬৮% মূলত লেজের দৈর্ঘ্য।

প্রজননগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই বানর সাধারণত বহুগামী। নিয়মিত বিরতিতে মার্চ-এপ্রিল মাসের দিকে স্ত্রী বানররা একবারে একটি করে সন্তান প্রসব করে

থাকে। গর্ভধারণের মেয়াদকাল প্রায় ২০৫ দিন। জন্মগ্রহণ করার পর সদ্যপ্রসূত বানরছানা প্রায় ১ বছর যাবত নিবিড় পরিচর্যা পেয়ে থাকে, যার মূল দায়িত্বে থাকে মা বানর। এছাড়া অন্যান্য সহোদর বানররাও মায়ের অনুপস্থিতি বা অন্য কোনো কারণে বানরছানার পরিচর্যা করে থাকে। কারণ, অন্যান্য ভাইবোনদের জন্মগ্রহণের পরেও কিশোর বানররা তাদের মায়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। সাধারণত ৩-৪ বছরের মধ্যে একটি পুরুষ বানর পূর্ণাঙ্গ যৌন সক্ষমতা লাভ করে থাকে।

(এই বানরের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটায়, যাকে বলে Lost call। জন্ম দেয়ার পর বানরছানা দল থেকে হারিয়ে গেলে মা বানর সেটা দলের সবাইকে চিৎকার করে জানিয়ে দেয়, যা বানরছানাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।)

সামাজিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এই বানরেরা দলবেঁধে থাকে। একেকটি দল ৮ থেকে ২২ টি বানর নিয়ে গঠিত হয়। প্রতিটি দলে একটি ডমিন্যান্ট পুরুষ বানর, ৩ থেকে ৬ টি স্ত্রী বানর এবং অন্যান্য বিভিন্ন বয়সী বানর থাকে। সাধারণত কিশোর পুরুষ বানরেরা যৌনসক্ষমতা অর্জনের পূর্বেই দল ছেড়ে চলে যায়, যাতে প্রজননের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিয়ে ডমিন্যান্ট পুরুষ বানরের সাথে কোনো বিরোধ না সৃষ্টি হয়। স্ত্রী বানরেরা সাধারণত দল ছেড়ে যায় না। এই বানরেরা নিজেদের দলীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে খুবই সংরক্ষণশীল। ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্র বাদে দলের সীমার মধ্যে দলবহির্ভূত অন্য কোনো বানরকে তারা প্রবেশ করতে দেয় না বা দলের প্রয়োজনীয় জিনিসে ভাগ বসাতে দেয় না। বিভিন্ন সময় খাদ্য বা প্রজননসঙ্গীর খোঁজে দলছুট পুরুষ বানর অন্য কোনো দলের সীমানার ভেতর অনুপ্রবেশ করতে চাইলে ওই দলের ডমিন্যান্ট পুরুষের সাথে তাকে লড়াইয়ে নামতে হয়। বিজয়ী বানর দলের মূল নেতৃত্ব এবং অন্যান্য অধিকার পায় এবং পরাজিত বানরকে দল ছেড়ে চলে যেতে হয়।

এই বানরদের মূল শিকারী হলো মানুষরা। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ মাংস ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনে এই বানরদের শিকার করে থাকে। এছাড়াও বাসস্থানের অভাব এবং দলের ভাঙনের কারণে এদের অস্তিত্ব এখন সংকটের মুখে। বর্তমানে পৃথিবীতে আনুমানিক ১,৩০০ টি চশমা বানর রয়েছে। IUCN (International Union of Conservation of Nature) এর রেডলিস্টে আওতাভুক্ত করে এই প্রজাতিকে **Endangered** অভিধা দেওয়া হয়েছে।

বাবুই নিধনে জেল

পিরোজপুরের ইন্দুরকানী উপজেলায় বাবুই পাখির বাসা ভাঙা ও ছানা নিধনের অপরাধে তিন জনকে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ইন্দুরকানী থানার ওসি হুমায়ুন কবির জানান, সোমবার দুপুরে ইন্দুরকানীর দক্ষিণ ভবানীপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অশোক কুমার চাকমা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট অশোক কুমার চাকমা বলেন, "শনিবার বিকালেসহ বিভিন্ন সময় বাবুই পাখির বাসা ভাঙা ও ছানা হত্যার অপরাধে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনে দক্ষিণ ভবানীপুরের কৃষক লুৎফর রহমানকে ১৫ দিন, সুনীল বেপারীকে ৭ দিন ও সুনীল মিস্ত্রীকে ৩ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।"

ওসি হুমায়ুন কবির জানান, "বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে তিন জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পরে তাদের জেল হাজতে পাঠানো হয়।"
স্থানীয় ইমরান হোসেন বলেন, কৃষক লুৎফর রহমান তার তিন ভাই মিলে ধান রোপন করেছেন এলাকায়। ওই জমির ধান খেয়ে ফেলতে পারে আশঙ্কায় তারা জমির পাশে থাকা দুটি তাল গাছের 'শতাধিক' বাবুই পাখির বাসা ভেঙে ফেলেছেন।

"বাসাগুলোতে অনেক পাখির ছানা ও ডিম ছিল। রাস্তা, ডোবা, খাল ও ঝোপে ঝাড়ের এসব ছানা ও ডিম ফেলে দিয়েছেন তারা।"

তবে লুৎফর রহমানের বড়ো ভাই ঘোষেরহাট বাজারের খুচরা সার ডিলার হেমায়েত মোল্লা বলেন, বিএডিসির প্রকল্পে ৫০ বিঘারও বেশি জমিতে তারা তিন ভাই বোরো ধান রোপন করেছেন। এর মধ্যে ২৫ ভাগেরও বেশি জমির ধান ইতোমধ্যে বাবুই পাখি নষ্ট করে ফেলেছে। তাই তার ছোটো ভাই লুৎফর রহমান ও দুই জন শ্রমিক কিছু পাখির বাসা ভেঙেছেন বলে তিনি স্বীকার করেন।

নিউজ কার্টেসি: বিডিনিউজ২৪.কম

কুমির

সামিউল ইসলাম

আমাদের অতি পরিচিত একটি প্রাণী কুমির। একই সাথে আমার প্রিয় প্রাণীদের মধ্যে একটি হলো কুমির। সুন্দরবন ঘুরতে গিয়ে অনেক কুমির দেখেছিলাম। যদিও এর আগেও দিনাজপুরেও অনেক কুমির দেখেছি। বাট সুন্দরবন এর কোয়ান্টিটি বেশ ছিল। তা যাহোক, আজ কুমির নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

কুমির একটি সরীসৃপ প্রজাতির প্রাণী। যার বৈজ্ঞানিক নাম crocodylianea। ইউরোপ ছাড়া বিশ্বের প্রায় সকল মহাদেশেই প্রায় ৯৭.৫ কোটি বছর পূর্বে ডায়নোসরের সমকালীন সময়ে কুমিরের উদ্ভব ঘটলেও ডায়নোসরদের বিলুপ্তির পরও এরা বিশ্বের বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩০ টি খামারে কুমির চাষ হয়। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জনসংখ্যার হার বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধির জন্যে কুমিরের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকায় ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র একে বিপদাপন্ন প্রাণীদের তালিকাভুক্ত করে। কুমিরের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকায় ১৯৬০ সাল থেকেই এটি সংরক্ষণের ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের চোখে পড়ে।

কুমির বিষুবীয় অঞ্চলের প্রজাতি। শীতল পরিবেশের প্রতি এরা বেশ সংবেদনশীল। প্রায় সারে ৫ কোটি বছর

আগে ইওসিন যুগে এরা অন্যান্য ক্রোকোডিলিয়ান প্রজাতির থেকে পৃথক হয়ে যায়। সাধারন কুমিরের বাইট ফোর্স ১৬,০০০ নিউটন।

কুমির মূলত আফ্রিকা, এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সুন্দরবনে এক প্রজাতির কুমির পাওয়া যায়। যার বৈজ্ঞানিক নাম *Crocodyuls porosus*। আঞ্চলিক ভাষায় একে লুনা পানির কুমিরও বলা হয়। যার ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ Salt Water Crocodile।

তবে পদ্মা ও যমুনা নদীতে আরেক প্রজাতির কুমির পাওয়া যায়। যাদের বৈজ্ঞানিক নাম *Gavialis Gangeticus.* আঞ্চলিক ভাষায় যাকে ঘরিয়াল বা বাইশাল বলা হয়।
বর্তমানে সারা বিশ্বে কুমিরের ৩ টি গোত্রে ২৫ টি প্রজাতি রয়েছে।
নিচে কয়েকটি প্রজাতির কথা উল্লেখ করা হলো:

Salt water crocodile: বাংলায় যাকে লুনা পানির কুমিরও বলা হয়ে থাকে। লোনা পানির কুমির হচ্ছে পৃথিবীর জীবন্ত সবচেয়ে বড়ো সরীসৃপ প্রাণী। এরা উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত জল ও নদীতে বসবাস করে।

বৈজ্ঞানিক নাম: *Crocodylus porosus.*
জীবনকাল: ৭০ বছর প্রায়
গতিবেগ: ২৪ থেকে ২৯ km/h। ওজন: প্রায় ১০০০ কেজি।
দৈর্ঘ্য: ৪.৩ থেকে ৫.২ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে (অ্যাডাল্ট)।
বাইট ফোর্স: ১৬,৪৬০ নিউটন

American crocodile : আমেরিকান ক্রোকোডাইল।

আমেরিকান কুমির হল এক প্রজাতির কুমির যা নিওট্রপিক্সে পাওয়া যায়। আমেরিকা থেকে চারটি প্রজাতির কুমিরের মধ্যে এটি বেশি বিস্তৃত। দক্ষিণ ফ্লোরিডা এবং মেক্সিকো উপকূলে ব্যাপক পরিমাণে এই প্রজাতির কুমির পাওয়া যায়।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Crocodylus acutus*

গতিবেগ: ৩২ km/h (প্রায়) ওজন: ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি প্রায়
দৈর্ঘ্য: ৪.৯ থেকে ৪.৮ মিটার (অ্যাডাল্ট)

Nile Crocodile : নীল নগর কুমির হলো আফ্রিকার স্বাদুপানির আয়াস্থলগুলির বৃহত কুমির। মোট ২৬টি দেশে এটি রয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীটি ১৯৯৬ সাল থেকে IUCN এর বিপদাপন্ন প্রাণীদের তালিকায় অবস্থান করে নিয়েছে।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Crocodylus niloticus*
জীবনকাল: ৭০ - ১০০ বছর পর্যন্ত
গতিবেগ: ৩০ - ৩৫ km/h। দৈর্ঘ্য: ৪.২ (পুরুষ) ২.৪-৩.৪ (মহিলা)
Indian crocodile/Mugger : মগর। এদেরকে মার্শও বলা হয়। এটি দক্ষিণ ইরান ও ভারতীয় মিঠা জলে বসবাসরত এক প্রজাতির কুমির।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Crocodylus palustris*
ওজন: ৪০-২০০ কেজি
গতিবেগ: ১৬-১৯ km/h.। দৈর্ঘ্য: ৩.২ মিটার (পুরুষ) ২.৪ মিটার(স্ত্রী)

কার্তিক থেকে পৌষ মাসে কুমির ডাঙায় এসে ৩০-৩৫ টি ডিম ছাড়ে। ডিম ছাড়ার জন্য স্ত্রী কুমির মাটিতে ৪০-৪৫ সে.মি. গভীর গর্ত করে। অতঃপর এই গর্তে ডিমগুলো রেখে বালি দিয়ে ঢেকে রেখে দেয়। কুমির দুটি সারি করে ডিম ঢাকে বালি দিয়ে। স্ত্রী কুমিরগন নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করে ডিমগুলো পাহারা দিয়ে থাকে। প্রায় ১১-১৪ সপ্তাহ পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বেড়িয়ে কিচ কিচ করা শুরু করে। শব্দ শুনতে পেয়ে মা কুমির বাসার কাছে এসে বাসা ভেঙে বাচ্চাদের সঙ্গে করে পানিতে নিয়ে যায়। নবজাত কুমিররা প্রথম ৫/৬ মাস খুব দ্রুত বড়ো হয়। সময়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের বড়ো হওয়ার হারও হ্রাস পায়।

কুমির মুলত মেসোজয়িক যুগের জীব। প্রায় ৫ কোটি বছর পূর্বে ইওসিন যুগে এরা অন্যান্য ক্রোকোডিলিয়ান প্রজাতি থেকে আলাদা হয়ে যায়। প্রকৃতিতে এদের খুব কমন দেখা গেলেও বর্তমানে সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে এদের সংখ্যা তত কমে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে এই প্রাণীটি বেশ ভুমিকা রাখে। অপ্রচলিত এই খাদ্য বিক্রি করে অনেক আয় করা হয়। মেক্সিকোতে কুমিরের অনেক খামারও রয়েছে। তবে বর্তমানে বিপন্ন প্রায় এই প্রাণীটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। সবচেয়ে বৃহৎ সরীসৃপ এই প্রাণীটি যেন অচিরেই বিলুপ্ত না হয়ে যায় সেদিকে সকলের নজর দেওয়া উচিত। :)

David Attenborough: A Life On Our Planet

রিভিউয়ার: সমুদ্র জিত সাহা

মানবজাতির বিলুপ্তির জন্য সবচেয়ে সম্ভ্যাব্য কারন কোনটি হতে পারে? এস্টেরয়েড ইমপ্যাক্ট? করোনা বা HIV এর মতো কোনো প্যানডেমিক? নিউক্লিয়ার ওয়ার?

যদি বলি ক্লাইমেট চেঞ্জ অনেকে হয়তো হেসে উঠবেন, অথবা পাত্তাই দেবেন না। যে ঠান্ডা পড়েছে বাইরে! কত মানুষ, রাজনীতিবিদ তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ক্লাইমেট চেঞ্জে বিশ্বাসই করেন না। হোক না বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা ফোন, কম্পিউটার পেয়েছি, স্পেসশিপ পেয়েছি, রোগের ভ্যাক্সিনে কোটি কোটি মানুষ বেচেছে, বিজ্ঞানীদের কে গুনে বলেন!?

অথচ সবচেয়ে সম্ভাব্য ও সবচেয়ে ক্ষতিকর ডিজ্যাস্টারের তালিকা বানালে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সবচেয়ে উপরে। হ্যাঁ, আমাদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর জিনিস এটা। তার নিচে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাক্টেরিয়া, এর আলোচনা অন্যদিন হবে।

আচ্ছা আমি না ডকুমেন্টারি মুভির রিভিউ দিচ্ছিলাম, কী শুরু করলাম! বলছি বলছি।

স্যার ডেভিড এটেনবরো, পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচিত জীববিদদের একজন। ছোটোবেলায় বা বড়োবেলায় টিভিতে এনার ডকুমেন্টারি শো দেখেননি এমন মানুষ খুব কম পাওয়া যাবে। অসাধারন ন্যারেশনের জন্য মূলত ইনি বিখ্যাত, দুনিয়ার কোনায় কোনায় গিয়ে ৭০ এর বেশি বছর ধরে আমাদের দেখিয়েছেন বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রানীকূল। এই মুভিটাকে তিনি বলেছেন “My life’s statement”

৯৪ বছরের দীর্ঘ জীবনে তিনি অনেক কিছুই দেখেছেন যা আমাদের সাধ্যের বাইরে, সেটা তার আফসোস না, তার আফসোস তিনি অনেককিছুই দেখেছেন যা আর দেখা যাবে না কোনোদিনও। যুবককালে যে সুন্দর কোরাল রিফে তিনি সাতার কেটেছেন সেটা মরে গেছে, রঙ বেরঙের কোরাল রিফ এখন দেখে মনে হয় ডিসির মুভির পোস্ট ফাইটিং সিন। সমানে প্রানী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তির কারন ক্লাইমেট চেঞ্জ, ক্লাইমেট চেঞ্জের কারন আমরা, মানুষেরা।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে রচনা সবাই পড়েছি, সবাই জানি এ বিষয়ে, নতুন করে আর বলার কিছু নেই। শুধু মুভিটার একটা কুয়োট নিয়ে বলব,
"We are not saving the planet, we are saving ourselves"

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সব আন্দোলন বা লেখায় দেখা যায় "Save the planet" "Save mother Earth" "Save mother nature" টাইপের কুয়োট। আমরা কী আসলে আমাদের পৃথিবীকে বাচাচ্ছি? আমরা বিলুপ্ত হয়ে গেলে পৃথিবীর কী হবে? তাপমাত্রা খুব বেড়ে গেলে পৃথিবীর কী হবে?
একটা বাস্তব উদাহরন দেখে আসি (মুভিতে দেখানো হয়েছে)। চেরনোবিলের কাহিনী আমরা সবাই জানি, নিউক্লিয়ার প্লান্টে বিস্ফোরনের ফলে তেজস্ক্রিয় হয়ে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে প্রায় ছোটখাটো দেশের সমান এলাকা। মানুষ থাকতে পারে না আর সেখানে, নেক্সট এক-দেড়শো বছরে পারবেও না। তাতে কী! বিল্ডিং গুলোর আনাচে কানাচে গড়ে উঠেছে গাছ, বড় বড় গাছে সবুজে ভরে গেছে চেরনোবিল শহর, সাথে বিচিত্র ধরনের প্রানীর সমাহার। মানুষ নেই, কিন্তু প্রকৃতির নিজের গতি খুঁজে নিতে সমস্যা হয়নি মাত্র ২ দশকেই।
আর তাপমাত্রা? উচ্চ তাপমাত্রা তো পৃথিবীতে কত যুগে যুগে এসেছে, প্রানী বৈচিত্রের কোন অভাব ঘটেনি।
সিম্পল হিসাব, পৃথিবী বিশাল! মানুষ ক্ষুদ্র, তাপমাত্রা এত বাড়ায় পৃথিবীর কিছু যায় আসেনা আসলে, হয়ত প্রচুর প্রানী মরে যাবে মানুষের পাশাপাশি, যত যায় আসে আমাদের! খাদ্যাভাব, উচ্চতাপমাত্রা, ভয়ংকর সব প্রাকৃতিক দূর্যোগ, এসব শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে প্রতিবছরই, আমাদের দেশের মত দেশগুলো ডুবতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।
এসব নিয়ে চটকদার খবর বানানো যায়না। "একশন" টাইপের ভাব নেই, যা হচ্ছে সব ধীরে ধীরে, ব্যাকগ্রাউন্ডে, তাই কোন মিডিয়ারও বিশেষ মাথাব্যাথা নেই এ নিয়ে। যারা এসব থেকে বাচানোর জন্য আপ্রান খেটে যাচ্ছে তাদের প্রতিও বিশেষ মাথাব্যাথা নেই, মাঝেমধ্যে গ্রিটার মত ট্রেন্ড উঠে, আবার নেমে যায়।

সমস্যাগুলো তো বললাম, সমাধান কী? সব এখানে বলে দিলে মুভিটা আছে কী করতে, নিজেই দেখে নিন অসাধারন এই ডকুমেন্টারি মুভিটি IMDB 9, Rotten tomatoes 95% রেটিং, এ বিষয়ে আগ্রহী না এমন মানুষেরও এই মুভিটা পছন্দ হতে বাধ্য। অসাধারন সিনেমাটোগ্রাফির সাথে ডেভিড এটেনবরোর ন্যারেশন! মুভিটি নেটফ্লিক্সে রিলিজ পেয়েছে এ বছর।
সবাইকে রেকোমেন্ড করব, David Attenborough: A Life On Our Planet

জীবনে প্রচুর মুভি দেখেছি আমি, কিন্তু মাত্র ৩ টা মুভি দেখে চোখে পানি এসে গেছে, এটা ৩য় টা।

আর্টিকেল পড়তে পড়তে নিশ্চয়ই আপনি ক্লান্ত! এবার তবে ধাঁধা সমাধান করা যাক,

১. আপনার কাছে ১ গ্লাস দুধ আর ১ গ্লাস পানি আছে। সাথে আছে ১ টা পাত্র। এখন আপনাকে দুধ অথবা পানি ওইটাতে এমনভাবে রাখতে হবে যেন,

- দুধ আর পানি আলাদা করা যায়।
- দুইটার মাঝে কোনো ডিভাইডার রাখা না হয়।

২.
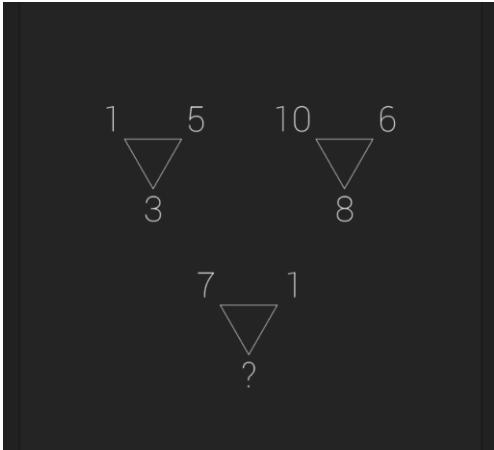
৩.
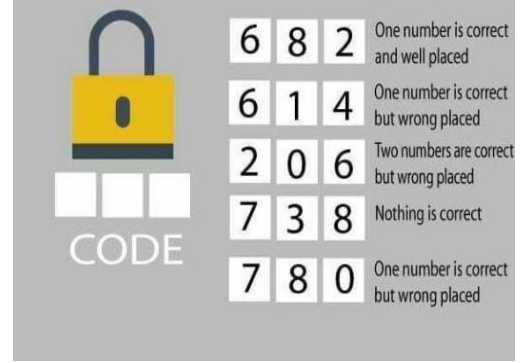
৪. এইখানে শুধু একবার উত্তর বের করলেই হবে না। এইখানে মোট কয় ধরনের প্যাটার্ন কাজ করে সেটাও বের করতে হবে। Bonne journée!

1	2	3	=	8
2	3	4	=	18
3	4	5	=	32
4	5	6	=	50
5	6	7	=	?

বিজয়ীদের নামসহ উত্তর আগামী সংখ্যায় ;)
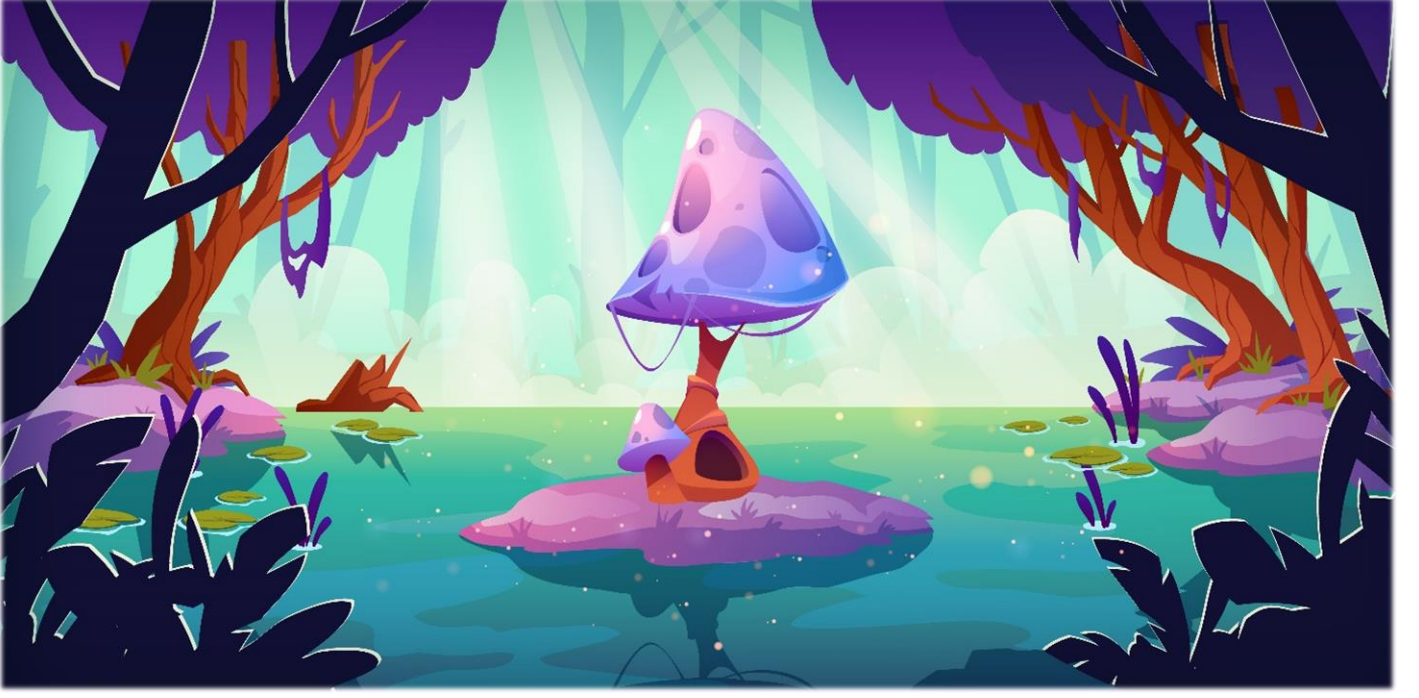
একটি পর্দাশীল, লাজুক মাশরুমের গপ্পো

যারিন রোশনী মৌমিতা

দৃশ্যমান ছত্রাক বলতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে ছাতার মতো অবয়বের ছত্রাকগুলো। কিন্তু এই ছত্রাকগুলোর রয়েছে বিচিত্র দৈহিক গঠন এটা কমই জানি আমরা। কখনো এরা গঠন করে ছাতার মতো অবয়ব, কখনো এরা রঙিন বর্ণে ভেসে ওঠে প্রকৃতিতে, আবার কখনো আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায় অন্ধকারে। এগুলো ছাড়াও বিচিত্র এক ছত্রাক রয়েছে। নিজেকে জালের আবরণে সাজিয়ে নেয়। কৌতুহলী, সুন্দরের পিপাসু চোখে দেখলে মনে হবে ছত্রাকগুলো যেন জালের জামা পরিধান করে আছে, মাথায় বড়োসড় টুপি। অনেকটা পর্দাশীল লাজুক মেয়ের মতো নিজেদের সাজিয়ে নেয়। এদেরকে এজন্য বলা হয় **Veiled Lady** রং বেরঙের জালিতে সাজিয়ে ঢেকে নেয় যেন নিজেদেরকে।

মজার ব্যাপার হলো, জালি মাশরুম আমাদের দেশেও পাওয়া যায় কিন্তু। এদের সংখ্যা আহামরি রকমের বেশি নয়। তাই অনেকে নাও দেখে থাকতে পারেন। ছোটোবেলায় গ্রামীন পরিবেশে যারা বেড়ে ওঠেছেন তারা নিশ্চয়ই দেখে থাকতে পারেন এই বিচিত্র জালি মাশরুমগুলো। ছোটোবেলায় খেলতে গিয়ে এগুলোকে

মাটির সাথে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলাম সেই দৃশ্য এখনো চোখে ভেসে বেড়ায়! বাড়ির উঠোনে রান্নাঘর ঘেঁসে স্যাতস্যাতে জায়গায় হতো জালি মাশরুমগুলো।

জালি মাশরুমের বেশ কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে। এরমধ্যে একটি প্রজাতি নিয়েই বলা যাক!

Phallus indusiatus জালিমাশরুমের একটি প্রজাতি। একে আরো বিচিত্র কিছু নামেও ডাকা হয় যেমন: বাঁশের মাশরুম, বাঁশের পিঠ, দুর্গন্ধযুক্ত মাশরুম, পর্দার মহিলা প্রভৃতি।

Scientific classification---
Kingdom:Fungi
Division:Basidiomycota
Class:Agaricomycetes
Order:Phallales
Family:Phallaceae
Genus:Phallus
Species:P. indusiatus

এই গেল পর্দাশীল মাশরুমের পরিচয়। এই মাশরুমের কিন্তু উপকারিতাও রয়েছে কিছু! এই মাশরুমগুলো খাদ্য হিসবে খাওয়া যায়। বাণিজ্যিক ভাবেও উৎপাদন করা হয় এদের এজন্য। প্রোটিন, কার্বহাইড্রেটে ভরপুর এই মাশরুমকে স্যুপ হিসেবে খাওয়া হয়।

পথে ঘাটে এদের দেখা মিললে আমার মতো পিষে না ফেলে এদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন।
আজকে এই পর্যন্তই পর্দাশীল মাশরুমের গল্প।
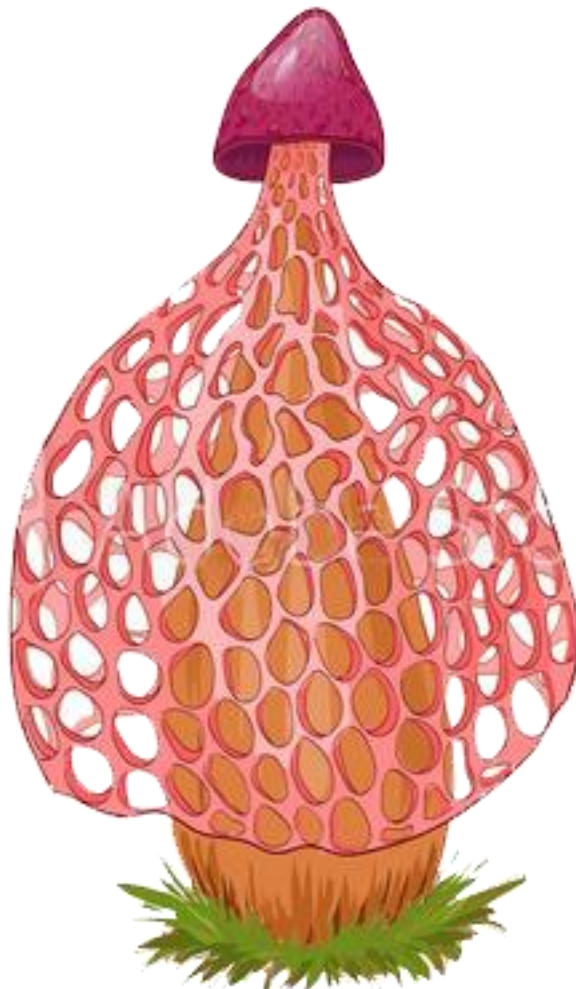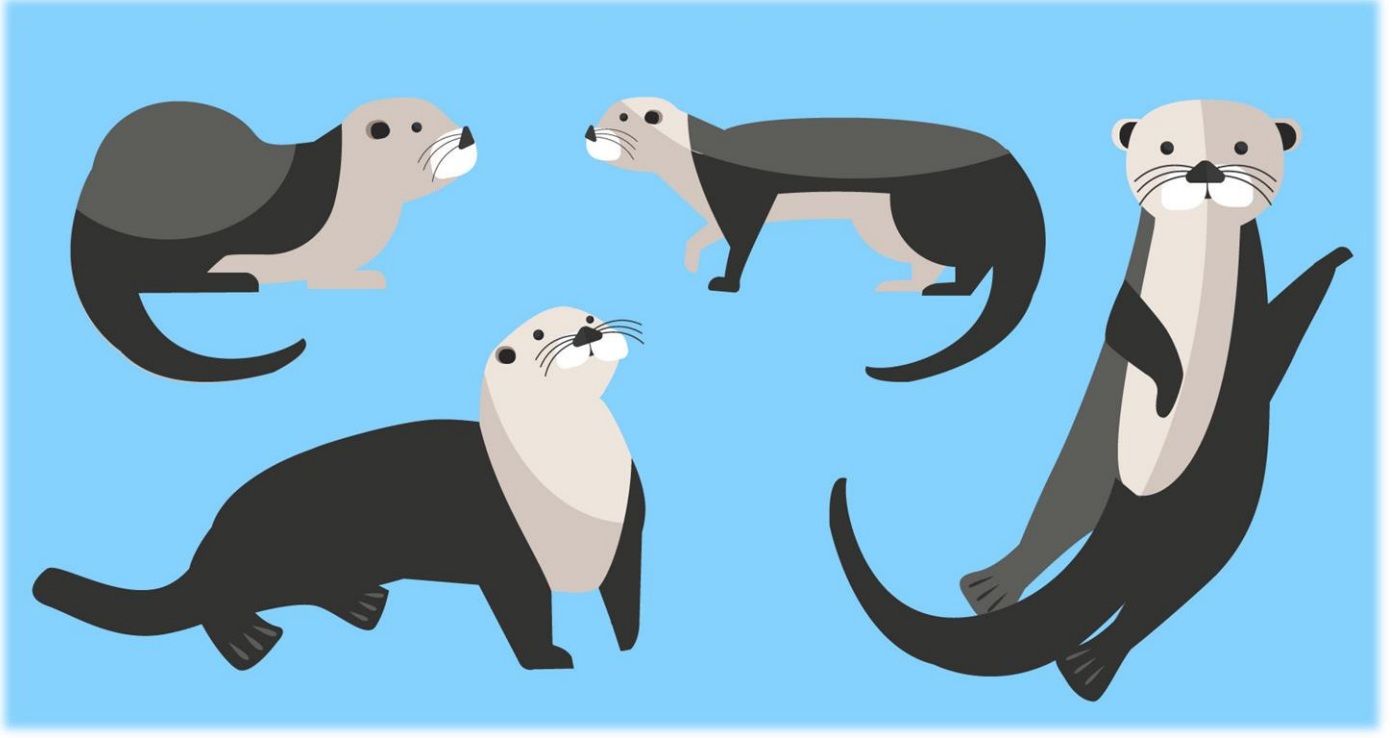
রোহান হোসেন

“আয় রে আয় টিয়ে নায়ে ভরা দিয়ে
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তাই না দেখে ভোঁদড় নাচে
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা”।

এ ছড়া ছোটোবেলায় কে না পড়েনি! হ্যাঁ, আমারও ছোটোবেলায় ভোদড়ের সাথে পরিচয় এ ছড়ার মাধ্যমে। সরাসরি প্রাকৃতিক পরিবেশে ভোঁদড় আমি দেখিনি। তবে রাজশাহী চিড়িয়াখানায় প্রথম ভোঁদড় দেখেছিলাম ২০১৩ সালে। জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে ভোঁদড় এক ধরনের বিশেষ প্রাণী। অনেকে এটিকে উদবিড়ালও বলে থাকে। ভোঁদড় বলতে Mustiledae গোত্রের Lutrinae উপগোত্রের প্রানীগুলোকে বোঝায়। এ উপগোত্রের মধ্যে নেউল বা বেজি, ব্যাজার জাতীয় প্রাণীগুলোও রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিন্যাস

Kingdom: Animalia

Phylum: Chordata

Class: Mammalia

Order: Carnivora

Family: Mustelidae

Sub-family:Lutrinae

দৈহিক গঠন:

আকারঃ ২ - ৬ ফুট লম্বা।

ওজনঃ ৫- ২৫ কেজি।

শ্রেণিবিভাগ:

ভোঁদড় দু'রকমের হতে পারে:

১. নখরযুক্ত ভোঁদড় বা সাধারণ ভাষায় ভোঁদড়

শরীর কালচে বাদামি পানি প্রতিরোধক ঘন লোমে ঢাকা। মাথা ও শরীরের মাপ ৬৫-৭৫ সেমি। গলার দিকে সাদা। লেজ ৪০-৪৫ সেমি. চ্যাপ্টা ফলে সাতারে বেশ সুবিধা হয়। কান ছোটো। পায়ের পাতা হাঁসের পায়ের মতো চ্যাপ্টা। ভোঁদড় বা উদ-বিড়াল ওজনে ৭-১১ কেজি হয়।

২. নখহীন ভোঁদড়

নখহীন ভোঁদড়কে (Clawless otter) (বৈজ্ঞানিক নাম *Amblonyx cinereus*) 'নখহীন' ডাকা হলেও এদের আসলে নখ রয়েছে, তবে বাইরের দিকে একটু কম বেরিয়ে থাকে। এদের দেহের রং কালচে বাদামি, দেহের নিচের অংশ ময়লা হলদে। ঠোঁট ও গলার দিককার রং প্রায় সাদা। নখহীন ভোঁদড়ের ওজন হয় ৩ থেকে ৫ কেজি।

বৈশিষ্ট্য:

ভোঁদড় লিপ্তঅঙ্গুলী পা বিশিষ্ট প্রাণী। লিপ্তঅঙ্গুলী পা এবং লেজ এদেরকে শক্তিশালী সাঁতারু বানিয়েছে। এদের লেজ রাডারের মত কাজ করে।

এরা সাঁতার কাটার সময় এদের নাক ও কান বন্ধ রাখে যেন পানি প্রবেশ করতে না পারে। এরা চমৎকার সাঁতারু। এক ডুবে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এরা যেতে পারে। এদের গায়ে অসংখ্য পানিরোধী পশম রয়েছে যা তাদের দেহকে গরম রাখতে সাহায্য করে। কেননা অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর মতো এদের দেহে চর্বির আস্তরণ নেই। ভোঁদড়ের নাকের ডগায় গোঁফ রয়েছে। এ গোঁফগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল। এ গোঁফগুলোই ভোঁদড়কে ঘোলা বা স্বচ্ছ পানিতে শিকারের অবস্থান সম্পর্কে জানান দেয়। নখহীন ভোঁদড়ের তালু খুব স্পর্শকাতর এ কারণে কাদায় থাকা কাঁকড়া বা শামুক খুব সহজেই ধরতে পারে। শক্ত সূচালো দাঁত ও শক্তিশালী চোয়াল এদের খাদ্য চাবাতে সাহায্য করে। ভোঁদড় বেশ বুদ্ধিমান এবং বন্ধুবৎসল প্রাণী। এরা সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে পছন্দ করে।

খাদ্য:

ভোঁদড়ের প্রধান খাদ্য মূলত মাছ। তবে ভোঁদড় কাঁকড়া, পানিতে থাকা ব্যাং ইত্যাদি খেয়ে থাকে। নখহীন ভোঁদড়দের সবচেয়ে পছন্দের খাবার হলো চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি শক্তখোলসের প্রাণী।

আবাস ও বিস্তৃতি:

ভোঁদড় বেশিরভাগই মিঠাপানির বাসিন্দা। এরা জলাশয়ের কিনারে, গর্তে বাস করে। সাতটি বর্গে প্রায় তেরোটি প্রজাতির ভোঁদড় অস্ট্রেলিয়া ছাড়া মোটামুটি গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে আছে।

ভোঁদড় দিয়ে হরেক রকম কাজ কারবারঃ

(ক) মাছ শিকার: প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ভোঁদড় দিয়ে মাছ শিকার করিয়ে আসছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষেরা এখনো ভোঁদড় দিয়ে মাছ শিকার করিয়ে থাকে। ভোঁদড়দের সাহায্যেই জেলেরা ৬২-৬৫ কেজি ওজনের মাছ যেমন ধরেন তেমনি গলদা চিংড়ি এবং কাঁকড়াও ধরে অনেকে।

(খ) চিত্রশিল্পী ভোঁদড়: দুবাই অ্যাকুয়ারিয়াম এবং আন্ডারওয়াটার চিড়িয়াখানার দুইটি ভোঁদড়কে ছবি আঁকা শেখানোর পরিকল্পনা করে কর্তৃপক্ষ। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তারা এতে সফল হয় এবং ভোঁদড় দুইটি ছবি এঁকে সবাইকে অবাক করে দেয়।

ভোঁদড় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত:

বিখ্যাত ওয়াল্ডলাইফ বিশেষজ্ঞ কোলেন ইয়ং দীর্ঘদিন ভোঁদড় নিয়ে কাজ করছেন। তার মতে ভোঁদড়রা এখন হুমকির মুখে।

বিবিসিতে ডক্টর ক্রিস্টিয়ান রুটজ জানিয়েছেন জিনগত বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা ও বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে একটি সামুদ্রিক প্রাণী কী ধরণের আচরণ করে তা পর্যবেক্ষণের জন্য ভোঁদড় একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অবশেষে বলতে চাই, আগে যেমন মা তার খোকার নাচন দেখানোর জন্য খুব সহজেই ভোঁদড়কে ডাকতে পারতেন এখন আমাদের দেশে ভোঁদড় সেরকম নেই। প্রায় বিলুপ্তির পথে। সুন্দরবন অঞ্চলে যা-ই দেখা যায় তাও আবার স্থানীয় জেলেদের শিকারে পরিণত হয়। সরকারের এ ব্যাপারে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং আমাদেরও বাংলাদেশের এসব বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ঝিঁঝিঁ

আশরাফুল ইসলাম মাহি

১.

ফিটফাট দুই ইঞ্চির শরীর,
খানিকটা চ্যাপটা ফুটবলের মতো মাথা,
লম্বা চিকন অ্যান্টেনা,
সোজাসাপটা পিঠ,
পেছনের পায়ে ব্যাঙের মতো মোটা থাই,
শক্ত পাখনা,
পাখনার প্রটেকশনের জন্য চামড়ার জ্যাকেট,
হাঁটুতে কান...

আজব এক প্রাণী! কোনো এলিয়েন?

এলিয়েনের অস্তিত্ব পাই কল্পকাহিনীতে, বাস্তবে দেখা পাওয়া যায়নি। এই প্রাণীটাকেও খুব কম মানুষই দেখতে পায়। শুনতে পায় শুধু তার আওয়াজ।
ক্যাট...ক্যাট...ক্যাট...

২.

কোনো এক গরমের দিনে সন্ধ্যায় এই বিখ্যাত ডাকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বাড়ির পাশের আগাছার ঝোপ থেকে শুনতে পাবেন এই অপূর্ব শব্দের ছড়াছড়ি। কিন্তু ঝোপের কাছে যাবেন, তো শব্দের উৎস খুঁজেই

পাবেন না! এই সময় পেছন থেকে আসবে একই শব্দ— ক্যাট...ক্যাট...ক্যাট...

আবারও টের পাবেন না কে করছে এটা। যতই শব্দের উৎসের কাছাকাছি যান না কেন, আপনি কিচ্ছুটি পাবেন না।

এই পোকাটা মুখে শব্দ করে না। পেটের নিচের টিম্বাল মেমব্রেন এই শব্দের উৎস। মাটির সাথে একরঙা শরীরের জন্য আপনি ঝিঁঝিকে খুঁজে পাবেন না সহজে।

গ্রামের মাটির মেঝেওয়ালা ঘরগুলোতে হাল্কা মেটে থেকে গাঢ় রঙের ঝিঁঝিও থাকে, মেঝের সাথে এক্কেবারে মিশে।

৩.

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এই ঝিঁঝি পোকা দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশগুলোতে মানে ৫৫ ডিগ্রি অক্ষাংশের ওপারে— উত্তর আর দক্ষিণমেরুর দিকে এদের দেখা যায় না।

একেক জায়গায় একেকরকমের ঝিঁঝি, পরিবেশভেদে রঙও ভিন্ন ভিন্ন হয়। পুরো পৃথিবীতে ৯০০'র বেশি প্রজাতির ঝিঁঝি বসবাস করে।

অবাক করা ব্যাপার হলো, মালেশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরেই ৮৮ প্রজাতির ঝিঁঝির ডাক শোনা গেছে। ঝিঁঝিকে শনাক্ত করতে এটার করা শব্দের পার্থক্য ধরলেই চলে। কিন্তু সব প্রজাতির ঝিঁঝিই কিন্তু শব্দ করে না।

অনেক প্রজাতির ঝিঁঝির আওয়াজ নেই, চুপচাপ থাকাতে এদের ধরা বেজায় কঠিন। এদেরকে শিকারিদের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করে এদের গায়ের রং।

ঝিঁঝির ডাক যা শোনা যায়, সেটা হচ্ছে পুরুষ ঝিঁঝির। প্রজননের সময় এরা এভাবে ডাকে, স্ত্রী ঝিঁঝিদের আকৃষ্ট করার জন্য। স্ত্রী ঝিঁঝির সাথে মেটিং সম্পন্নকরণের পর এরা ভিন্ন সুরে কিছুক্ষণ গান গায়, তারপর হুংকার শুরু করে! স্ত্রী ঝিঁঝি ডিম না পাড়া পর্যন্ত যাতে অন্য পুরুষ ঝিঁঝির ডাকে কাছে না যেতে পারে, সেজন্য এই পুরুষ ঝিঁঝি ভয়ংকর সুরে খুব জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকে। যাতে করে আশেপাশের পুরুষ ঝিঁঝিরা পালিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঝিঁঝিরা মারামারিও লাগায়! পুরুষ ঝিঁঝি তার সঙ্গীসহ থাকার সময় অন্য কোনো পুরুষ ঝিঁঝির আগমন সহ্য করতে পারে না। মারামারি লাগিয়ে ফেলে! অ্যান্টেনা দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করাই এই যুদ্ধের মূল নিয়ম। মজার এবং কিছুটা হাস্যকর ব্যাপার হলো, যুদ্ধে বিজয়ী পোকা বিজয়ী সুরে অনেক্ষণ গান করে! আর যে হেরে যায়, সে মুখ চুন করে চলে যায়!

৪.

ঝিঁঝি পোকার ডাকের মধ্যে কত্ত আজব ব্যাপার লুকিয়ে থাকে, সেটা হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এখনও আসলটাই বলা হয়নি।

ঝিঁঝি পোকার ডাকের সাথে আশেপাশের পরিবেশের তাপমাত্রার খুব নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রায় সব প্রজাতির ঝিঁঝি 62 বারের মতো 'ক্যাট...ক্যাট...' করে যখন পরিবেশের তাপমাত্রা 55 ডিগ্রি ফারেনহাইট হয় বা 13 ডিগ্রি সেলসিয়াস! (কাছাকাছি)

এটাকে বলে ডলবারের ল' !

ডলবারের ল' থেকে মোটামুটিভাবে ডাকের সংখ্যা গুনেই পরিবেশের তাপমাত্রা বলে দেওয়া যায়।

আমেরিকান ঝিঁঝি, গাছে যেগুলো থাকে, সেগুলো 14 সেকেন্ডে যতবার ডাকে তার সাথে 40 যোগ করলেই পরিবেশের মোটামুটি তাপমাত্রা ফারেনহাইট স্কেলে পাওয়া যায়!

৫.

প্রজননের সময় বাদে অন্যান্য সময় এরা লুকিয়ে থাকে। সাধারণত এদের স্থায়ী বাসস্থান থাকে না। কিছু প্রজাতি আছে মাটিতে বা পঁচা গাছের গুড়ির ভেতরে লুকিয়ে থাকে। হাল্কা গর্ত খুঁড়তেও জানে এই পিচ্চি গায়ক! আবার কিছু প্রজাতি গাছের উঁচু ডালে পাতার সাথে মিশে লুকিয়ে থাকে। ফসলের খেতেও থাকে, এগুলো সংখ্যায় বেড়ে গেলে জমির ফসল নষ্ট করে খুব। ঝিঁঝি আর ঘাসফড়িঙের খাদ্যাভ্যাস প্রায় একই। ঝিঁঝি ফুল, পাতা, শস্যদানা খায়।

এদের চোখের ধরন কমপ্লেক্স, মাছির চোখের মতো।

একেবারে ৩৬০ ডিগ্রি দেখতে পায়! শ্রবণেন্দ্রিয় থাকে হাঁটুর নিচে, খুব তুখোড় হয় এদের শ্রবণশক্তি।

৬.

শুনলে ঘেন্না জাগতে পারে, তাই এই অংশ কেউ না শুনে পড়লে ভালো হয়! অর্থাৎ মনের কান বন্ধ করে পড়ুন! বিশ্বের কিছু দেশে (বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোতে) এই ঝিঁঝিকে খাবার হিসেবে ভেজে খাওয়া হয়। অনেকের কাছেই ঝিঁঝি খুব সুস্বাদু খেতে। ঝিঁঝির পুষ্টিমানও নাকি অনেক!

আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনেকে শখ করে ঝিঁঝি পোষে! খাঁচায় ভরে ঝিঁঝি পোষা কেমন হবে একটু কল্পনা করুন তো!
পুষবেন নাকি দু-চারটে ঝিঁঝি?

ঝিঁঝির শ্রেণিবিন্যাস:

Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Insecta
Order: Orthoptera
Suborder: Ensifera
Infraorder: Gryllidea
Superfamily: Grylloidea Laicharting, 1781
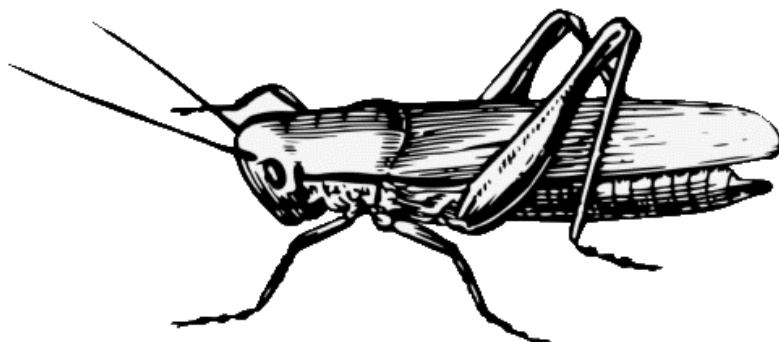
বনরুই

কাইফ রহমান

ভূমিকা:

নাম দেখে মনে হতে পারে এটি এক বিশেষ ধরনের রুই মাছ যা বনে পাওয়া যায়। কিন্তু আসলে এটি কোনো মাছ নয়। এই প্রাণীটি ডাঙায় থাকে। সারা পৃথিবীতে এই প্রাণীটির ৮ টি প্রজাতি রয়েছে যার তিনটি প্রজাতি এশিয়ায় রয়েছে। আর এই তিনটি প্রজাতিই বাংলাদেশে পাওয়া গিয়েছে। এরা হলো ইন্ডিয়ান (*Manis crassicaudata*), চীনা (*Manis pentadactyla*) এবং মালয়ী (*Manis javanica*) বনরুই। সাধারণত বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় এদের দেখা যায়। আর ভূমিকায় না গিয়ে চলুন খুব দ্রুত এই প্রাণীটি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

দৈহিক বিবরণ: এদের শরীর প্রায় মাটির সাথে লেগে থাকে। শরীরের রং নানা রকম হতে পারে। যেমন: হালকা বাদামি, হলুদাভ-বাদামি, জলপাই রং, গাঢ় বাদামী ইত্যাদি। প্রাপ্তবয়স্ক বনরুইয়ের শরীরের দৈর্ঘ্য ৩০-১০০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। ভর প্রায় ৩৩ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

ত্বক শক্ত কেরাটিন দ্বারা আবৃত যা দেখতে অনেকটা বড়ো বড়ো ত্রিকোণ আঁশের মতো। (আমাদের নখও কিন্তু কেরাটিন দিয়ে তৈরি)। এই ত্রিকোণ আঁশের সাথে রুই মাছের মিল রয়েছে বলে একে বনরুই বলা হয়। এরাই একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যাদের ত্বক কেরাটিন দিয়ে আবৃত। এই কেরাটিন দ্বারা আবৃত ত্বককে অনেকটা বর্ম দিয়ে আবৃত মানুষের সাথে তুলনা করা যায়। এই শক্ত আবরণী এদেরকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও শিকারিদের হাত থেকেও রক্ষা করে থাকে। বিপদ বুঝলে সামনের দুই পায়ের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে লেজ দিয়ে পুরো দেহ গুটিয়ে নেয় যা দেখতে বলের মতো হয়। ফলে এরা না চাইলে মানুষ ছাড়া অন্য কেউ এদের স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে পারে না।

তবে এদের শরীরের নিচের অংশে অর্থাৎ বুকে-পেটে কেরাটিন না থেকে সামান্য লোম থাকে।
এদের দাঁত নেই। নাক সরু ও চোখা হয়।

এদের জিহবা আঠালো হবার পাশাপাশি অনেক লম্বা হয়। এদের জিহ্বা যখন সম্পূর্ণ প্রসারিত করা হয় তখন এদের জিহ্বা শরীরের চেয়েও লম্বা দেখায়। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের মতো এদের জিহবা মুখগহ্বরের সাথে সংযুক্ত নয়। বরং পাঁজরের নিচের অংশের সাথে সংযুক্ত। যখন এদের জিহবা কোনো কাজে লাগানো হয় না, তখন এটি বুকের অভ্যন্তরে থাকা ফাঁকা জায়গায় অবস্থান করে।
বনরুইয়ের চোখ ও কান সরু হয়।

এদের পা শক্ত এবং মাটি খোঁড়ার জন্য খুবই ভালো। প্রতিটি পায়ে পাঁচটি আঙুল রয়েছে। সামনের দুই পায়ের তিনটি নখ অনেক লম্বা এবং বাঁকানো হয় যা পিঁপড়া-উইপোকার বসবাসের জায়গা ধ্বংস করতে এবং মাটি খুঁড়ে নিজেদের বাসা বাঁধতে ব্যবহৃত হয়। এরা নখ গুটিয়ে সামনের পায়ের সাহায্যে শরীর টেনে টেনে হাঁটতে পারে। তবে পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে লেজের সাহায্যে এরা দৌড়াতে পারে।

খাদ্যাভাস: এদের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে থাকে কিন্তু ঘ্রাণশক্তি প্রখর। তাই এরা ঘ্রাণশক্তির উপর বেশি নির্ভর করে শিকার করার জন্য।
বনরুইরা পতঙ্গভুক। বাংলাদেশে এরা পিপীলিকাভুক নামে পরিচিত। কারণ-এদের প্রধান খাদ্যই পিঁপড়া এবং উইপোকা। এদের বড়ো ও মজবুত নখ অনায়াসেই কাঠের শক্ত গুঁড়ি ফেড়ে ফেলে এবং লম্বা ও আঠালো জিভ খুব দ্রুত পোকামাকড় ধরে ফেলে। চোখের পাতা পুরু হওয়ায় পিপড়াদের কামড় থেকে এরা বেঁচে যায়।

আচরণ: বনরুইরা অধিকাংশ নিশাচর প্রাণী। বেশিরভাগ প্রজাতি দিনের অধিকাংশ সময়ে ঘুমিয়ে অথবা বলের মতো গুটিয়ে থেকে কাটিয়ে দেয়। গেছো প্রজাতির বনরুইরা গাছের মধ্যে থাকা গর্তে বাস করে। গাছে চড়তে এরা ওস্তাদ। এছাড়া অন্যান্য প্রজাতির বনরুইরা মাটির প্রায় ৩.৫ মিটার গভীরে সুরঙ্গ করে বসবাস করে থাকে। এরা ভালো সাঁতারও কাটতে পারে।

প্রজনন: ঠিক কোন সময়ে বনরুইরা সহবাস করে তা নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায়নি। তবে সাধারণত গ্রীষ্মকাল এবং শরৎকালে তারা সহবাস করে থাকে। সিনেমায় দেখা যায় হিরোইনকে হিরো খুঁজতে থাকে। কিন্তু বনরুইদের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। এক্ষেত্রে পুরুষ বনরুইরা তাদের মূত্র এবং মল দ্বারা নিজেদের অবস্থান জানান দেয় যাতে করে স্ত্রী বনরুইরা তাদের খুঁজতে পারে।

সিনেমায় যেমন অনেক সময় দেখা যায় এক হিরোইনের জন্য দুই হিরোর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়, ঠিক তেমনি বনরুইয়ের ক্ষেত্রেও এমন প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে পুরুষ বনরুই লেজ দিয়ে যুদ্ধ করে থাকে। এদের গর্ভধারণের সময়কাল ৭০-১৪০ দিন। বছরে ১-৩ টি সন্তান জন্ম দিতে পারে। জন্মের সময় এদের ভর ৮০-৪৫০ গ্রাম হয়ে থাকে এবং শরীরের গড় দৈর্ঘ্য ১৫০ মিলিমিটার হয়ে থাকে। জন্মের সময় এদের আঁশ নরম এবং সাদা থাকে। তবে কিছুদিন পর আঁশ শক্ত হয়ে যায় এবং রং প্রাপ্তবয়স্ক বনরুইদের মতো হয়ে যায়। যখন বনরুইরা বাচ্চা থাকে তখন তারা মায়ের সাথে থাকে। মা বনরুই বাচ্চাকে লালন-পালন করে। কোনো বিপদ দেখলেই মা বনরুই তার বাচ্চাকে ঢেকে ফেলে। মা যখন কোথাও যায় তখন তার বাচ্চাকে নিজের পেছনে বহন করে থাকে। সাধারনত বাচ্চারা মায়ের লেজ ধরে বাইরে বের হয়ে থাকে। যখন বাচ্চা বনরুইয়ের বয়স তিন মাস হয়, তখন ধীরে ধীরে কীটপতঙ্গ খেতে শুরু করে। দুই বছর বয়সে এরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়।

উপসংহার:

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাণীটি বিপন্ন। এর পিছনে কিছু লোভী-নির্দয় মানুষেরা দায়ী। তারা এই প্রাণীটিকে অবৈধভাবে পাচার করে যাচ্ছে এর মাংস, চামড়া ও আঁশের জন্য। চাইনিজদের কাছে বনরুইয়ের মাংস খুবই প্রিয়। এছাড়াও এদের আঁশ থেকে চাইনিজ মেডিসিন তৈরি করা হয়। বলা হয়ে থাকে, এসব মেডিসিন ক্যান্সার, বন্ধ্যত্ব, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্ত করে, যা ভিত্তিহীন দাবি। শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা বিশ্বে পাচার করা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে বনরুই শীর্ষে রয়েছে। তাই এই প্রাণীটির অবৈধ পাচার বন্ধ করার জন্য সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে একসময় এই প্রাণীটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে যা আমরা কখনই চাই না।

শ্রেণীবিন্যাস অনেকের কাছে কাঠখোট্টা মনে হয়। তাই সবার শেষে এটা সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

Kingdom:Animalia

Phylum:Chordata

Class:Mammalia

Clade:Ferae

Clade:Pholidotamorpha

Order:Pholidota

Genus:Manis

বিন্টুরং

অপরাজিতা বসু

বিন্টুরং কে অনেকসময় **Bear Cat** বা ভালুক বিড়াল ও বলা হয়। মুখটা বিড়ালের মতো আর শরীরটা অনেকটা ভাল্লুকের মতো বলেই এর এই নাম। তবে ভালুক বা বিড়াল এর কোনোটার সাথেই এর বৈশিষ্ট্যের তেমন কোনো মিল নেই। যে ভাষা থেক **বিন্টুরং** নামটি এসেছে ধারণা করা হয় এটি বর্তমানে বিলুপ্ত। এটি মাঝারি আকৃতির বিলুপ্তপ্রায় একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী যার বাস মূলত এশিয়ার রেইনফরেস্টে। এশিয়ান দেশ যেমন বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতিতে এই প্রাণীর বসবাস।

বিন্টুরং লম্বায় লেজ সহ প্রায় ৫ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। গড় ওজন প্রায় ২৬.৯ কেজি। স্ত্রী বিন্টুরংরা পুরুষের চেয়ে ২০% আকারে বড়ো এবং স্ত্রীজাতীয় প্রাণীরাই এই প্রজাতিতে ডমিনেন্ট। এর শরীরে ঘন, কালো লোম রয়েছে এবং মুখে লম্বাটে ও সাদা রঙের লোম আছে।

এটি বৃক্ষবাসী এবং নিশাচর প্রাণী। বিন্টুরং দিনের বেশির ভাগ সময়ই গাছে রোদের আলোতে ঘুমিয়ে থাকতে পছন্দ করে; যদিও এটি গাছ থেকে গাছে এর আকৃতির জন্য লাফাতে পারে না তবুও চড়তে পারে ভালোভাবেই। এর খাদ্যাভ্যাস বলতে গেলে বিভিন্ন ছোটো স্তন্যপায়ী, ফল, ডিম প্রভৃতি; যার মধ্যে **Strangler Fig** ধরনের ডুমুর এর খুবই প্রিয়। আর এই ফল এর বীজ এই প্রাণীটির মাধ্যমেই পুরো বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ও এর অঙ্কুরোদগম এর সুযোগ হয়। আর

এভাবেই প্রাণীটি ইকোলজিতেও ইতিবাচক একটা প্রভাব ফেলছে; যার প্রভাবে ওই প্রজাতির ডুমুরের বংশবিস্তারে সাহায্য হচ্ছে।

বিন্টুরং এর শ্রেণিবিন্যাস:

Kingdom:Animalia

Phylum: Chordata

Class: Mammalia

Order: Carnivora

Suborder: Feliformia

Family: Viverridae

Subfamily: Paradoxurinae

Genus: Arctictis

Species: Arctictis binturong

বিন্টুরংএর একটা বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হলো এর ৬৬-৬৯ সে. মি পুরু, কালো লেজ যাকে এটি অনেকসময় হাত হিসেবেও ব্যবহার করে থাকে। অনেকসময় এটি লেজের সাহায্যে গাছেও ঝুলে থাকে! এর আরেকটি অবাক করা বৈশিষ্ট্য হলো এর লেজের নিচের গ্রন্থি থেকে একধরনের পপকর্ন এর মতো গন্ধ বের হয়। এই গন্ধের মাধ্যমে অনেকসময় তার নিজ প্রজাতির কাছে তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে। অনেকসময় বলা হয় এটি মেটিং এ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে মাঝেমধ্যেই একে দেখা যায়।

নির্বিচারে বন ধ্বংস এই দুষ্প্রাপ্য প্রাণীটির বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বনভূমির প্রয়োজনীয় যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণই হলো এই প্রজাতি টিকিয়ে রাখার একমাত্র পথ।

Devil's Finger

শুভ সালাউদ্দিন

পপুলার কালচারে ডেভিলকে সাধারণত লাল হিসেবে দেখানো হয় কারণ লাল দেখলে বিপদ সংকেত টাইপের মনে হয় সেজন্য। বিখ্যাত Tom and Jerry কার্টুনেও দেখবেন টমকে দুষ্টু বুদ্ধি দেওয়ার সময় লাল রঙের পিচ্চি টম হাজির হয়। যেহেতু ফাংগাসের নাম দেওয়া হয়েছে ডেভিলস ফিঙ্গার তাহলে ধরে নিতে পারেন লাল রঙের একটা রিলেশন আছে।

ডেভিলস ফিঙ্গার দেখতে অনেকটা জবা ফুলের মতো টকটকে লাল আর অক্টোপাসের মতো আকৃতির। এইরকম আকৃতির কারণে এর আরেক নাম Octopus Stinkhorn. নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় মেইন বাসস্থান হলেও ইউরোপ, আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানসহ বলতে গেলে পুরোবিশ্বেই এদের উপস্থিতি রয়েছে।

১৮৬০ সালের দিকে এই ফাঙ্গাসের শ্রেণিবিন্যাস করার সময় ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মাইলস জোসেফ এর বৈজ্ঞানিক নাম দেন *Lysurus archeri* কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৮০ সালের বিজ্ঞানী ডোনাল্ড ম্যালকম বুঝতে পারেন এটি আসলে Clathraceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তখন এর বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয় *Clathrus archeri*

শ্রেণিবিন্যাস:
Kindom: Fungi
Division: Basidiomycota
Class: Agaricomycetes

Order: Phallales

Family: Phallaceae

Genus: Clathrus

এটি বিষাক্ত কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না তবে সাসপেক্ট লিস্টে রাখা হয়েছে। যেহেতু পঁচা মাংসের মতো বিকট দুর্গন্ধ বহন করে সেজন্য খাওয়ার ট্রাই করা একদমই বাজে বুদ্ধি। তবে এই গন্ধ থাকার সুবিধা আছে। এতে করে কিছু কিছু পতঙ্গ এর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এর উপর এসে বসে। বসলে পতঙ্গের ডানা এবং পায়ে স্পোর লেগে যায়। এভাবে এর পরাগায়ন ঘটে।

কিছু সপ্তাহ আগে পরের হিসাব বাদ দিলে মোটামুটি জুন থেকে সেপ্টেম্বর দিকে এরা বংশবৃদ্ধি করে। প্রথমে ডিম্বাকৃতির অংশ থাকে যেটা পানি চুষে নিতে থাকে । এভাবে স্ট্রাকচার ফেটে গিয়ে ৪ থেকে ৭ টা অক্টোপাসের মতো প্রসারিত হাত বের হয় এবং আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মধ্যে থাকে ডার্ক জলপাই কালারের গ্লিবা। যেখান থেকে পঁচা মাংসের গন্ধ বের হয়।
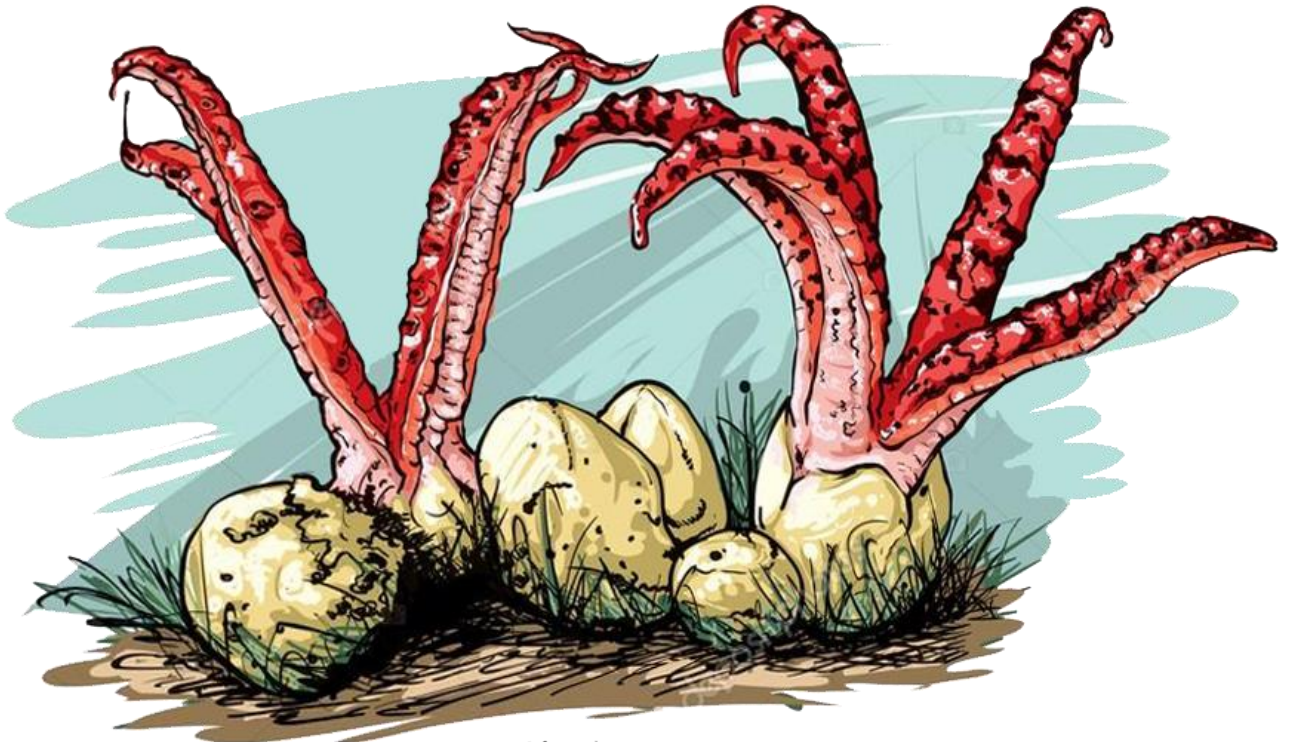
Clathrus archeri

অল এবাউট ডেথ

মনিফ শাহ চৌধুরী

বায়োলজি। স্টাডি অফ লাইফ। তাহলে মৃত্যু নিয়ে গবেষণা কী? Thanatology? Thanatos গ্রিক শব্দ যার অর্থ মৃত্যু।

এই আর্টিকেলটা আমার অন্য আর্টিকেল থেকে আলাদা। এখানে কোনো গল্প নেই, স্রেফ মৃত্যু আর মৃত্যু নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলাপচারিতা। কী কী বিষয়ে আলোচনা করবো সেটাও শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি।

আউটলাইন-

১. মৃত্যুর সংজ্ঞা

২. মৃত্যুর ধরন

৩. মৃত্যুমুখের অভিজ্ঞতা

৪. মৃত্যুর পরে

৫. উন্নত দাফন ব্যবস্থা (নামটা জুতসই হলো না)

৬. মৃত্যু থেকে ফেরা

বোঝা গেল তাহলে? শুরু করা যাক।

মৃত্যুর সংজ্ঞা:

কারা মারা যায়? মানুষ, বিড়াল, তেলাপোকা? ব্রুস ওয়েইনের বাবা-মা? কী হয় মারা গেলে? হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যায়? মস্তিষ্ক বন্ধ হয়ে যায়? এগুলো বন্ধ হয় কেন? এগুলো যে কোষ দিয়ে তৈরি সেগুলো কাজ করা বন্ধ করে দেয়। আচ্ছা, ব্যাক্টেরিয়ার আবার হৃৎপিন্ড কী?

বিজ্ঞানের কাছে মৃত্যুর খুবই সহজ একটা সংজ্ঞা আছে। Irreversible cessation of all life processes, সুন্দর সংজ্ঞা। এর চেয়ে সুন্দর করে বলা সম্ভব না। বাংলায় বললে, জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর এমনভাবে সমাপ্তি ঘটা যে সেগুলো আর পুনরায় আরম্ভ করা সম্ভব না।

আর তাই সেটা এককোষী হোক কিংবা বহুকোষী প্রাণী, তার কোষ যদি গ্লুকোজ আর না নেয়, খাবার থেকে এনার্জি না ব্যবহার করে, বা আবর্জনা কোষ থেকে বের না করে, বড়ো না হয়, নতুন ডিএনএ না তৈরি করে বা নতুন কোষ আর তৈরি না করে, এবং এগুলো বন্ধ হবার পর সেগুলোকে আবার চালু না করা যায় তাহলে ওই কোষটাকে আমরা মৃত বলতে পারি। এরকম অনেক কোষ মারা গেলে একটা নির্দিষ্ট অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দেয়। সেটা যদি খোদ মস্তিষ্কই হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় Brain Death.

Brain Death কে নিয়ে কিছু কনফিউশন আছে বৈকি। যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের মৃত্যু মানেই পুরো প্রাণী বা মানুষটার মৃত্যু ধরা হয়, কিছু কিছু জায়গায় এটাই শেষ নয়।
যেমন মস্তিষ্কের শুধু সেরেব্রাম কাজ করা বন্ধ করে দিলেও শ্বাস প্রশ্বাস ঠিকই চলতে থাকে। আবার মেডুলা অংশ, সেরেব্রাম অংশ কাজ করা বন্ধ করলে লাইফ সাপোর্ট দিয়ে ঠিকই শ্বাসক্রিয়া চলমান রাখা যায়।

মৃত্যুমুখের অভিজ্ঞতা:
মৃত্যুর সময় কেমন অনুভূত হয়? যারা মৃত্যুর খুব কাছে থেকে ফিরে এসেছেন তাদের অভিজ্ঞতা কী?
অনেক স্টাডি হয়েছে Near Death Experience বা NDE নিয়ে।

প্রথমেই বলা যাক সেই সব লোকদের কথা যাদের resuscitation এর মাধ্যমে আবার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাদের অনেকেই নিজেদের resuscitation প্রক্রিয়াটা অনেক নির্ভুল ভাবে বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু যাদের NDE হয়নি তারা অনেকটা আন্দাজ নির্ভর উত্তর দেন।

NDEer দের মাঝে সবচেয়ে কমন যে অনুভূতি হয় সেটা হলো আউট অফ বডি এক্সপেরিয়েন্স। তারা ওই সময়টা ব্যাখ্যা করার সময় এমনভাবে বলেন যেন তারা অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে নিজেদের শরীরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আবার অনেকে বলেন তারা ওই সময় এমনসব রং দেখেন, বা শব্দ শোনেন যা তারা সাধারণ রং আর শব্দের সাথে মেলাতে পারেন না। অন্ধরাও এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তারা সেগুলো 'দেখেছেন'। অনেকে চোখের সামনে পুরো জীবনটা ভেসে উঠতে দেখেন তো অনেকে মৃত আত্মীয়দের সাক্ষাৎ পান।

বাচ্চাদের মাঝেও এটা লক্ষ করা গেছে। বাচ্চাদের নিয়ে স্টাডি করার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বাচ্চাদের মাঝে জাতি, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রভাব সেভাবে ফেলেনা। তাই তাদের বর্ণনা পক্ষপাতিত্বহীন হয়। তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও NDE একই রকম পাওয়া গেছে। এমনকি, জাতি, ধর্ম আলাদা হলেও সাধারন NDEers দের অভিজ্ঞতা প্রায় একই।

এটার কারন কী? কোনো কারণ লাগবে আপনার? আগে সাইকোলজিক্যাল ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করি।
এক্ষেত্রে, তিনটা মডেলের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।
Depersonalization Model
Expectancy Model
Dissociation Model

আমার আর্টিকেলে প্রথম দুটো মডেল আমি বাদ দিচ্ছি কারণ এগুলোর যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। শেষেরটা নিয়ে যা বলা হয়েছে সেটা হলো, এটা আমাদের মানসিক ডিফেন্স মেকানিজম। একটা মানসিক ধকল বা স্ট্রেস থেকে আমাদের মন বা মানসিক অংশকে বাঁচিয়ে রাখতেই আমাদের মস্তিষ্ক এসব কল্পনা করে

নেয়। এক ধরণের coping mechanism বলতে পারেন।

এখন বলা যাক ফিজিওলজিকাল ব্যাখ্যা নিয়ে। অনেক হাইপোথিসিস আছে, সেগুলো বলার প্রয়োজন মনে করছি না। তবে যে কারণেই হোক, আমাদের মস্তিষ্কের bilateral occipital cortex এ কোনো ক্ষতি, বা ড্রাগের প্রভাব বা অক্সিজেনের স্বল্পতা বা অন্য কোনো কারণে এগুলো অনেকটা হ্যালুসিনেট করায়। ডান পাশের ক্ষতি বেশি থাকলে টাইপ ওয়ান NDE হয় যেটায় মানুষটা আউট অফ বডি এক্সপেরিয়েন্স, উড়তে পারা বা তীব্র আলো ইত্যাদি দেখতে পায়।
বাম পাশের অংশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলে টাইপ টু NDE হয় যেখানে মানুষটা বিভিন্ন আওয়ায়, সঙ্গীত, কন্ঠস্বর, মৃত আত্নীয় ইত্যাদি দেখতে পারেন।

ব্যাপারটা বিজ্ঞান কম আজগুবি বেশি লাগছে? বিজ্ঞানের কাজই তো আজগুবিকে ব্যাখ্যা করা তাই এই টপিক বাদ দিতে পারিনি। তবে এটা এখানেই শেষ। এখন ফেরা যাক আবার পরিচিত বিজ্ঞানের কাছে।

মৃত্যুর পরে:
কী হয় এই শরীরটার? পঁচে যায়? তারপর শেষ? লাশ দেখেই কীভাবে বুঝবেন এটা কতদিনের পুরনো?

আপাতদৃষ্টিতে লাশটা মৃত মনে হলেও এই লাশ একটা উর্বর ইকোসিস্টেম। কোটি কোটি জীবনের বাস এই লাশের ওপর।
সাধারণত, প্রতি ঘণ্টায় লাশের তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রি করে কমতে থাকে। যদিও পরিবেশের তাপমাত্রার ওপর এটা নির্ভর করে।

রক্ত যেহেতু আর পাম্প হচ্ছে না তাই রক্ত লাশের একদম সর্বনিম্ন স্থানে জমা হয়ে থাকে এবং লাশের উপরিভাগ ফ্যাকাশে আর মাটির কাছের অংশ যেখানে রক্ত জমা সেটা কালচে হয়ে থাকে। এটাকে বলে Livor Mortis। সময়কাল ছয় ঘণ্টা।
তাপমাত্রা কমতে কমতে লাশ যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তখন সেটাকে Algor Mortis বলে। সময়কাল কয়েক ঘণ্টা।

লাশের যেই পেশিগুলো থাকে সেগুলো কিছুটা সংকুচিত বা contract থাকে এবং রিল্যাক্স করতে পারে না। যার ফলে শরীর শক্ত হয়ে থাকে। এটাকে Rigor Mortis বলে। সময়কাল ২৪ ঘণ্টা। এরপর আরো বারো ঘণ্টা সময় লাগিয়ে এটা চলেও যেতে থাকে। চলে যায় কারণ পেশিগুলোতে থাকা মায়োসিনকে কোষে থাকা এনজাইম ভেঙে ফেলে তাই সোজা বাংলায় পেশি ছিড়ে যায়।
পেশি কীভাবে কাজ করে এটা আমাকে অনেক অভিভূত করেছিল প্রথম যখন ক্লাসে পড়ি। আমরা পুরোদস্তুর ন্যানোটেক!

ম্যাগোটস চেনেন? ডিম ফুটে বের হওয়া কিউট কিউট পোকার বাচ্চা। লাশে পোকারা ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। ডিম পাড়া থেকে হাত-পাহীন বাচ্চা জন্ম নিতে সময় লাগে মাত্র একদিন।

এনারা লাশের ওপরে থাকা তরল দিয়ে খানাপিনা শুরু করেন, এরপর ভেতরে ঢুকেন। মৃত কোষ খেতে খুব পছন্দ। এরজন্য এদের দিয়ে বিভিন্ন ঘা চিকিৎসা করা হয় কারণ এরা জীবিত কোষ খায় না। এরপর এনারা moulting করেন। মানে উপরের খোসা বা চামড়া বা খোল যাই বলেন পরিবর্তন করেন। ডিম ফোটা থেকে

শুরু করে প্রথম খোল বদলাতে সময় লাগে মাত্র একদিন।
এরপর আরেকটু ঘোরাঘুরি করেন তারপর দ্বিতীয়বার খোলস বদলান। সময় আরো একদিন।
একই ব্যাপার। আর সাইজ দ্রুত বেড়ে যায়। এভাবে দুদিন যায়।

লাশ থেকে বেরিয়ে আসেন ভালো জায়গা খুঁজতে যাতে pupa স্টেজে যেতে পারেন। পিউপা স্টেজ মানে এখানে উনি একটা খোল; তৈরি করে নেবেন চারপাশে আর ভেতরে থাকবেন। খাবার খাবেন না। ছোটো থেকে বড়ো হবেন। অনেকটা শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হবার মতো ব্যাপার। পিউপা তৈরি করতে সময় চারদিন।

এরপর দশদিন পিউপার মাঝে বসবাস করেন। খাবার খান না। একপর্যায়ে বড়ো হয়ে বেরিয়ে আসেন।

বেরিয়ে এসে লাশের তরল থেকে প্রোটিন খান। প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ কারবার করেন। এরপর ডিম পাড়েন ওই লাশের ভেতর। বড়ো হয়ে ডিম পাড়তে সময় নেন দুইদিন।

তো এই হলো অবস্থা। এই বিভিন্ন সময়ে তাদের দেখতে আলাদা লাগে যার ফলে লাশে তাদের উপস্থিতি দেখলেই বোঝা যায় যে লাশটা কয়দিনের পুরনো।

উন্নত দাফন:

Do not stand at my grave and weep
I am not there; I do not sleep.
I am a thousand winds that blow,
I am the diamond glints on snow,
I am the sun on ripened grain,
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning's hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.

Do not stand at my grave and cry,
I am not there; I did not die.

-Mary Elizabeth Frye

তো, তখন থেকে লাশ লাশ করেই যাচ্ছি। এখন আপনার কাছে একটা লাশ আছে। আপনি কি করবেন? পুড়িয়ে ফেলবেন? কবর দেবেন? সাধারণত লাশ সবচেয়ে বেশি কবরই দেয়া হয়। তবে এটাকে আরেকটু উন্নত করা যায় না?
কফিনে লাশ রেখে মাটিতে দিলাম, জায়গার অপচয়। একটা ভালো কিছু করা যায়?

একটা পডের কথা ভাবা যাক। ডিমের মত আকৃতি। ভেতরে লাশ থাকবে, আর সাথে একটা সীড বা বীজ। পডটা মাটিতে পোতা হবে। বীজ থেকে গাছ হবে, গাছ বড়ো হবে সরাসরি লাশ থেকে মিনারেল নিয়ে। জীবন আবার শুরু হবে। প্রকৃতিতে গাছ বাড়বে। সুন্দর না

ব্যাপারটা? মৃত্যুর মাধ্যমেও প্রকৃতিতে ফিরে আসা। "আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে..."

মৃত্যু থেকে ফেরা।

A thousand words won't bring you back;
I know because I've tried.
Neither will a thousand tears;
I know because I've cried.

অনেক তো হলো। মৃত্যু থেকে যারা ফিরেছে তাদের গল্প শুনবেন না?

একানব্বই বছর বয়সে জান্যাইনা কলকিউইক্স হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে মারা গেলে তাকে মর্গে রাখা হয়। এগারো ঘণ্টা পর বেচারি উঠে দেখে সে মর্গে। চা আর প্যানকেক খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা তার মনে জেগে ওঠে।

অবাক লাগছে? এটাই একমাত্র কেস নয়। এরকম বহু কেস আছে যেখানে হার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও অনেক পরে সেটা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। এটার একটা নামও আছে। Lazarus phenomenon। ব্যাপারটা অবৈজ্ঞানিক কিছু না। CPR দেয়ার পর সাথে সাথে হার্টের কার্যক্রম ফিরে নাও আসতে পারে। এটাকে Delayed Return Of Spontaneous Circulation বা ROSC বলা হয়। অনেক পরে একটিভিটি আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে এটা অনেক অনেক বিরল।

আচ্ছা এটা হয় কেন? একটা থিয়োরি অনুযায়ী CPR দেয়ার সময় যেই প্রেশারটা দেয়া হয় সেটা সাথে সাথে পুরোপুরি চলে যায় না। অনেক্ষণ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে প্রেশারটা চলে গেলে হার্ট আবার আগের মতো কাজ শুরু করতে পারে।

আরেকটা থিয়োরি হলো, রোগীকে বাচিয়ে তোলার জন্য যেই মেডিসিন দেওয়া হয় সেগুলো হয়তো দেরিতে কাজ শুরু করে, এজন্য।

রক্তে পটাশিয়াম বেশি থাকলে দেরিতে ROSC শুরু হয় এবং এ দুটোর যোগসূত্র পাওয়া গেছে।

তবে কথা হচ্ছে এনারা কেউই আসলে মৃত ছিলেন না কখনোই। কেন? মৃত্যুর সংজ্ঞা আবার পড়ুন। "Irreversible cessation"। মানে যেটা বন্ধ হবে সেটা পুনরায় চালু করা কখনোই যাবে না। এখন যদি দশ ঘণ্টা পরে হোক আরে ক্রায়োজেনিক চেম্বারে দশ বছর পর হোক, আবার চালু যদি করা যায় তার অর্থ সে কখনো মৃত ছিলই না। বুঝাতে পেরেছি?

এবার তবে কবিতা শুনে যান একটা।

মৃত্যুর কাছে প্রতিটি মানুষ বড়ই অসহায়,
মৃত্যু যখন কাছে এসে বলে ...
পৃথিবীর সব মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে,
আমার কাছে আয় চলে আয়।
তবুও মানুষ ক্ষণিক জীবনের তরে
নতুন স্বপ্নগুলো করছে বপন,
পরাজিত হয়েও জীবন যুদ্ধে
গড়ছে আপন ভুবন।
নতুন বছর ফিরে ফিরে আসে,
আবার চলেও যায়,
সময়ের কাছে তবুও মানুষ
হয়ে পড়ে কেন এতো অসহায়?

-রুবিনা মজুমদার

জোনাকি

রওনক শাহরিয়ার

তারা- একটি দুটি তিনটি করে এলো
তখন- বৃষ্টি-ভেজা শীতের হাওয়া
বইছে এলোমেলো,
তারা- একটি দু'টি তিনটি করে এলো।
থই থই থই অন্ধকারে
ঝাউয়ের শাখা দোলে
সেই- অন্ধকারে শন শন শন
আওয়াজ শুধু তোলে।
— আহসান হাবিব।

গ্রাম বাংলার মানুষেরা একটা ছোট্ট অদ্ভুত প্রাণীর সাথে পরিচিত অবশ্যই থাকবেন। রাতের লোডশেডিং এর সময় ঝাক বেঁধে বাড়ির উঠোনে বা ঝোপের ধারে অথবা পুকুর পাড়ে তারার মিটমিট করে ওড়ে চলে। আলোর এই অদ্ভুত খেলার দৃশ্যটা সত্যিই অপ্রাকৃতিক ও মনোমুগ্ধকর। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে নগরায়ন ও দূষণের ফলে আজ এই অদ্ভুত জীবটির সাথে মানুষ তেমন পরিচিত নয়। শহরাঞ্চলের কথা বাদ তো বাদ, গ্রাম্য এলাকাতেও খুব একটা দেখা যায় না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এর প্রায় দুই হাজার প্রজাতি আছে, যার মধ্যে সবাই বিলুপ্ত প্রজাতি হিসেবে নাম লিখিয়েছে!

শুরুতে এক নজরে এর বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিন্যাস দেখে নেওয়া যাক :

Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Insecta
Order: Coleoptera
Family: Lampyridae (Latreille, 1817)

জোনাকি মূলত পাখাওয়ালা গুবরে পোকা, যাকে বাংলাতে বলা হয় **তমোমণি।** পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রায় দুই হাজার প্রজাতির জোনাকির আবাস। জোনাকির সবচেয়ে সুন্দর বিষয়টা হলো এদের নিজস্ব আলো তৈরী করার ক্ষমতা এবং মিটমিট করে জ্বলা। এই আলো মূলত শিকার অথবা যৌনমিলনের উদ্দেশ্য জ্বেলে থাকে। তবে মিটমিট করে জ্বলার বিষয়টাও বিজ্ঞানে এখনও অজানা।

জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মূলত জোনাকির আলো উৎপন্ন হয়ে থাকে। তলপেট থেকে নির্গত এই আলো দেখতে কিছুটা নীলাভ-সবুজ। এদের দেহকোষে লুসিফারিন (Luciferin) নামক রাসায়নিক উপাদান থাকে। জোনাকির শরীরের এনজাইম লুসিফারেজর উপস্থিতিতে ওই লুসিফারিন অক্সিজেন, এটিপি আর ম্যাগনেশিয়াম আয়নের মিশ্রনে দেহ থেকে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। এই প্রক্রিয়াকে বলে বায়োলুমিনেন্স, যা প্রকৃতিতে অনেক রূপে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। জোনাকির মজার বিষয় হলো এই আলোর কোনো তাপ থাকে না। বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হওয়া শক্তির প্রায় পুরোটাই আলো তৈরীতে সহায়তা করে। তাই এই কোল্ড লাইটের জন্য আলো অনেকটা নীলাভ হয়। উৎপন্ন আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো ৫৬০ - ৬৭০ ন্যানোমিটার। তবে কিছু প্রজাতি আরও কম দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গ উৎপন্ন করে থাকে (মানে গাঢ় নীল আলো)। জোনাকির এই আলোকে সবচেয়ে কার্যকরী আলো বলা হয়। প্রকৃতিতে লাল ও সবুজ আলোর জোনাকিও দেখতে পাওয়া যায়।

তবে এই জোনাকির আলোর অসাধারণ দৃশ্য থেকে আজ আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এর মূল কারণ নগরায়ন। রাতের অত্যাধিক আলো বা লাইট পলিউশানে জোনাকিরা প্রজননে অক্ষম হয়ে যায়। কারণ নিজেদের আলোর দ্বারা তারা সঙ্গীকে আকর্ষণের চেষ্টা করে, যা রাতের অতিরিক্ত আলোতে সম্ভব হয় না। আবার ফসলে কীটনাশক ব্যবহার এদের কমে যাওয়ার একটা বড়ো কারণ।

হয়তো আগামী প্রজন্ম আমাদের থেকে এই প্রাণীটার গল্প শুনবে,
আর অবাক চোখে বাংলার এক হারানো রূপের কথা চিন্তা করবে।
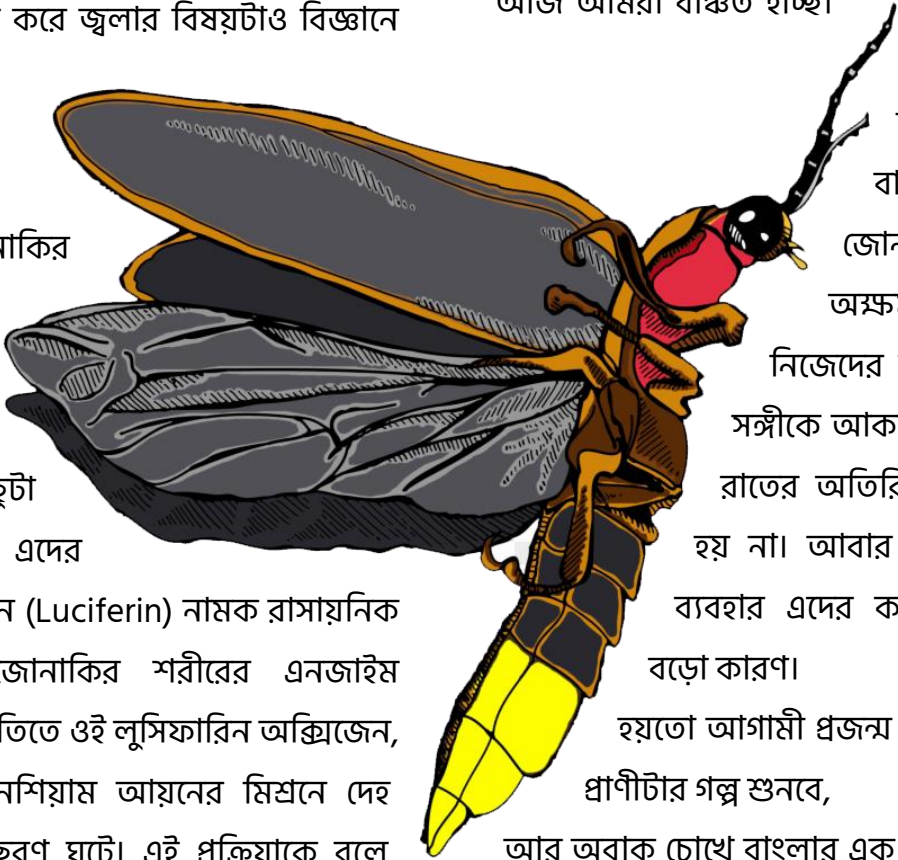
গুজব খন্ডন

জাভেদ ইকবাল

প্রশ্ন: ওষুধ খেলে কি লম্বা হওয়া যায়?

উত্তর: না। একটা বয়সে (সাধারণত ১২-১৫র মধ্যে) গ্রোথ হরমোন (Human Growth Hormone, HGH) নিলে যাদের গ্রোথ হরমোন কম (Growth Hormone Deficiency, GHD), তাদের উচ্চতা বাড়ে। যাদের এই হরমোন কম নেই, তাদেরও বাড়ে, তবে অনেক ডাক্তার এটা পছন্দ করেন না। এই লেখাটা হরমোন ট্রিটমেন্টা নিয়ে না; এই লেখাটা বাজারে বিক্রি হওয়া কিছু ভুয়া ওষুধ নিয়ে।

১। নিউবেস্ট টল। ৬০টা ট্যাবলেট, দাম ৫৫ ডলার। তার মানে একটা ট্যাবলেটের দাম প্রায় ৮০ টাকা। কিন্তু ব্যাটারা লিখেছে, যারা নিয়মিত দুধ খায়, তাদের জন্য। যদি আদৌ কোনো কাজ হয়, সেটা দুধের প্রোটিনের জন্য হবে, এই ওষুধের কোনো কাজ নেই।

২। রাইট-হাইট।

৩। ফিজিহাইট। জিরাফের ছবি দেওয়া, তাহলে এটা খেলে কি জিরাফের মতো লম্বা হবে?

৪। হাইটোফিট। এটা খেলে কি জিরাফের চাইতেও বেশি লম্বা হওয়া যাবে?

আরো প্রচুর আছে, এই চারটা উদাহরণ হিসাবে দিলাম।

সমস্যা হচ্ছে, এই সব ওষুধ যা পাওয়া যায়, সব হয় সাধারণ ভাইটামিন + আয়রন, অথবা হোমিওপ্যাথি। হোমিওপ্যাথি যে কাজ করে না এবং কেন কাজ করে না, সেটা নিয়ে অনেক লেখা হয়তো পড়েছেন তাই সেগুলো আর রিপিট করলাম না।

আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোন অ্যাকাডেমিক লেখা পেলাম না এর ওপরে। ব্লগ টাইট একটা সাইটের হোমিওপ্যাথি যে কাজ করে এমন একটা দাবি আছে। লেখাটার সমস্যাসমূহ:

- লেখাটা stylecraze নামে একটা সাইটে
- তারা দাবি করেছে, ২০এর পরেও কাজ করে। এটা যে মিথ্যা, সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। হাড় একটা বয়সের পরে আর বাড়ে না।
- "This medicine has been known to give minimum 70 percent result."-- এই কথাটার মানে কী? ৭০% মানুষের ওপর কাজ করে? মানুষ ৭০% বাড়তি লম্বা হয়? এই ধরনের ঝাপসা কথা পড়লেই বোঝা যায়, এগুলি বানিয়ে লেখা।
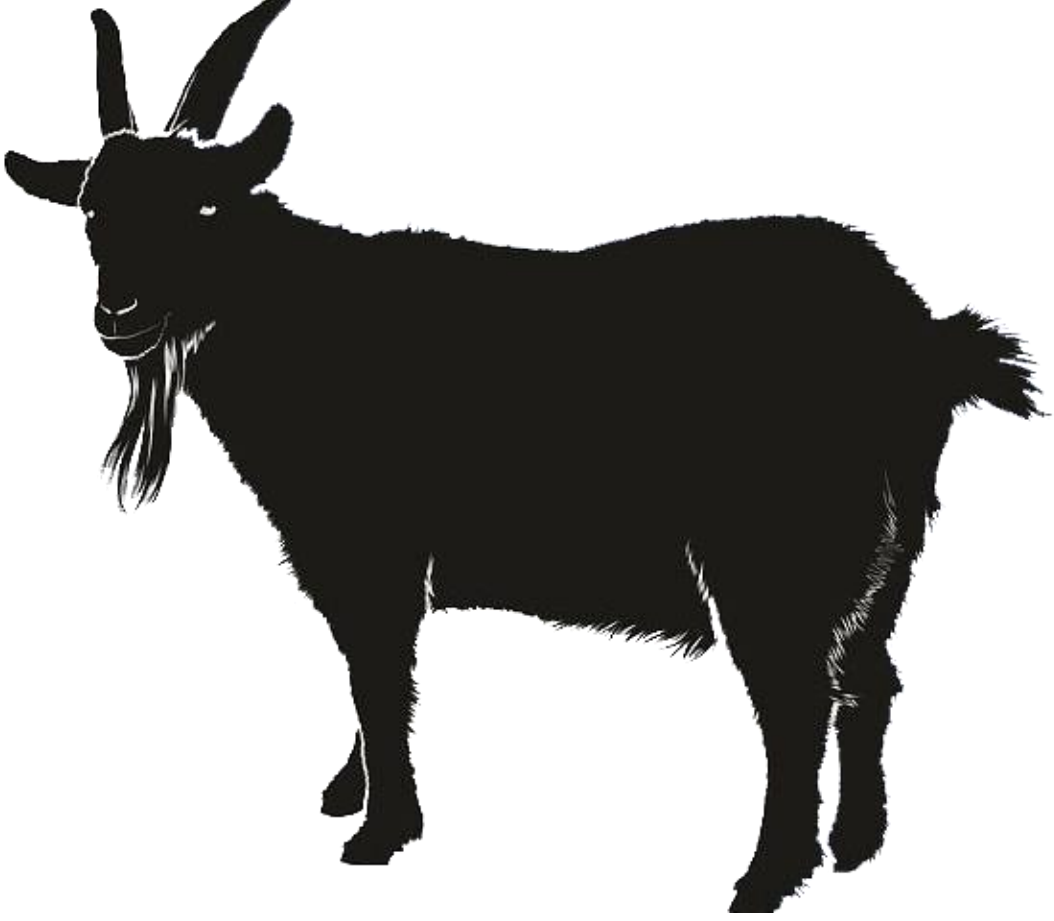
ছাগলের জাত ব্ল্যাক বেঙ্গল

শুভ সালাউদ্দিন

ছাগলের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। ভারত উপদেশে থাকবেন অথচ ছাগল চিনবেন না তা হয় কি করে! চীন, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এই চারটা দেশেই বিশ্বের ৪৫ ভাগ ছাগলের বসবাস। বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছাগল হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল । বাংলাদেশের আড়াই কোটি ছাগলের প্রায় ৯০ শতাংশই ব্ল্যাক বেঙ্গল। বেশিরভাগেরই নামটা পরিচিত হবার কথা যদি নামের সাথে পরিচিত নাও হন তাও বিভিন্ন ছুটিতে অন্তত গ্রামের বাড়িতে গিয়ে মিশমিশে কালো রঙের প্রায় ২০-৩০ কেজি ওজনের এই ছাগলের প্রজাতি দেখেছেন সেটা মোটামুটি গ্যারান্টির সাথেই বলা যায়। দেশের প্রায় সব জেলাতেই কমবেশি ছাগল থাকলেও চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলায় এই সংখ্যাটা অনেক বেশি। বাবার চাকরিসূত্রে চুয়াডাঙ্গা থাকার সুযোগ হয়েছিল তো দামুড়হুদা বা আলমডাঙ্গা উপজেলার একেবারে ভেতরের দিকে ঢুকলে দেখা যেত বিশাল বিশাল ছাগলের পাল। সেই সময়কার হাইটে মনে হতো এই ছাগলের পালের মাইনকা চিপায় পড়লে একদম ভর্তা হয়ে যাব। সেজন্য এখনও ছাগলের পাল এড়িয়ে চলি যদি চিপায় পড়ে যায়।

বাংলাদেশে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জনপ্রিয়তার কারণ হলো এদের প্রজনন ক্ষমতা বেশি, স্ত্রী ছাগল ৯-১০ মাস

বয়স হলেই প্রজননের যোগ্য হয় এবং বছরে দুইবার গর্ভধারণ করে গড়ে ২-৩টি ছাগলের জন্ম দেয়। তাছাড়া রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি বলে যে-কোনো পরিবেশের সাথে সহজেই মানিয়ে নেয়। তাই একটু পরিশ্রম করে লালন পালন করলে সহজেই ছাগলের পালের সৃষ্টি হয় এবং বিক্রির মাধ্যমে মালিক ভালোই লাভ করতে পারে। গ্রামের অস্বচ্ছল পরিবারে আয়ের উৎস হিসেবে যুক্ত হয়।

এছাড়া কোরবানির ইদ বা শিশুর আকিকার সময়েও এই ছাগলের চাহিদা রয়েছে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল মূলত মাংস, চামড়ার জন্য বিখ্যাত। বিশ্ববাজারে এই প্রজাতির ছাগলের চামড়া কুষ্টিয়া গ্রেড নামে পরিচিত। গবেষক সৈয়দ শাখাওয়াত হোসেন এর মতে, 'তুলনা করে দেখা গেছে, অন্যান্য জাতের ছাগলের চেয়ে এর মাংসের স্বাদ ভালো। এ কারণে বিশ্ববাজারে এর চাহিদা বেশি। এর চামড়া এত উন্নতমানের যে বিশ্বের বড়ো কোম্পানিগুলোর চামড়াজাত পণ্য তৈরিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া ব্যবহৃত হয়।

এখন আসি ছাগল কীভাবে পালন করবেন সেই কথায়। ছাগল পালনের বড়ো অংশ হলো ঠিকঠাক খাবার ব্যবস্থা করা। ছাগলের খাদ্যকে মেইনলি দুইভাগে ভাগ করা যায়,

- আঁশযুক্ত
- দানাদার

আঁশযুক্ত খাবারের জন্য আলাদা করে না ব্যবস্থা করলেও চলে। ছাগলকে ছেড়ে দিলে এমনিতেই কাঁঠাল পাতা, ইপিল ইপিল, নেপিয়ার ঘাস আরামসে চিবাতে থাকে।

তবে দানাদার খাদ্যের জন্য খৈল, ভূষি, ভুট্টা, খেসারি, এমবাভিট সঠিক মাত্রায় মিশিয়ে খাবার তৈরি করা হয়। তা সকাল বিকাল দুইবার খাওয়ালে ছাগলের খাদ্য চাহিদা পূরণ হয় এবং ছাগল সুস্বাস্থ্য অর্জন করে।

ছাগল পিপিআর, পক্স, নিউমোনিয়া, ক্রিমি ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে পারে তাই এর বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। মোস্ট ইম্পর্ট্যান্টলি যদি ভ্যাক্সিন দেবার প্রয়োজন হয় তাহলে সঠিক সময়ে ভ্যাক্সিন দিতে হবে। নাহলে ছাগল রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও করতে পারে, সাবধান!

বাংলাদেশে ছাগল নিয়ে ভালোই গবেষণা হয়েছে তা জুলজির জার্নাল ঘাটলেই বোঝা যায়। তবে বাংলাদেশের গর্ব এই ওয়ান অনলি ছাগলের জিনোম সিকোয়েন্স ২০১৯ সালের আগ পর্যন্ত ছিল অজানা। ২০১৯ সালে Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) এর প্রফেসর আমাম জোনায়েদ সিদ্দিকির নেতৃত্বে একদল গবেষক এর জিনোম সিকোয়েন্স ডিকোড করে যেটা নামকরা জার্নাল নেচারে এ প্রকাশিত হয়। গবেষকরা ২৯ জোড়া ক্রোমোজোম থেকে ২৬ হাজার জিন ডিকোড করতে পারেন।

যাহোক, সেসময় পশ্চিম বাংলায় ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের দৌরাত্ম কেমন ছিল জানি না। থাকলেও সম্ভবত সত্যজিৎ রায়ের নজর কাড়তে পারেনি, নাহলে আমার **রয়েল বেঙ্গল রহস্য** এর বদলে **ব্ল্যাক বেঙ্গল রহস্য** নামে বই পেতাম। কেউ ইচ্ছে করলে এই নামে ফ্যান ফিকশন লিখা শুরু করলেও করতে পারেন।

গ্রহাণুদের গল্প ৩

হৃদয় হক

"It's much more likely that an asteroid will strike the Earth and annihilate life as we know it than AI will turn evil." - Oren Etzioni

প্রধান বেষ্টনির বাহিরে

NEA

নিয়া আসলে নিয়া না। নিয়া হল **এন ই এ (NEA) বা Near-Earth Asteroid**। বুঝতেই পারছেন, এরা পৃথিবীর কাছাকাছি আসে। যাহোক, এদের নিয়ে

আলোচনা করার আগে কিছু বিষয় জানা প্রয়োজন। আগে সেগুলো দেখা যাক।

১. Astronomical Unit (AU) বা জ্যোতির্বিদ্যার একক বা মহাজাগতিক একক: এটি মূলত মহাজাগতিক দূরত্ব প্রকাশে ব্যবহৃত একটি একক। পৃথিবী ও সূর্যের গড় দূরত্ব হলো এই এককের মান। তবে বর্তমানে এর মান ধরা হয় ঠিক ১৪৯, ৫৯৭, ৮৭০, ৭০০ মিটার (প্রায় ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার বা ৯৩ মিলিয়ন মাইল) হিসেবে, যাকে আমরা বলি ১ জ্যোতির্বিদ্যার একক বা 1AU.
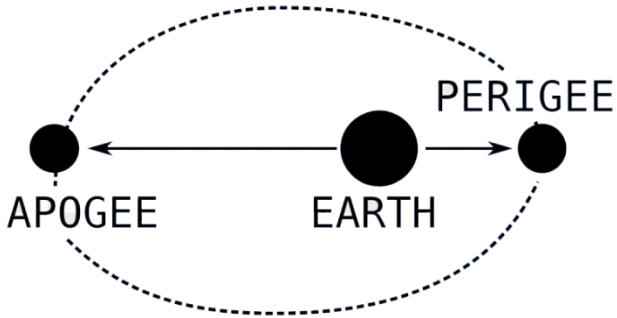
২. অপদূরবিন্দু: উপবৃত্তাকার কক্ষপথের যে বিন্দুসমূহ মহাকর্ষীয় আকর্ষণের নাভি থেকে সবচেয়ে দূরে বা উক্ত বিন্দুর সবচেয়ে কাছে সেগুলোকে অপদূরবিন্দু বলে। সৌরজগতের কোনো বস্তু থেকে সূর্যের ন্যূনতম দূরত্বকে উক্ত বস্তুর অনুসূর (Perihelion) আর, এর বিপরীতকে অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি দূরে থাকায় অবস্থাকে অপসূর (Aphelion) বলা হয়।
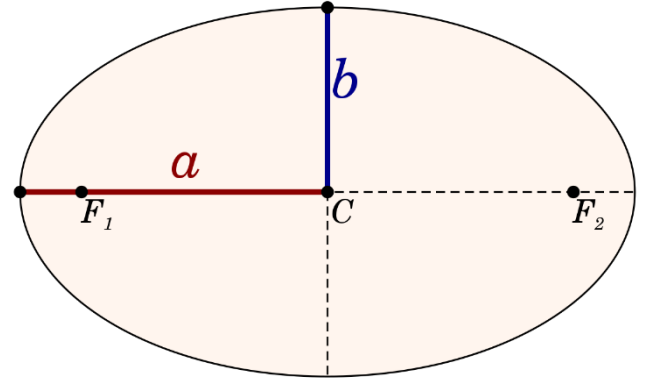
৩. অর্ধ-বৃহদাক্ষ(Semi-major axis) এবং অর্ধ-ক্ষুদ্রাক্ষ (Semi-minor axis): এটাকে সহজ ভাষায় বলি, একটা উপবৃত্তের কেন্দ্র থেকে যে-কোনো একপাশের সর্বোচ্চ দূরত্ব হল অর্ধ-বৃহদাক্ষ। আর এর উলটো অর্থাৎ, একটা উপবৃত্তের কেন্দ্র থেকে যে-কোনো একপাশের সর্বনিম্ন দূরত্ব হল অর্ধ-ক্ষুদ্রাক্ষ।

এখন আমরা মোটামুটি NEA-দের নিয়ে কোমর বেঁধে আলোচনায় নামতে পারি। তা, যেসব গ্রহাণুদের অনুসূর 1.3AU থেকে কম তদেরকেই মূলত NEA বলা হয়। এদের আবার কক্ষপথের ভিত্তিতে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমে এই ৪ প্রকারের সাথে ছোটো করে পরিচিত হই। পরে বিস্তারিত আলোচনায় নামব।

১. আমোর (Amor): এরা হলো সেই সকল গ্রহাণু যাদের কক্ষপথের সেমি মেজর এক্সিস পৃথিবী আর মঙ্গলের

কক্ষপথের মধ্যে অবস্থান করে, আর এরা যখন অনুসূরে থাকে তখনও পৃথিবীর কক্ষপথে নাক গলায় না। সহজে বললে, এরা হলো তারা যারা, পৃথিবীর কক্ষপথে নাক গলায় না তবে কক্ষপথের খুবই নিকটে আসে।

২. অ্যাপোলো (Apollo): এরা হলো সেই সকল ভদ্র গ্রহাণু যাদের কক্ষপথের সেমি মেজর এক্সিস পৃথিবীরটা থেকে বড়ো, মানে মাঝেমধ্যে এরা পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে অবস্থান করে, তবে যখন সূর্যের সবচেয়ে নিকটে থাকে তখন পৃথিবীর কক্ষপথে নাক গলায়।

৩. এটেন (Aten): এরা হলো সেই সকল ভালো গ্রহাণু যাদের কক্ষপথের সেমি মেজর এক্সিস পৃথিবীরটার থেকে ছোটো, মানে মাঝেমধ্যে পৃথিবীর কক্ষপথের ভেতরে থাকে, তবে যখন সূর্যের সবচেয়ে দূরে থাকে তখন পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে থাকে। যাহোক নাক তো গলায়ই।

৪. এটিরা বা অ্যাপোহেলেস (Atira or Apoheles): এরা হলো সেইসব গ্রহাণু যারা পৃথিবীর কক্ষপথের ভেতরেই অবস্থান করেন। এদের অনুসূর আর অপসূর কোনোটাই পৃথিবীর কক্ষপথে বাইরে বেরোয় না।

তবে এ চার প্রকার বাদে আরেকটা প্রকার বিদ্যমান, যারা আসলেই আমাদের জন্য মোটামুটি সমস্যাযুক্ত। তাদের বলাহয়, Potentially Hazardous Asteroids (PHA) যাদের দূরত্ব পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে 0.05 AU তাদের এই উপাধি দেওয়া হয়।

যাহোক, আজকে এদের মধ্যে, শুধুমাত্র আমোরদের (Amors) নিয়ে আলোচনা করব।

আমোর

এরা কারা তা উপরে বলেছি। এরা অনুসূরে পৃথিবীর অনেক নিকটে থাকে। সেসময়ে এদের দূরত্ব (1.017 AU ও 1.3 AU) এর মধ্যে থাকে। আর অপসূরে 1.3 AU দূরত্বে থাকে। এ ধরনের গ্রহাণুদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাকে আবিষ্কার করা হয় সে হলো (1221) Amor। একটা মজার ব্যাপার হলো, ধারণা করা হয় মঙ্গলের দুটো চাঁদ ফোবোস আর ডিমোস মূলত আমোর গ্রহাণু (এ নিয়ে পরে আলোচনা করব)।

যাহোক, আমোর গ্রহাণুদের আবার ছোটো করে ৪টা ভাগে ভাগ করা হয়। এরা হলো - Amor I, II, III এবং IV। এবার এই ৪ প্রকার আমোরদের এক এক করে দেখা যাক।

Amor I

এদের সেমি মেজর এক্সিস পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে একটু বেশিই থাকে। এখন পর্যন্ত পাওয়া আমোর গ্রহাণুদের সংখ্যা প্রায় ৩,৪০০ টা। তবে ২০% এরও বেশি আমোর গ্রহাণু এই সাব-গ্রুপের অধীনে। তবে এদের কিছু গ্রহাণুর কেন্দ্রীয় দূরত্ব বলতে গেলে পুরোটাই পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে অবস্থান করে। ব্যাপারটা যেন 'পৃথিবী -মঙ্গল বেষ্টনি' - এর মতো। এ গ্রুপের সেরা খেলোয়াড় হলেন '(15817) Lucianotesi' ৭০০মিটার আকার বিশিষ্ট এ গ্রহাণু ১৯৯৪ সালে আবিষ্কার করা হয়।

এ গ্রুপের আরেকজন উল্লেখযোগ্য সৌভাগ্যবান গ্রহাণু হলো, 433 Eros (এর নাম গ্রিক পুরাণে ভালোবাসার গড ইরোস থেকে নেওয়া)। এ গ্রহাণুতেই প্রথম বিজ্ঞানীরা স্পেইস প্রোব পাঠান এবং এটা সফলভাবে ইরোসের ভূমিতে ল্যান্ড করে। এটা অবশ্য NEAR মিশনের অন্তর্ভূক্ত। তবে এই গ্রহাণু থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ছিল এককথায় যুগান্তকারী।

Amor II

এদের সেমি মেজর এক্সিস মূলত মঙ্গল আর গ্রহাণু বেষ্টনির মধ্যে থাকে। আর অপসূরে বেশিরভাগই এরা গ্রহাণু বেষ্টনিতে অবস্থান করে। তবে এই গ্রুপের সবাই যেহেতু মঙ্গলের কক্ষপথকে অতিক্রম বা ক্রস করে, তাই এদের Mars Crossing Asteroid (MCA) অথবা Mars-crossers ও বলা হয়। আমোর গ্রহাণুদের প্রায় ৩ ভাগের ১ ভাগ এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। আর এখানেই থাকে আমোর গ্রহাণুদের রাজা (1221) Amor (এর নাম রোমান পুরাণের ভালোবাসার গড, 'আমোর' থেকে নেওয়া)। আর এই ১.৫ কিলোমিটার ব্যাসওয়ালা এই গ্রহাণু অন্যান্য আমোর গ্রহাণু থেকে বড়ো।

Amor III

মোটামুটি আমোর গ্রহাণুদের অর্ধেকই এ গ্রুপের সদস্য। আর এদের কক্ষপথও কম বড়ো নয়। এদের সেমি মেজর এক্সিস এদেরকে প্রধান গ্রহাণু বেষ্টনির অনেক পেছনে নিয়ে যায়। অনেককে আবার এর বাইরেও বার করে নিয়ে যায় যে, বৃহস্পতি গ্রহ আর সেই গ্রহাণুর মাঝে 1AU পরিমান জায়গা থাকে। তারপরও এরা পৃথিবীর এত নিকটে আসতে সক্ষম যে, আমরা এদের NEA গ্রুপে ফেলতে বাধ্য হই। সবচেয়ে বড়ো NEA, (1036) Ganymed (গ্যালিলিও দাদুর আবিষ্কৃত চাঁদ Ganymede এর সাথে মিলিয়ে ফেলবেন না আবার, দাদু রাগ করবে।) এই গ্রুপের সদস্য। এই গ্রহাণুটা ১৯২৪ সালে আবিষ্কৃত হয়, আর এর ব্যাস ৩২ কিলোমিটার।

আবার এই গ্রুপে আরো কিছু গ্রহাণু আছে যারা বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথ ক্রস করে, মানে নাক গলায় আরকি। তবে এই গ্রুপের একটা ঝামেলা আছে। এই গ্রুপের বিভাগটা একটু ধোঁয়াশে। এদের কিছু আবার প্রধান বেষ্টনির Alinda গ্রুপের সদস্য। গত পর্বের ক্রিকউড গ্যাপের কথা মনে আছে? Alinda হলো ৩:১ রেজোন্যান্স এর নাম। তবে যদি কখনো এরা আমাদের কোনো ট্যারাস্টিয়াল[1] গ্রহের পর্যাপ্ত পরিমাণ নিকটে আসে আহলে তারা বৃহস্পতি গ্রহের এই অত্যাচার থেকে ছাড়া পাবে।

Amor IV

অবশেষে আমরা আমোর গ্রহাণুদের সর্বশেষ গ্রুপে আসতে পারলাম। এটা খুবই ছোটো একটা গ্রুপ। মাত্র

১৪ জন সদস্য নিয়ে এই গ্রুপটা গড়ে উঠেছে। অন্যান্য গ্রুপের অনেক গ্রহাণুদের নানান নাম থাকলেও এ গ্রুপের শুধু একটি মাত্র গ্রহাণুর নাম আছে। এর নাম জনাব, (3552) Don Quixote (চিন্তা নাই, এই ডন আমাদের পৃথিবীর ডনদের আছে পাত্তা পায় না, মটু পাতলুর জন দ্যা ডনের কাছে তো একদমই না)। তবে জ্যোতির্বিদরা মনে করেন এটা কোনো লুপ্ত হয়ে যাওয়া বা মৃত ধুমকেতু। এমন অনেক ধুমকেতু আছে যারা সূর্যের নিকটে এসে তাদের ধুমকেতুময়ী চরিত্র হারিয়ে ফেলে (সূর্য যে একটা রাক্ষস সেটা আমি অনেক আগেই বুঝেছি) আবার সৌরজগতে ফিরে যায়। জ্যোতির্বিদরা ধারণা করেন এমন অনেক গ্রহাণু আছে যারা এককালে ধুমকেতু ছিল। তবে ২০০৩ সালের একটা সেই লেভেলের টেলিস্কোপ মহাকাশে পাঠানো হয় যার নাম, Spintzer Space Telescope, (বেশ কিছুদিন আগে এটাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, R.I.P Spintzer) এই গ্রহাণুর মধ্যে ধুমকেতুর কোমা আর লেজ দেখতে পায় যা ছিল ইনফ্রারেড আলোতে, মানে আমাদের সাধারণ দৃষ্টিসীমার বাইরে। এটা হওয়ার কারণ মূলত এই গ্রহাণুর পৃষ্ঠে জমে থাকা কার্বন ডাই অক্সাইড এর বরফ। এটা আমাদের সূর্যের থেকে সৌরঝড়ে[2] প্রবাহ পাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আর মহাবিশ্বে CO2 গ্যাস আকারে ছড়িয়ে পরে, যা ধুমকেতুর মতো কোমা আর লেজের গঠন করে। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, (3552) Don Quixote অতীতে একটি ধুমকেতু ছিল।

আমরা ধুমকেতু নিয়ে আরো অনেক পরে আলোচনা করব। তবে পরবর্তী পর্বে আমার গ্রহাণু বাদে বাকি ৩টা NEA নিয়ে আলোচনা করব।

পাদটীকা:

ব্যাঙাচি

১. ট্যারাস্ট্রিয়াল গ্রহ : সৌরজগতের গ্রহদের বড়ো পরিসরে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। ট্যারাস্ট্রিয়াল আর জোভিয়ান। ট্যারাস্ট্রিয়াল হলো বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহ। এদের পৃষ্ঠ শক্ত, পাথর দিয়ে তৈরি। আর জোভিয়ান হলো গ্যাসের তৈরি, ট্যারাস্ট্রিয়াল গ্রহ বাদে বাকিগুলো।
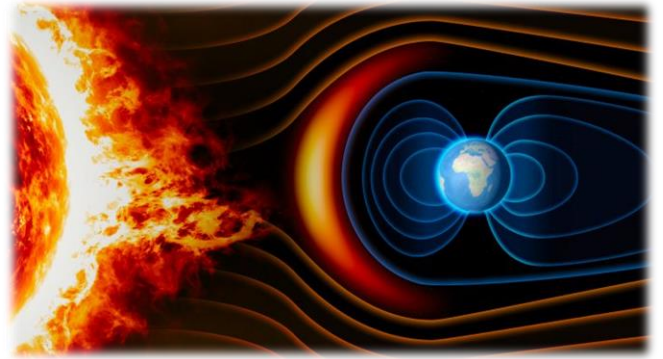
২. সৌরঝড়: সূর্য প্রতিনিয়ত তার চারপাশে তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোওয়েভ ও প্লাজমা নিক্ষেপ করছে যাদের বেগ সেকেন্ডে কয়েক দশক হতে কয়েকশ কিলোমিটার। মূলত একে বলে সৌরঝড় বা Solar Wind।
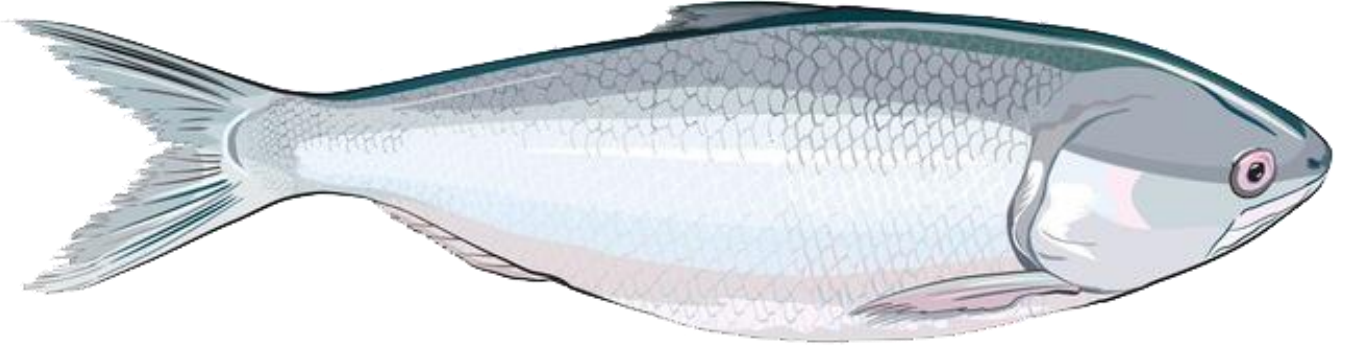
ইলিশ মাছ

আবদুল্লাহ আল নাদরুন

একটু থামেন! আপনি ইলিশ মাছ খান? অনেক কাটা তাই না? একদম ঠিক। কাটার জ্বালায় অনেকেই খেতে চেয়েও খেতে পারেনা। যাহোক ইলিশ মাছ কিন্তু আমাদের জাতীয় মাছ। বাংলার মানুষকে মাছে ভাতে বাঙালি বলা হয়।

এই মাছ এর তাহলে বিশেষ কিছু আছে। তাই এই জাতীয় মাছ এর প্রতি সম্মান জানিয়ে একটু দাঁড়াই সবাই। তাহলে শুরু করা যাক? থাকবেন তো? আমার সাথে আপনিও এই ইলিশ মাছ এর দুনিয়ায় ভ্রমণ করতে জোরেসোরে বসে যান।

শুরু করি,

ইলিশ মাছ এর বৈজ্ঞানিক নাম: *Tenualosa ilisha* কী? নামটা ভালো লাগেনি? সমস্যা নেই আমরা ইলিশ

মাছই ডাকব। এটি মূলত সামুদ্রিক মাছ, যা ডিম পাড়ার জন্য বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারতের নদীতে এসে থাকে। ইলিশ শব্দটি বাংলা ভাষা, ভারতের আসাম এর ভাষায় ব্যবহার হয়, তেলুগু ভাষায় ইলিশকে পেলাসা বলে। পাকিস্তান এর ভাষায় বলা হয়ে থাকে পাল্লু মাছ।

আরেহ ধুর ভাই আপনি এত নাম টাম বলে সময় নষ্ট কেন করছেন?

আচ্ছা সরি, আর নাম টাম বলে বোর করলাম নাহ। চলুন অন্য কথায় যাই।

ইলিশ অর্থনৈতিকভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রীষ্মমন্ডলীয় মাছ। বঙ্গোপসাগরের ব-দ্বীপাঞ্চল, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদীর মোহনার হাওড় থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ ধরা হয়। এটি সামুদ্রিক মাছ কিন্তু এই মাছ নদীতে ডিম দেয়। ডিম ফুটে গেলে ও বাচ্চা বড়ো হলে (যাকে বাংলায় বলে জাটকা) ইলিশ মাছ সাগরে ফিরে যায়। সাগরে ফিরে যাবার পথে জেলেরা এই মাছ ধরে। এই মাছের অনেক ছোটো ছোটো কাটা রয়েছে তাই খুব সাবধানে খেতে হয়। তাই পরেরবার খাওয়ার সময় সাবধানে কাটা বেছে খাবেন।

যদিও ইলিশ লবণাক্ত জলের মাছ বা সামুদ্রিক মাছ, বেশিরভাগ সময় সে সাগরে থাকে কিন্তু বংশবিস্তারের জন্য প্রায় ১২০০ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করে ভারতীয় উপমহাদেশে নদীতে পাড়ি জমায়। বাংলাদেশে নদীর সাধারণ দূরত্ব ৫০ কিমি থেকে ১০০ কিমি। ইলিশ প্রধানত বাংলাদেশের পদ্মা (গঙ্গার কিছু অংশ), মেঘনা (ব্রহ্মপুত্রের কিছু অংশ) এবং গোদাবরী নদীতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর মাঝে পদ্মার ইলিশের স্বাদ সবচেয়ে ভালো বলে ধরা হয়। ভারতের রূপনারায়ণ নদী, গঙ্গা, গোদাবরী নদীর ইলিশ তাদের সুস্বাদু ডিমের জন্য বিখ্যাত। ইলিশ মাছ সাগর থেকেও ধরা হয় কিন্তু সাগরের ইলিশ নদীর মাছের মতো সুস্বাদু হয় না। দক্ষিণ পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশেও এই মাছ পাওয়া যায়। সেখানে মাছটি পাল্লা নামে পরিচিত। এই মাছ খুব অল্প পরিমাণে থাট্টা জেলায় ও পাওয়া যায়। বর্তমানে সিন্ধু নদীর জলস্তর নেমে যাওয়ার কারণে পাল্লা বা ইলিশ আর দেখা যায় না।

আমরা যদি বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিন্যাস দেখি তাহলে দেখা যায়,

ইলিশ মাছ এর

জগৎ: Animalia

পর্ব: Chordata

শ্রেণী: Actinopterygii

বর্গ: Clupeiformes

পরিবার: Clupeidae

উপপরিবার: Alosinae

গণ: Tenualosa

প্রজাতি: T. ilisha

দ্বিপদী নাম :Tanualosa ilisha (F. Hamilton, 1822)

থাক আর বোর করব না। আজ এখানেই থাকা। তবে যাওয়ার আগে এইটুকু বলব যে, তাদের ডিম দেওয়ার সময়, যখন আলাদা করে মাছ ধরা নিষিদ্ধও করা হয় তখন আমাদের দেশের অনেক মাঝিই মাছ ধরেন। যার জন্য অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। তাই আমাদের এই দিকটি একটু বিবেচনা করতে হবে।

সুডোকু মেলাও, বুদ্ধি বাড়াও!

1	3				2			4
		8	5					
	4						5	
	6							
			7	6	3			9
	7	3	9			5	6	
		4					3	2
			3	9	6			5
3	5	7		8			9	

মেলানোর উপায় :

- ১-৯ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা বসবে, কোনো সংখ্যা সারি বা কলামে দুইবার বসে না।
- ঘরগুলো ৩*৩ এবং ৯*৯ ভাবে করা আছে। সুবিধামত করা যাবে।
- কার্ড কপি থাকলে পেজে চেষ্টা করে দেখুন, সফট কপি হলে খাতায় ৯*৯ ঘর টেনে সংখ্যা বসিয়ে করুন।

বিজয়ীদের নামসহ উত্তর আগামী সংখ্যায়;)

তালিপাম

রওনক শাহরিয়ার

সম্ভবত ২০১০ সালের কথা। তখন সম্ভবত ক্লাস ফাইভের ছাত্র। বাসায় টেলিভিশন না থাকার দরুন নিয়মিত পত্রিকা নেওয়া হতো। এমনই একদিন প্রথম আলোতে একটা চমৎকার সংবাদ পেলাম। একটা গাছ নাকি মারা যাবে। সেটা পৃথিবীতে ওই প্রজাতির শেষ বংশধর, আবার ফল দিয়েই মারা যাবে। তাই সংরক্ষণে সক্ষম না হলে এটাই হবে একটি প্রজাতির পরিসমাপ্তি। এখানে চমৎকার বিষয় হলো গাছটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-উপাচার্যের বাসভবনে সামনে অবস্থিত। তো এর পরের বেশ কয়েকদিন পত্রিকাতে এই গাছটি সম্পর্কে একটা আর্টিকেল থাকত। লেখাটা হয়তো এইটুকুই থাকত তবে কিছু মানুষ একে অন্য পর্যায়ে নিয়েছে। তালিপামকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন বৃক্ষপ্রেমি মানুষেরা। আসুন জেনে নেওয়া যাক এই বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টার এক গল্প।

তালিপাম হলো Arecaceae গোত্রের সদস্য, যা মিয়ানমার, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে দেখা যেত। আকৃতি সাধারণ তালগাছের মতোই, তবে বৈশিষ্ট্যগতভাবে ভিন্ন। প্রায় ৯০ বছরের জীবনে একবার ফুল ও ফল দেওয়ার পরই বৃক্ষটি মারা যায়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইউলিয়াম রক্সবার্গ প্রথম এর সন্ধান পান। তিনি এর নাম দেন ‘করিফা তালিয়েরা’ (*Corypha taliera*)।

ইউলিয়াম রক্সবার্গের সম্মাননায় তার নাম জুড়ে বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয় '*Corypha taliera Roxburgh*'।

এর বৈজ্ঞানিক নামকরণ :
জগৎ: Plantae
বর্গ: Arecales
পরিবার: Arecaceae
গণ: Corypha
প্রজাতি: C. taliera
দ্বিপদী নাম: *Corypha taliera Roxb. DC.*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মেরও আগে ব্রিটিশ গার্ডেনার রবার্ট প্রাউডলক রমনা জোনকে সাজানোর জন্য বিভিন্ন দুর্লভ উদ্ভিদের সাথে তালিপামের চারাটি রোপণ করেন।
এরপর ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডের পাশে গাছটি শনাক্ত করেন অধ্যাপক এম সালার খান। সে সময় বীরভুমে আরেকটি গাছ ছিল। ১৯৭৯ সালে শতবর্ষী এই গাছে ফুল দেখা দিলে স্থানীয়রা একে ভূতের আছড় ভেবে বসে। ফলস্বরূপ ফল ধরার আগেই তারা গাছটি কেটে ফেলে। এরপর ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (IUCN) ১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছটিকে বুনো পরিবেশে বিশ্বের একমাত্র তালিপাম গাছ হিসেবে ঘোষণা করে।

মূল ঘটনা ঘটে ২০০৮ সালে। অক্টোবরে ১৮ তারিখে প্রথম আলোতে একটা প্রতিবেদন বের হয় গাছটায় ফুল আসার উপক্রম। একে 'মরণফুল' বলা হয়। অর্থাৎ ফুল থেকে ফল হলেই গাছটি মারা যায়। তালিপামে ফুল আসার পর ২০১০ সালে ফল প্রদান করে গাছটি মারা যায়। গল্পটা হয়তো এখানেই শেষ হতো, তবে পেছনের দৃশ্যগুলোর এটাই শুরু।

এই তালিপাম সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক হাদিউজ্জামান বলেন, ফুলার রোডের তালিপামটিতে ফুল ফোটার পর আমরা আশঙ্কা করেছিলাম পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে গাছের এ প্রজাতিটি। কারণ ফুল ফোটার পরপরই গাছটি মারা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ীও এ গোত্রের প্রজাতিগুলোর বীজও সচরাচর অঙ্কুরিত হয় না। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে এ তালিপামগাছটির সব বীজ থেকে চারা হয়। (প্রথম আলো)

আরবরিকালচার থেকে তালিপামের ফল হতে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা প্রদান করতে গিয়ে ব্যর্থ হন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু সহ-উপাচার্যের বাসভবনের মালি জাহাঙ্গীর আলম বীজ রোপণ পদ্ধতিতে চারা তৈরিতে সক্ষম হন। সম্ভবত তার অবদান বেশি ছিল

তালিপামকে বাঁচাতে, তবে গল্পের আসল নায়ক এখনও অনুপস্থিত।

এবার আসা যাক আখতারুজ্জামান চৌধুরীকে নিয়ে, যিনি মিরপুর বাংলা কলেজের রসায়নের সহকারী অধ্যাপক। বৃক্ষপ্রেমী এই মানুষটির মনোযোগ ছিল অন্যদিকে। পিএইচডি গবেষণার জন্য দুর্লভ এবং ঔষধি গুণাগুণ সমৃদ্ধ গাছের খোঁজ করতে গিয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের একটি বই থেকে তিনি বুনো তাল বা তালিপাম গাছের কথা জানতে পারেন। এই বুনো তাল পূর্ববাংলার স্থায়ী গাছ। এরপর ২০৮০ এ এসে তালিপাম সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হন।

তিনি কোনো এক ভোরে গাছের নিচে মাটি থেকে পাঁচটার মতো বীজ সংগ্রহ করেন। সেগুলো বাসায় নিয়ে টবে রোপণের মাস দুয়েকের মধ্যে অঙ্কুরোদগম হয়! এরপর নিয়ম করে প্রতিদিনই গাছের নিচ থেকে মাটিতে পড়ে থাকা ফল সংগ্রহ করতেন। এভাবে প্রায় হাজারখানেক বীজ সংগ্রহ করেন, যার কয়েকশ বীজ রেখে দেন গবেষণার জন্য। তিনি নিজের বাসায় ২০০ আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের মেডিসিনাল গার্ডেনে ৩০০-এর মতো বীজ রোপণ করলে প্রায় শখানেক বীজ নষ্ট হয়ে গেল। এর পর তিনি অঙ্কুরোদগম হওয়া চারাগুলো দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে মনোযোগী হন।

এরপর থেকে তিনি ৪৮ জেলায় ৩০০ তালিপামের গাছ রোপণ করেন। এরপর মধ্যে এখন ২৫০টির মতো বেঁচে আছে। একশ এর মতো বীজ পাট গবেষণা ইনিস্টিউটে সংরক্ষণ করেন যাতে পরিবর্তে গবেষণার কাজে ব্যবহার সম্ভব হয়। এই গাছের বিশেষ সুবিধা হলো এর কোনো যত্ন লাগে না, আপনা আপনি বড়ো হয় কেউ কেটে না ফেললে।

তার তৈরি তালিপামের চারা রোপণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুনসহ অনেকেই। তিনি ব্যক্তিগত আয়ের প্রায় ২০% এই কাজে ব্যয় করেছেন। তার পিএইচডিও সম্পন্ন করেছেন তালিপাম বিষয়ে। তিনি 'বাংলাদেশের বিপন্ন উদ্ভিদ' নামে একটি বইও লিখেছেন।

তালিপাম গাছটির চারা সারা দেশে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, এগুলোতেও একসময় ফুল ফুটবে, ফল হবে। ঔষধী গুণসম্পন্ন হওয়া গবেষণার পরিধি বাড়বে। তবে তা হয়তো ২৮০০ সালের আগে সেভাবে সম্ভব হবে না। তবে মানুষ সচেতন থাকলে ধীরে ধীরে ‘বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি’র তালিকা থেকে গাছটি মুক্তি পাবে।

নিম

মাহতাব মাহদী

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।

পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ!

কেউবা ভাজছে গরম তেলে।

খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।

চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।

এমনি কাঁচাই ...

কিম্বা ভেজে বেগুন-সহযোগে।

যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।

-বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বলাইচাদ মুখোপাধ্যায় এর উপরের বক্তব্যগুলো নিমগাছকে নিয়ে বলা, বলা বাহুল্য তিনি এক বিন্দুও মিথ্যে বলেননি। নিম গাছ আসলেই পৃথিবীর গুরত্বপূর্ণ গাছদুটোর একটি। WHO থেকে এটা একুশ শতকের বৃক্ষ বলে খ্যাতি পেয়েছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক এই উদ্ভিদটি সম্পর্কে।

নিমের কোনো ইংলিশ নাম নেই। সারা পৃথিবীতে নিম গাছটিকে ‘নিম’ নামেই চেনে। এর ইংরেজি নামই হলো ‘Neem’। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Azadirachta Indica*

নিমকে নিম্ব, ভেপা, তামার আরও আরও অনেক নামে ডাকা হয়। নিম আমাদের এক বিশেষ উপকারী বন্ধু বৃক্ষ। নিমের জনপ্রিয়তা সে অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। নিমের পাতা থেকে বাকল, শিকড় থেকে ফুল, ফল থেকে বীজ সবগুলোই আবশ্যকীয়ভাবে কাজে লাগে।

নিমগাছ সাধারণত ইন্ডিয়ান উপমহাদেশেই পাওয়া যায়। তবে এই গাছের মধ্যে এমন কী রয়েছে যা অন্য ৬ হাজার প্রজাতির গাছের থেকে একে বেশি গুরত্বপূর্ণ বলা হয়?

নিম (বৈজ্ঞানিক নাম: *Azadirachta Indica*) একটি ঔষধি গাছ যার ডাল, পাতা, রস সবই কাজে লাগে। নিম একটি বহুবর্ষজীবী ও চিরহরিৎ বৃক্ষ। আকৃতিতে ৪০-৫০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এর কাণ্ডের ব্যাস ২০-৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। ডালের চারদিকে ১০-১২ ইঞ্চি যৌগিক পত্র জন্মে। পাতা কাস্তের মত বাকানো থাকে এবং পাতার কিনারায় ১০-১৭ টি করে খাঁজযুক্ত অংশ থাকে। পাতা ২.৫-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। নিম গাছে এক ধরনের ফল হয়। আঙুরের মতো দেখতে এই ফলের একটিই বীজ থাকে। জুন-জুলাইতে ফল পাকে এবং কাঁচাফল তেতো স্বাদের হয়। তবে পেকে হলুদ হওয়ার পর মিষ্টি হয়।

নিম বাংলাদেশের সর্বত্র দেখা গেলেও উত্তরাঞ্চলে বেশি পাওয়া যায়। বলা হয় এর আদি নিবাস বাংলাদেশ, ভারত আর মিয়ানমারে। এ গাছটি বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান সৌদি আরবে জন্মে। বর্তমানে এ উপমহাদেশেসহ উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলীয় সবদেশেই নিমগাছের বিভিন্ন প্রজাতি ছড়িয়ে আছে। সৌদি আরবের আরাফাত ময়দানে বাংলাদেশের নিম গাছের হাজার লাখো সংখ্যা আমাদের গর্বিত করে। বলা হয় কেউ যদি নিমতলে বিশ্রাম নেয় কিংবা শুয়ে ঘুমায় তাহলে তার বিমার কমে যায় সুস্থ থাকে মনেপ্রাণে শরীরে অধিকতর স্বস্তি আসে। এজন্য ঘরের আশপাশে দু-চারটি নিমের গাছ লাগিয়ে টিকিয়ে রাখতে হয়।

নিমকে যে গুণটি অন্য সব উদ্ভিদের প্রজাতি থেকে বেশি গুরত্ব দেয়, তা হলো এর পোকামাকড় ও ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে টিকে থাকার ক্ষমতা। নিমের ছাল, ফুল, ফল, বীজে ও তেলে বিভিন্ন ধরনের তিক্ত উপাদান যেমন: স্যাপোনিন, এলকালয়েড নিমবিডিন, নিম্বন, নিম্বিনিন, নিম্বডল, ট্রাইটারপেনয়েড, সালনিন, এজাডিরাকটিন, জৈব এসিড, মেলিয়ানোন, নিম্বোলাইড, কুয়ারসেটিন ও গ্লাইকোসাইড, ট্যানিন, মারগোসিন, এজমডারিন এসব থাকে। এসব উপাদান ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধে করে। আবার, পোকামাকড়রা এই তিক্ত উপাদানগুলোর জন্য নিমগাছে ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তাই নিম গাছের কাঠের তৈরি আসবাবপত্র অন্য যে-কোনো উদ্ভিদের কাঠ দিয়ে তৈরি আসবাবের চাইতে বেশিদিন ভালো থাকে।

নিম বা ইন্ডিয়ান লাইলাক (*Indian Lilec*) প্রাপ্ত বয়স্ক হতে প্রায় ১০ বছর সময় লাগে। এটি হচ্ছে সাধারণ নিম। এছাড়া আরও ২ প্রকার নিম আছে যা হচ্ছে মহানিম বা ঘোড়ানিম যার উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Melia sempervirens* এটি সাধারণ নিমের মতো বহু গুণে গুণান্বিত নয়। অপরটি হলো মিঠো নিম, এটি তেমন তেতো নয়, এর উদ্ভিদতান্তিবত নাম হচ্ছে *Azadirachta Siamensis* এটি আমাদের দেশের পাহাড়ি অঞ্চল মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডে পাওয়া যায় এবং সবজি হিসেবেও এর বহুল ব্যবহার প্রচলিত।

নিম যেহেতু ব্যাক্টেরিয়ার বংশবৃদ্ধি করতে দেয় না, তাই এর বহুল ব্যবহার আছে। এটা চেহারা সুন্দর রাখতে সাহায্য করে। চেহারায় দাগ, একনি বা ব্রোন হওয়া থেকে রক্ষা করে চেহারার মসৃণতা বজায় রাখে। নিম পরিবেশ রক্ষা, দারিদ্র্যবিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রাখে; নিম থেকে উৎপাদিত হয় প্রাকৃতিক প্রসাধনী, ওষুধ, জৈবসার ও কীটবিতাড়ক উপাদান; নিম স্বাস্থ্য রক্ষাকারী, রূপচর্চা, কৃষিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়; নিমকাঠ ঘুণে ধরে না, নিমের আসবাবপত্র ব্যবহারে ত্বকের ক্যান্সার হয় না; নিম পানি স্তর ধরে রাখে শীতল ছায়া দেয় ও ভাইরাসরোধী। এমনিতেই কি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে tree of the 21st century বলে আখ্যায়িত করেছে!

পিঁপড়ার রাজ্য

মো: সিয়াম ইসলাম

পিঁপড়া দেখেনি এমন মানুষ অবশ্যই জন্মান্ধ। পিঁপড়া দেখার পর তাদের গতিবিধি কখনো অল্প হলেও আগ্রহসহকারে পর্যবেক্ষণ করেনি এমন মানুষও খুঁজে পাওয়া বিরল। আমাদের খুব নিকটেই বিভিন্ন রকমের পিঁপড়ার চলাচল সদা ঘটমান। আপনি যদি তাদের রাজ্যে যান, তাহলে অনেক আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করবেন,কতটা বৈচিত্র্য। পিঁপড়ারা তো বিশাল দল আকারে থাকে। হাজার হাজার পিঁপড়া একসাথে বাস করে। সবাই মিলে বাসা তৈরি করে, রাতদিন পরিশ্রম করে। না, ভুল বললাম, সবাই পরিশ্রম করে না। মৌমাছির জীবনযাপন সম্পর্কে অনেকেই ধারণা রাখেন। সেরকম খানিকটা পিঁপড়াদের ক্ষেত্রেও। সাধারণত পিঁপড়াদের মাঝে তিনটি শ্রেণি বিদ্যমান। যথা:

শ্রমিক পিঁপড়া
রানি পিঁপড়া
পুরুষ পিঁপড়া

আমরা যেগুলোকে দলবেঁধে মাটি কেটে বাসা তৈরি করতে দেখি,পাতাকে মোড়ে বাসা তৈরি করতে দেখি,খাদ্য সংগ্রহ করতে দেখি, এগুলো সবাই শ্রমিক পিঁপড়া বা কর্মী পিঁপড়া। পুরুষ পিঁপড়াদের আকার কর্মী পিঁপড়াদের চেয়ে খানিকটা বড়ো। রানি পিঁপড়াদের আকার আবার পুরুষদের চেয়ে খানিকটা বড়ো। এখানে রানি বলার সময় কিন্তু বহুবচন ব্যবহার করছি। তারমানে একটা দলে অনেকগুলো (কয়েকশো) রানি থাকে। ঠিক সেরকম অনেকগুলো পুরুষ পিঁপড়াও থাকে।

রানি পিঁপড়া এবং রাজা (পুরুষ) পিঁপড়ার লিঙ্গ নির্ধারণ তো নাম থেকেই ক্লিয়ার। কিন্তু কর্মী পিঁপড়াদের লিঙ্গ কী হতে পারে? আন্দাজ করে বলার মতো প্রশ্ন না! কর্মী

পিঁপড়ারা সব্বাই পুরুষ। কিন্তু অবস্থা বিশেষে কর্মী পিঁপড়ারাও প্রজনন ঘটাতে পারে! দলে রানির অভাবে কর্মী সংখ্যা কমে গেলে, কর্মীরাই কর্মী জন্ম দিতে পারে! পিঁপড়াদের প্রজনন অনেকটাই বৈচিত্র্যময়।
পুরুষ পিঁপড়া এবং রানি পিঁপড়ার ডানা থাকে, এরা উড়তে পারে।কর্মী পিঁপড়াদের ডানা থাকে না। উড়তে উড়তে রাজা-রানির মিলন ঘটে । রাজা তথা পুরুষ পিঁপড়াগুলো আর বাসায় ফিরে আসে না। রানি পিঁপড়া নিকটস্থ বাসায় আশ্রয় নেয়, সেখানে ডিম পাড়ে,দুইএক দিনের মধ্যেই ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়,রানির ডানা গুলোও ঝরে পড়ে। ডিম থেকে যে বাচ্চাগুলো হয়,সেগুলো সব শ্রমিক শ্রেণির। পুরুষের সাথে মিলন ব্যাতি রেখেও রানি পিঁপড়া ডিম দিতে পারে এবং সেগুলো থেকে বাচ্চাও হয়। মিলন ব্যতি রেখে যে বাচ্চা হয়, সেগুলো কখনই রানি পিঁপড়া হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। মিলনের দ্বারা নিষিক্ত হয়ে যে বাচ্চাগুলোর জন্ম হয়,সেগুলোর মাঝে কিছু বাচ্চাকে রানিতে পরিনত করা হয়।

শ্রমিক পিঁপড়াগুলোর দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে বলে মনে হয় না। প্রতিটা বাচ্চার জন্য শ্রমিক পিঁপড়া নিযুক্ত হয়, এরা অনেক দূরদূরান্ত থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এনে শ্রেষ্ঠাংশ প্রথমে বাচ্চাদের খাওয়ায়,তারপর রাজা-রানিকে খাওয়ায়। তারপর যদি অবশিষ্ট যা থাকে তা নিজেরা ভাগাভাগি করে খায়। এছাড়া এরা কখনোই আগে আগে ভক্ষন করে না। খাবারের অভাবে মারা গেলেও খায় না। বোকা পিঁপড়া খাদ্য নিয়ে বাসায় আসার সময় বা খাদ্য সংগ্রহ করার সময়ই খানিকটা খেয়ে নিলেও ত পারতো! কিন্তু এতোটাই কর্তব্য পরায়ণ যে নিজের একটামাত্র জীবনকেও বিসর্জন দেয়।এরকম কর্তব্য পরায়ণ যদি আমাদের সভ্য মানুষগুলো হতো।

অনেক কষ্টে খাবার সংগ্রহ করে আনলেও এরা সম বণ্টন করতে পারে না। কেও কম পায়,কেও আবার বেশি পায়। যেমনটা আমাদের সরকারের বরাদ্দ বেশি থাকলেও জনগণের মধ্যে সম বণ্টন করা হয় না। কেও আঙ্গুল ফুল কলা গাছ,কেওবা জীবন বাঁচাতে করে বৃক্ষবাস।

যে বাচ্চাগুলোকে বারংবার খাওয়ানো হয়,তারা অধিক পরিপুষ্ট হয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে আকৃতিতে কিছুটা বড় হয়,মানে প্রজননক্ষম পুরুষে পরিণত হয়। পুরুষ পিঁপড়া এবং রানি পিঁপড়াগুলো অনেক সুখে থাকে, কোনো কাজ করতে হয় না,খাবারের খুজে ভবঘুরেও হতে হয় না, সবকিছু মুখের কাছে পেয়ে যায়,,,রাজা-রানি বলে কথা! এরা বাইরেও ঘুরাঘুরি করে না। সারাক্ষণ সিংহাসনে বসে থাকে।
সিংহাসনের আলাপ উঠলো যেহেতু,সেহেতু এদের প্রাসাদ তৈরি সম্পর্কেও খানিকটা জানা যাক। এদের প্রাসাদ তৈরি করা আমরা অনেকেই দেখেছি। রাতদিন একাকার করে কর্মী পিঁপড়াগুলো পরিশ্রম করে। অমানবিক পরিশ্রম করে (অরা ত মানুষ না, সেজন্যই অমানবিক পরিশ্রম করতে পারে)।

পিঁপড়াদের মাটি কেটে প্রাসাদ নির্মান করার চেয়ে গাছের পাতায় প্রাসাদ নির্মান করার ব্যাপার টা অনেক ইন্টারেস্টিং। লাল পিঁপড়ারা গাছের পাতা মুড়ে বাসা তৈরি করে । গুটিকয়েক পিঁপড়া ত আর একটা আস্ত পাতাকে কুঞ্চিত করতে পারে না। শতশত পিঁপড়া একত্রে বড় ধরনের বল প্রয়োগ করে।
বাচ্চা পিঁপড়াদের মুখ থেকে একধরনের সূতার মতো জিনিস বের হয়,যেটা দিয়ে শ্রমিক পিঁপড়াগুলো দুইটা পাতা একত্রে জুড়ে দেয়। শতশত পিঁপড়া পাতা টেনে কাছাকাছি আনে,আর কিছু পিঁপড়া সেগুলো সেলাইয়ের কাজ করে।
আচ্ছা, হঠাৎ যদি সেই দর্জি পিঁপড়াগুলো সেলাই না করে বাসায় চলে যায় বা দুষ্টামি করে বসে থাকে,তাহলে কি ঘটবে? যে শ্রমিকগুলো পাতা টেনে ধরে আছে,সেগুলো রেগে গিয়ে দর্জিদেরকে পিটানো শুরু

করবে? দল থেকে বহিষ্কার করবে? বলবে যে,আমাদের টেনে ধরে থাকতে কষ্ট হচ্ছে,দ্রুত পাতা দুটোকে জোড়া লাগা!

না,ব্যাপার টা যা ঘটে, তা খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং।
দর্জি পিঁপড়াগুলো অলস বসে থাকলেও, শ্রমিকরা সেটা নিয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। অরা পাতাগুলোকে টেনেই ধরে থাকে। একসময় শরীরের শক্তি শেষ হয়ে যায়,নেতিয়ে পড়ে, তাও সর্বোচ্চ চেস্টা থাকে আঁকড়ে ধরে থাকার। সমস্ত শক্তি হারিয়ে অনেকই সেখানে মারাও যায়। অদের লক্ষ্য তখন একটাই , তা হলো,পাতা দুটোকে একত্রে জুড়ে দেওয়া। লক্ষ্য অর্জনের জন্য যদি আমরা মানুষদেরও এরকম দৃঢ প্রচেষ্টা থাকে,সফলতা পালিয়ে যাবে কই?

পিঁপড়ারা কিন্তু সবসময় এতো সুশৃঙ্খলভাবেও থাকে না। খাবারের জন্য বা অন্য কোনো কারণে এরা যুদ্ধও করে। একজন আরেকজনকে কামড় দেয়। হাত পা শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এখানেও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ঘটে। যদি একটা পিঁপড়া অন্য আরেকটা পিঁপড়াকে কামড় দেয়,আর কামড় খাওয়া পিঁপড়াটা আক্রমণকারী পিঁপড়ার শরীর কেটে বিচ্ছিন্ন করলেও, আক্রমণকারী পিঁপড়া কামড় ছেড়ে দেয় না। বিজেতাকে সেই অংশ সারাজীবন বহন করতে হয়। এদের কনশাসনেস নাই বল্লেই চলে, যেকারণে জীবনবাজি রেখে এসব করতে পারে!

এখন অন্য আরেকটা জিনিস খেয়াল করি। এদেরকে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি, সারিবদ্ধভাবে সামনে অগ্রসর হচ্ছে বা কোথাও খাবারের সন্ধান পেলে দলকে সেটার খবর দেওয়ার জন্য বাসায় আসে বা অন্য পিঁপড়াকে জানান দেয় এবং পুনশ্চ সেই আগের খাদ্যাবস্থানে ফিরে আসে। এতো ছোটো একটা জীব কীভাবে এটা স্মরণ রাখে?
পিঁপড়ের শরীর থেকে ফেরোমোনেস (Pheromones) নামক এক ধরনের গন্ধযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ বের হয়। যখন ওরা কোথাও যায় তখন সারা রাস্তায় ওটা লেগে থাকে। ফেরার সময় সেই গন্ধ শুকে শুকে পিপঁপড়ারা কলোনিতে ফিরে আসে।
পিঁপড়ার শরীরের অল্প কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্যও জানা যাক।
পিঁপড়াদের কোনো ফুসফুস থাকে না। ক্ষুদ্র এক ছিদ্র দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন-ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। পিঁপড়াদের রক্তের কোন রং নেই। তাদের হৃদপিন্ড অনেকটা লম্বা টিউবের মতো। তাদের রক্তে এক ধরনের রস থাকে যা হৃদপিন্ড পরিশোধন করে আবার মাথায় ফেরত পাঠায়। পিঁপড়ার স্নায়ুতন্ত্র দীর্ঘ স্নায়ু তন্তু দিয়ে গঠিত। এটা অনেকটা মানুষের মেরুদণ্ডের ভেতরের স্পাইনাল কর্ডের মতো কাজ করে।

এবার পিঁপড়ার পরিচয় টা দেখে নেওয়া যাক, নচেৎ অন্য কারো কাছে বর্ণনা করার সময়, সচকিত না করলে চিনবেই না।

Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Insecta
Order: Hymenoptera
Sub-order: Apocrita
Family: Fermicid

ট্রগনের নতুন প্রজাতির সন্ধান

অনুবাদক: আসাদুল্লাহ ভূঁইয়া শুভ

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রাজিল ও প্যারাগুয়ের একদল পাখিবিশারদ সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব ব্রাজিলের আটলান্টিক বনাঞ্চলে ট্রগনের সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির পাখি শণাক্ত করেছেন।

Trogon ও তাদের নিকট আত্মীয় Quetzal হলো pantropically বা সর্বক্রান্তীয় অঞ্চলে [উভয় গোলার্ধের সকল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জৈবভৌগলিক অঞ্চল] বিস্তৃত Trogoniformes বর্গের Trogonidae গোত্রের সদস্যবৃন্দ। এই গোত্রের আওতায় কমপক্ষে ৪৩ টি প্রজাতি ও ১০৯ টি উপপ্রজাতি অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবীর সবচেয়ে রঙিন ও বর্ণিল পাখিদের মধ্যে এরা অন্যতম: পুরুষ ট্রগনের মাথা ও ঘাড় চিত্রাভ সবুজ,

নীল ও বেগুনি এবং তলপেট হালকা লাল, হলুদ অথবা কমলা রঙে আবৃত; স্ত্রী ট্রগনের পালক ধূসর অথবা কমলায় রাঙা থাকে।

নিওট্রপিক অঞ্চলে [আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার সমভাবাপন্ন জৈবভৌগলিক অঞ্চল] এদের বৈচিত্র্য সর্বাধিক লক্ষণীয় কেননা, কেবল এ অঞ্চলেই এদের ২৪টি প্রজাতি ও ৬৬টি উপপ্রজাতির বসবাস।

এদেরই একজন তথা কালো-গলা ট্রগন (Trogon rufus) পলিটাইপিক প্রজাতির [দুই বা ততোধিক উপপ্রজাতি রয়েছে এমন] বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে কিন্তু এই শ্রেণিবিন্যাস অনেকাংশেই জটিল ও সমালোচিত।

১৭৮৮ সালে এটি প্রথম শনাক্ত ও নথিভুক্ত হয় এবং বর্তমানে এদের হন্ডুরাস থেকে উত্তর আর্জেন্টিনার আর্দ্র বনাঞ্চলের নীচুভূমি ও মধ্যস্তরে পাওয়া যায়।

সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান জাদুঘরের গবেষক জেরেমি কেনিথ ডিকেন্স ও তার সহকর্মীরা এ বিষয়ে বলেন, "*Trogon rufus* কে এর অনন্য রঙ সমাবেশের (পুরুষের সবুজ মাথা ও স্ত্রীর বাদামি মাথা এবং হলুদ পেট) জন্য অন্যান্য সমগণের সদস্যদের থেকে সহজেই পৃথক করা যায়।"

"তবে বিস্তৃতিভেদে আরো অনেক বৈশিষ্ট্য পরবর্তীতে যোগ হওয়ায় অচিরেই এর বৈচিত্র্য বাড়ে এবং এই সূক্ষ্ম ফারাক আর কাজে দেয় না। "

একটি নতুন গবেষণায় গবেষকেরা ১৭টি জাদুঘর থেকে ৯০৬ টি ট্রগনের নমুনা (৫৪৭ টি পুরুষ ও ৩৫৯ টি স্ত্রী) পরীক্ষা করে নতুন চিত্র পান।
তারা বলেন, "আমরা এদের [ট্রগনের] শারীরবৃত্তীয়, কণ্ঠ্য ও জেনেটিক ডাটাসেটের (যার মধ্যে এদের ডোরাকাটা পালকের বর্ণালি বিশ্লেষণ ও ডিজিটাল চিত্র পরিমাপন অন্তর্ভুক্ত) সমন্বয় করে আধুনিক প্রজাতির ধারণা অনুযায়ী এদের প্রজাতিক সীমা মূল্যায়ন ও নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করি।"

তারা আন্তঃপ্রজাতি প্রজননের (interbreeding) অভাব, জেনেটিক divergence [একই পূর্বপুরুষ

প্রজাতি থেকে দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব] ও প্রজাতি শনাক্তকরণে স্বভাবগত divergence থেকে প্রজনন বিচ্ছিন্নতার (reproductive isolation) প্রমাণ পায় এবং তা থেকে কালো গলা ট্রগনের ৫ টি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী চিহ্নিত করে।

এদের ৪টি গোষ্ঠীরই এর মধ্যে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক নাম রয়েছে :

১. the Amazonian black-throated trogon (*Trogon rufus*)

২. the southern black-throated trogon (*Trogon chrysochloros*)

৩. the graceful black-throated trogon (*Trogon tenellus*)

8. the Kerr's black-throated trogon (*Trogon cupreicauda*)

পঞ্চম গোষ্ঠীটি ব্রাজিলের আলাগোয়াস প্রদেশের আটলান্টিক বনের পাহাড়গুলোতে দেখা যায়, যারা অভূতপূর্ব অঙ্গসংস্থানিক, কণ্ঠ ও মাইটোকন্ড্রিয়াল DNA চরিত্রাবলির অনন্য সমাবেশ প্রদর্শন করেছে এবং সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সবুজ মাথা ও সিটরাস-হলদে পেটযুক্ত Alagoas black-throated trogon (Trogon muriciensis) নামের এই ট্রগনটি অন্য সব কালো-গলা ট্রগন থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী।

আলাগোয়াস প্রদেশের আটলান্টিক বনের মধ্যভাগে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০০ মি. উঁচুতে Murici Ecological Station এ অবস্থানের দরুন এদের এরূপ নামকরণ।

ধারণা করা হয় বন নিধনের পূর্বে Endemism এর Pernumbuco Centre জুড়ে এদের সুবিস্তীর্ণ বসবাস ছিল।

এ পর্যন্ত দেখা এ প্রজাতির ২০ টি পাখির সবগুলোই এই অঞ্চলের হওয়ায় এদের সংরক্ষণ অবস্থা সংকটজনক। তাছাড়া এ অঞ্চলে ৩০ বর্গকিমিরও কম প্রাণীর বাসযোগ্য বনভূমি থাকায় তারা এ প্রজাতিটিকে সংকটজনক হারে বিপদগ্রস্ত চিহ্নিত করার সুপারিশ করেন।

এ আবিষ্কারটি Zoological Journal of the Linnean Society তে প্রকাশিত হয়েছে।

কিউট Puff Ball

রাকিন শাহরিয়ার

Puff ball খুব কিউট, তাই না?

কী ball বললি?

- আরে, পাফ বল। নাম শুনিসনি?

জিনিসটা কী? আর এই পাফ টাফ এসব মানে কী?

- সোজা বাংলায় Puff মানে হচ্ছে ফুৎকার। মুখ দিয়ে যে ফুঁ দেও, ওইটাই Puff। Puff ball মূলত এক ধরনের মাশরুম। এদের শুকনো ও পাউডারযুক্ত পূর্ণবয়স্ক গোলাকার শরীরে নাড়া দিলে স্পোরের ফুৎকার বা puff বের হয়। তাই এর নাম Puff ball। দাঁড়া, গুগল থেকে আরো কিছু তথ্য বলি। এরা মূলত fungi রাজ্য এবং Basidiomycota পর্বের অন্তর্ভুক্ত। Puff ball কোনো একটা প্রজাতি নয়, বরং তারা মাশরুমের একটা বড়ো গ্রুপ যার মধ্যে বিভিন্ন গণ যেমন- Bovista, Calvatia, Handkea, Lycoperdon, and Scleroderma ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

কীরে ভাই! এভাবে রোবটের মতো উত্তর দেস কেন? আর এইসব রাজ্য-ফাজ্যের কথা জেনে আমার লাভ কী? মেইন কথা বললেই তো হয়!

- আরে ধুর! গুগল থেকে উত্তর দিতেছি তো। তাই শুনতে রোবটের মতো লাগতেছে। আর ভাই, গুগলে ঢুকলে আমার হুঁশ থাকে না। অনেক অতিরিক্ত তথ্যও পড়ে ফেলি।

ওরে আমার পড়ুয়া রে! মেইন বই পড়ার নাম নাই, আইছে গুগলের তথ্য পড়তে! আচ্ছা, বাদ দে। বল

দেখি, এই পাফ না টাফ না কী জানি, এগুলারে চিনব কীভাবে?

- কোনো একটা মাশরুম Puff ball কিনা বুঝতে চাইলে একে অর্ধেক করে কেটে ফেলতে হবে। ভেতরের অংশ যদি মোটা, কঠিন আর রিন পাওয়ার হোয়াইটের মতো সাদা থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে এটা Puff ball। এদের দেখতে অন্য যে-কোনো মাশরুমের চেয়ে ভিন্ন কারণ এদের মাশরুমের মতো ক্যাপ নেই। প্রকৃতিতে এদের সহজেই শনাক্ত করা যায় যেহেতু এরা মোটামুটি সাইজে বড়ো, গোল ও সাদা এবং ভেতরে সাদা বাদে অন্য রংও থাকে না। এর স্পোরগুলো ভেতরের অংশে গ্লিবা নামক অঙ্গ তৈরি করে। এরা যখন বয়স্ক হতে থাকে, তখন এই গ্লিবার মাঝের অংশটা হলুদ বা সবুজ হয়ে যেতে পারে।

ধুর ব্যাটা! তোরে কি এসব গ্লিবা-টিবার কথা জিজ্ঞেস করছি? অতিরিক্ত তথ্য বাদ দে। আমারে বল, এই পাফ বল কি খাওয়া যায়?

- সত্যিকারের Puff ball-দের খাওয়া যায় যদি অল্পবয়স্ক অবস্থায় ধরতে পারা যায়। শুধু অল্পবয়স্কগুলোই খাওয়া যায়। যদি নরম, খয়েরি টাইপের অথবা ভেতরে অনেক স্পোর থাকে, তাহলে সেটা বয়স্ক; খাওয়ার অযোগ্য।

এগুলোকে পাব কোথায়?

- পাফ বলেদের সাধারণত খোলা ঘাসের মাঠে পাওয়া যায়। তারা লন এবং গল্ফ মাঠের মতো সুন্দর মাঠগুলোতে থাকতে পছন্দ করে। তবে কখনো কখনো এদের বৃহৎ গাছের নিচে ঝোপঝাড়েও পাওয়া যেতে পারে। পাফ বল কখনো গাছে বা গাছের গুঁড়িতে জন্মায় না, শুধুই মাটিতে জন্মায়। তাই গাছের সাথে কোনো মাশরুম পেলে সেটা পাফ বল নয়।

Puff ball-গুলোর স্পোর একটু নাড়াচাড়াতেই হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে আর স্পোর থেকেই নতুন পাফ বল হয়, তাই এগুলো প্রতি বছর বেশ ভালোই জায়গা পরিবর্তন করে। তাই প্রতি বছর এদের একই মাঠে নাও পাওয়া যেতে পারে, যদি বাতাস বেশি থাকে।

তুই আমার প্রশ্ন বুঝস নাই। আমি জানতে চাইছিলাম যে এদের কোন অঞ্চলে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে পাওয়া যায় না?

- Calvatia gigantea হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে কমন ধরনের পাফ বল। এগুলোকে পুরো ইউরোপজুড়ে ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে পাওয়া যায় না।

ধুর! তাইলে লাভ হলো কী! যদি কোনোদিন বিদেশে যাই, তাহলে খাওয়া যাবে। হাহ! দিবাস্বপ্ন! আচ্ছা, এদের পাওয়া যায় কখন?

- পাফ বল খেতে চাইলে আগস্ট থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যেই খোঁজা উচিত কারণ মোটামুটি এই সময়ের মধ্যেই এদের পাওয়া যায়।

অক্টোবর? অক্টোবরে না তোর জন্মদিন? তুই পাফ বল ট্রিট দিতে পারলে কী যে ভালো হতো!

- এহ! শখ কত! ওয়েট, একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য পেলাম। অন্য যে-কোনো জীবিত জিনিসের চেয়ে বেশি পরিমাণে স্পোর উৎপাদন করার রেকর্ড আছে এই পাফ বলের। একটা গড়পরতা পাফ বল সাত ট্রিলিয়নের কাছাকাছি স্পোর তৈরি করতে পারে। তবে এদের অঙ্কুরোদগম হার খুবই কম। এক ট্রিলিয়ন স্পোরের মধ্যে মাত্র একটা পাফ বল হিসেবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।

বুঝছি, খুব ইন্টারেস্টিং তথ্য দিছস। আর লাগবে না। এই পাফ বলের কি চাষ-টাষ হয় না?

- পাফ বল বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা কঠিন কারণ এরা অন্য মাশরুমের থেকে একটু ভিন্নভাবে বেড়ে ওঠে। তবে করা সম্ভব। কীভাবে সম্ভব বলি।

না না না.... লাগবে না। তার চেয়ে বল যে এই জিনিস খায় কেমনে? মানে রান্না করে কেমনে?

- পাফ বলকে মাখনে মাখালে এটা সুন্দর সোনালী রং ধারণ করে। এদের রান্না করার সময় কিউবাকারে কাটা হয়। ডিম-দুধের সাথে পাফ বল মিলিয়ে রুটির টুকরায় কিছুটা নুন ও গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে নাকি অনেক সুস্বাদু লাগে।

তাই না কি? কেমন সুস্বাদু? মানে স্বাদ কেমন এদের?

- কেউ কেউ বলে পাফ বলের স্বাদ অনেক সমৃদ্ধ, বাদাম টাইপের অথবা কিছুটা মাটির মতো; মাশরুমের থেকে যে ধরনের স্বাদ আশা করা যায়। আবার অন্যরা বলে যে পাফ বলের আসলে নিজস্ব কোনো স্বাদ নেই। অন্য যে উপাদানের সাথে এদের রান্না করা হয়, এরা সেই উপাদানের স্বাদই শোষণ করে।

ব্যাটারা এখনো স্বাদই নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না। কী যে অবস্থা! বত্ব, আরেকটা প্রশ্ন মাথায় এলো। এগুলা কি হেলথি? না কি ফাস্টফুডের মতো জাঙ্ক?

- পাফ বল থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। এরা প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ ও আরো ম্যাক্রো উপাদানের উৎস।

খাওয়া ছাড়া এগুলা দিয়ে আর কিছু করে না?

- পাফ বল মাশরুমে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন স্পোর থাকে যা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে যদি এদের দেহ কিছুটা ভাঙে বা নাড়াচাড়া পায়। অনেককাল আগে এই স্পোরগুলো নেটিভ আমেরিকানরা রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে ও ইনফেকশন থামাতে ব্যবহার করত। এগুলো মানুষ এবং অন্য পশুপাখিতেও ব্যবহার করা হতো। একসময় তিব্বতে এই পাফ বল দিয়ে কালি তৈরি করা হতো।

তথ্য শেষ?

- তোর আর প্রশ্ন না থাকলে শেষ।

ওয়েট ওয়েট আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমরা এখানে করছিটা কী? কেন এসেছি এখানে?

- আমরা এখানে এসেছি পাফ বল নিয়ে ডায়লগবাজি করতে। পাঠককে আর্টিকেল গেলানোর জন্য লেখক আমাদের দুজনকে পয়দা করেছে।

আমরা তাহলে শুধুই কল্পনা! আচ্ছা, আমি আমার নাম মনে করতে পারছি না কেন?

- কারণ লেখক ব্যাটায় এতই অলস যে আমাদের নামই দেয়নি।

আচ্ছা, এখন তো আর্টিকেল শেষ। এখন আমাদের কাজ কী?

- যেভাবে র‍্যান্ডমভাবে এসেছি, সেভাবে র‍্যান্ডমভাবে চলে যাব। পাফ বলের স্পোরের মতো হাওয়া হয়ে যাব। ফুস!
আরে! গেল কোথায়! ধুর! আমিও যাই। আবার লেখক ব্যাটায় নতুন কিছু লিখলে আমাদের নিয়ে আসবে। ততদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকি।

ঢাকাই ব্যাং

অনামিকা ইসলাম অনামিকা

ঢাকার অনেক জিনিসই তো প্রসিদ্ধ। ঢাকাই মসলিন, ঢাকাই হালিম, ঢাকাই কাচ্চি, আবার ঢাকার ইতিহাস ঐতিহ্য আর দর্শনীয় স্থানও ঢাকাবাসীদের গর্বের জিনিস! যাদের বাড়ি ঢাকার বাইরে, তাদের কাছে ঢাকাই আত্মীয়স্বজনরাও যেন বিশেষ মেহমান! কিন্তু ঢাকার আরেকটা বিশেষ উপাদান হচ্ছে ঢাকাইয়া ব্যাং। দুনিয়ায় কত ব্যাং! কোনো ব্যাং হারিয়ে গেছে, আবার নতুন প্রজাতির অনেক ব্যাং বিবর্তিত হচ্ছে। এই ঢাকাইয়া ব্যাং শুধু ঢাকায় পাওয়া যায়। তবে ঢাকার বাইরেও অল্পবিস্তর থাকতে পারে। তবে এদের মূল আবাসভূমি ঢাকাতেই। ব্যাং তো নানান জাতের নানা রঙের, পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে এই ঢাকাইয়া ব্যাং হচ্ছে বিশেষ এক জাতের ব্যাং। এর বৈজ্ঞানিক নাম Zakerana Dhaka. এই নামের পেছনেও আছে ইতিহাস।

ঢাকাই ব্যাং বলে এর প্রজাতির নাম ঢাকা আর এর গণ হচ্ছে জাকেরানা। জাকেরানা নামটা শুনতে কেমন দেশি দেশি লাগছে না? হ্যাঁ দেশিই বটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা কাজী

জাকের হোসেনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এই গণের নাম জাকেরানা রাখা হয়েছে।

এই গণের আরো অনেক প্রজাতির ব্যাং আছে, তবে এই ব্যাংটি তার সমগোত্রীয় অন্যান্য ব্যাংদের চেয়ে বেশি অভিযোজনক্ষম। ২০১৬ সালে এটির আবিষ্কার করেন বাংলাদেশি তরুণ বিজ্ঞানী সাজিদ আলী হাওলাদার। গবেষণার জন্যে তিনি গণভবন এবং জাতীয় সংসদের নিকটবর্তী এলাকা থেকে এর নমুনা সংগ্রহ করেন। কারণ এই এলাকাতেই ব্যাংটির প্রথম সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া শাহবাগ আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেও বর্ষাকালে এই ব্যাং দেখা যায়। আমাদের সবার ধারণা, ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, যেখানে দূষণের মাত্রা একেবারে অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে, সেখানে কোনো নতুন প্রাণী তো দূর, পুরনো প্রাণীরাই টিকতে পারবে না। সেখানে ঢাকাতেই পাওয়া যায় এই নতুন প্রজাতির ব্যাং। এর আগে সর্বশেষ ১৮৬০ সালের দিকে ব্রিটিশ প্রাণী বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম থিওল্যান্ড ঢাকার এক জলাধার থেকে নতুন প্রজাতির শামুক আবিষ্কার করেন। এর দেড়শো বছর পর সাজিদ আলী হাওলাদার এই নতুন প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কার করেন। এই ব্যাং আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসের বিপরীতে পরিবর্তিত

প্রতিকূল পরিবেশেই জীবের অভিযোজনক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে তাদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশার আলো দেখা যায়।

শাপলা-শালুক-পদ্ম

মেহের সায়মা

তুমি সুতোয় বেঁধেছ শাপলার ফুল
নাকি তোমার মন?
আমি জীবন বেঁধেছি মরণ
বেঁধেছি ভালোবেসে সারাক্ষণ
-হাজার বছর ধরে - জহির রায়হান

অনন্য সুন্দর এই ফুলের শুভ্রতার চাদর যখন ঢেকে রাখে জলাশয় তখন মন অজান্তেই গুনগুনিয়ে উঠে। বাংলাদেশের হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর, জলাশয়ে জন্মানো হাইড্রোফাইটসদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শাপলা বা শালুক ফুল, পদ্ম, পদ্মখোঁচা, ইত্যাদি। এগুলো আবার মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান হাইড্রোফাইটস বা জলজ উদ্ভিদ।

[এসব উদ্ভিদের মূল জলাশয়ের পানির নিচে মাটিতে সংযুক্ত হলেও দীর্ঘ বোঁটার কারণে পাতাগুলো পানির উপরে ভাসমান থাকে বলে এদের মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদ বলে।]

প্রথম দেখায় শাপলা আর পদ্ম দেখতে অনেকটা একই দেখালেও এরা একই রাজ্যের দুইটি ভিন্ন পরিবারের সদস্য। একটু খেয়াল করলেই এদের পার্থক্যগুলো চোখে পড়ার মতো।

সারা বিশ্বে ৫০-৬০ প্রজাতির শাপলার দেখা মিললেও বাংলাদেশে সাদা শাপলা (Nymphaea pubescens), নীল শাপলা (Nymphaea

nauchali), লাল শাপলা *(Nymphaea rubra)* এ ৩ প্রজাতির আধিক্য দেখা যায়। তবে এদের মধ্যে সাদা রঙের আধিপত্যটাই বেশি, তাই এটিকে জাতীয় ফুলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বিনা চাষে জন্মানো দেশীয় এই শাপলা-শালুক এখন বিপন্ন হওয়ার পথে। সাদা শাপলা প্রজাতি সম্পর্কে বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষের ৯ম খন্ডে (২০১০, আগস্ট) বলা হয়েছিল, আপাতত এদের তেমন কোনো হুমকি নেই কিন্তু অনবরত আবাসস্থল ধ্বংস বড়ো হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে। প্রজাতিটি সংরক্ষণে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দিনাজপুর, রংপুর বিভাগের অনেকগুলো উপজেলায় আর আগের মতো শাপলা দেখা যায় না।

শাপলা ফোঁটে রাতের স্নিগ্ধতায় কিন্তু সূর্যের আলোর সাথে তাল মিলিয়ে আস্তে আস্তে বুঁজে যায়, তাই তো এর আরেক নাম কুমুদ। গ্রামের দিকে এখনো এই ফুলকে অনেকে শালুক ফুল নামেই চিনে। তবে এই **শালুক** কিন্তু ফুল নয় বরং শাপলার গোড়ায় জন্মানো এক ধরনের গুটি যা সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।

শাপলা-শালুক বিভ্রান্তি মেটানোর আগে এই বিরুৎ জলজ উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস জেনে নেওয়া যাক।
বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিন্যাস:
বাংলা নাম: সাদা শাপলা, শালুক ফুল, কুমুদ।
ইংরেজি নাম: White water lily
বৈজ্ঞানিক নাম: Nymphaea pubescens
Kingdom: Plantae
Order: Nymphaeales
Family: Nymphaeaceae
Genus: Nymphaea
Species: N.pubescens

প্রাচীনকাল থেকে শাপলা কেবল শোভাবর্ধক ফুলই নয় বরং খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ, বন্যাকবলিত সময়ে শাপলার গোড়া বা শালুক খেয়েই অনেকে জীবন ধারণ করেন। এজন্য শালুককে গরীবের খাদ্য বলা হয়ে থাকে।

আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভারত, বাংলাদেশসহ এশিয়ার বহুদেশে শাপলা পাওয়া যায়। বিনা যত্নে এটি বেড়ে ওঠতে এবং বংশবিস্তার করতে পারে বলে বাংলাদেশের পুকুর-ডোবা, বিলে ঝিলে প্রচুর পরিমাণে শাপলা জন্মে। এদের মূলসহ উচ্ছেদ না করা গেলে এদের নির্মূল করা যায় না, তাই এরা দ্রুত আধিপত্য বিরাজ করতে পারে। সাধারণত বর্ষার শেষ হতে শরৎকাল পর্যন্ত এই ফুল ফোঁটে।

শাপলা বহুবর্ষজীবী জলজ বিরুৎ। রাইজোম সর্বদা স্টোলন বা বক্র ধাবকবিশিষ্ট (গোড়া থেকে উৎপন্ন লম্বা শাখাবিশিষ্ট অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কান্ড যার নিম্নাংশ মাটি ধরে রাখে এবং বাকি অংশ বক্রভাবে অবস্থান করে), কন্দাল মূল বিদ্যমান। এটি অজরায়ুজ উদ্ভিদ হলেও অঙ্গজ ও বীজ এই দুই মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। এটির কন্দ জলাশয়ের পানির নিচে কাঁদায় থাকে, সেটা থেকেই বোঁটা ও ফুল-পাতা গজায়। এর কান্ড ও মূল পানিতে নিমজ্জিত থাকে আর পাতা পানির উপর ভাসমান থাকে। এদের পাতা মসৃণ, স্থুল উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকার হলেও বোঁটার দিকে খাঁজ কাটা থাকে বলে কিঞ্চিৎ হৃৎপিন্ডাকৃতির মতো দেখতে। পাতার উপরের অংশ গাঢ় সবুজ হলেও নিম্নাংশ ফ্যাকাশে গোলাপি-সবুজ। পাতার দৈর্ঘ্য ১৫-৫০ × ১২-৪২ সে.মি., কিনারা ঢেউ খেলানো, পুলি পিঠার মতো কিছুটা কুঞ্চিত। এটির বোঁটা ৬০-৭০ সে.মি পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে।

সাদা শাপলার ফুলের মাঝখানে রয়েছে ভারি সুন্দর ২৫-৭০টি পুংকেশর বিশিষ্ট হলুদ পরাগ স্তবক। সুগন্ধিযুক্ত এই ফুল ৪-১৫ সে.মি. হয়ে থাকে। এর ভল্লাকার বা লম্ব-ডিম্বাকার ৪ টি বৃত্যাংশ রয়েছে যা ৩-

৯ সে.মি দীর্ঘ। এর বহিঃপৃষ্ট অণুরোমাবৃত সবুজ, ৫-৯টি সাদা শিরাবিশিষ্ট, ভেতরের গাত্র সাদা। পাপড়ির সংখ্যা ১০-২৫ টি, বাইরেরগুলো ২-৭ X ১.০-২.৮ সে.মি, উল্টো ভল্লাকার বা লম্ব-ডিম্বাকার। গর্ভাশয় ১৩-২২ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। ফল বেরি জাতের ২-৪ সে.মি। পাকলে ফল ফেটে যায় তখন ফলের কোষস্থ বীজ এর রং হয় কালচে-বাদামি সাধারণত বীজের সংখ্যা ২০০০ এর মতো হয়। তবে এই ফুল ফোটার ৯ সপ্তাহের বেশি থাকে না। ফল-ফুল সবচেয়ে বেশি ধারণ ঘটে জুন-অক্টোবর মাসে। এই ফুল ১৫°সেলসিয়াসের নিচে থাকতে পারে না।

শালুক:

শাপলা গাছের গোড়ায় একাধিক গুটির জন্ম হয় যা ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে আলু সদৃশ শালুকে পরিণত হয়। অর্থাৎ শাপলা গাছের গোড়া বা কন্দটাই আসলে **শালুক** নামে পরিচিত। একে ইংরেজি তে esculent root of water lilly বলা চলে। শক্ত, পুরু, কালো আবরণীযুক্ত এই কন্দ শুষ্ক মৌসুমে পানি শুকিয়ে গেলেও বহুদিন টিকে থাকে, বর্ষাকালে পানি ফিরে এলে যার থেকে পরবর্তীতে মূল, গাছ-পাতা গজায়। সাধারণত শরৎ-হেমন্তের শেষে শালুক সংগ্রহ করা হয়। এক একটি শালুকের ওজন ৩০-৭০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। শাপলা গাছ বা ডাটা পানির গভীরতায় ৫-২০ ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়। এতে শাপলার জলীয় উপাদান (২০.৪%) সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। এছাড়াও এতে রয়েছে শর্করা, ভিটামিন, ফাইভার, ক্যালসিয়াম, আয়রন, জিংক, সোডিয়াম। এটি সিদ্ধ করে কিংবা পুড়িয়ে খাওয়া যায়, আফ্রিকাতে এই কন্দ বা মোথা দুর্ভিক্ষের সময়ে ক্ষুধা নিবারণ এর সহযোগী হয়েছে। শালুকের স্বাদ কিছুটা আলুর মতো তবে কিঞ্চিৎ তেতো, কষ বা আঠা আঠা ধরনের। পোড়া শালুক খেতে কাঁঠালের বিচির মতো।

কেবল গ্রামে নয় শহরেও এখন শাপলা পাওয়া যায়। শাপলার পুষ্পবৃন্ত বা ডাঁটা (নাইল) সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। শাপলার ফল বা ঢ্যাপ শুকিয়ে গেলে এর থেকে চাউল আহরণ করা হয়। মূলত এই ঢ্যাপের মধ্যে থাকা দানাদার বীজগুলো দিয়েই ঢ্যাপের খৈ এবং ঢ্যাপের চালের মোয়া, মুড়কি বানানো হয়। এতে আছে ভিটামিন সি, আঁশ, ক্যালসিয়াম, আয়রনসহ নানা পুষ্টি উপাদান। পাশাপাশি এই শাপলা-শালুকে রয়েছে বিভিন্ন ভেষজ গুণাগুণ। গ্রামেগঞ্জে এখনও শাপলা ফুল নানা রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

রাইজোম গুড়া পাইলস, ডায়রিয়া, অজীর্ণ, আমাশয় রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য, পচননিবারক হিসেবে কাজ করে।

ফুলে বিদ্যমান নিমফ্যালিন, কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড হৃৎপিণ্ডের বল-বর্ধক, বুকের ধড়ফড়, জ্বর কলেরা, যকৃতের ক্ষতি প্রতিরোধে সহায়তা করে।
পাতায় মাইরিসিট্রিন, ফ্ল্যাভোন, ট্যানিক এসিড ইত্যাদি বিদ্যমান। এটি নিদ্রা ও প্রশান্তি দানে সহায়ক।

এছাড়াও শাপলা-শালুক স্নিগ্ধকারক, শীতলকারক প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, ক্ষুধা-পিপাসা নিবারক, পেট ফাঁপায় উপকারী। শালুক হজম শক্তি বৃদ্ধি করে,

চুলকানি, রক্ত আমাশয় নিরাময়, পিত্ত অম্ল ও হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা দূর করে।

পদ্ম:

স্নিগ্ধ, পবিত্র-সুন্দর, সুগন্ধযুক্ত অনন্য এক ফুলের নাম পদ্ম। এটি শতবর্ষজীবী জলজ বিরুৎ। ইতিহাস থেকে জানা যায়, উত্তর-পূর্ব চীনের একটি হ্রদের তলদেশ থেকে প্রায় ১৩০০ বছরের পুরনো বীজ হতে গাছ জন্মানো সম্ভব হয়েছে। শাপলার মতো মিঠাপানির এই জলজ উদ্ভিদটিও হাওড়-বাওড়, বিলে-ঝিলে জলাশয়ে পরিচর্যা ছাড়াই জন্মায়। শ্রাবণের শুরু থেকে শরৎকালের শেষ অবধি এই ফুলের সমাহার দেখা যেত সর্বত্র। তাই তো একে **শ্রাবণের রানি** আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অঞ্চলকে পদ্মের আদিবাস হিসেবে ধরা হয়। শাপলা আর পদ্মকে কাছাকাছি প্রজাতির মনে হলেও এরা দুটি ভিন্ন ও দূরবর্তী গোত্রের। বিশ্বে সাধারণত দুই প্রজাতির পদ্ম দেখা যায়, একটি হলো এশিয়ান পদ্ম (*Nelumbo nucifera)* অপরটি আমেরিকান পদ্ম (*Nelumbo lutea)*। হলুদ রঙের আমেরিকান পদ্ম উত্তর ও মধ্য আমেরিকার দেশীয় উদ্ভিদ।

বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিন্যাস:
বাংলা নাম: পদ্ম,কমল,পঙ্কজ,মৃণাল।
ইংরেজি নাম: Asian lotus, Sacred lotus, Indian lotus
বৈজ্ঞানিক নাম: *Nelumbo nucifera*
Kingdom: Plantae
Order: Proteales
Family: Nelumbonaceae
Genus: *Nelumbo*
Species: *N. nucifera*

এশিয়ান পদ্ম ভারতের জাতীয় ফুল। বাংলাদেশের জলাশয়ে হালকা গোলাপি ও সাদা রঙের পদ্ম বেশি দেখা যায়। সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, খাগড়াছড়ির মাটিরাঙায় এই ফুলের বিচরণ দেখা যায়। পদ্ম আগ্রাসী উদ্ভিদ, চাষাবাদ ছাড়াই এটি সংখ্যা বৃদ্ধি করে বিলে-জলাশয়ে রাজত্ব করে। তবে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ এর ফলে পুকুর-বিল, জলাশয় ভরাট, নদী খাল দখল, বাণিজ্যিকভাবে মৎস চাষের কারণে এখন এটির সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে খুব শীঘ্রই এটি বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদের তালিকায় জায়গা করে নিবে। তবে এখনো দেশে পদ্ম ফুল ২৫ টির মতো বিলে টিকে আছে।

পদ্মের রাইজোম বা শিকড় থেকে ৭৫-১০০ সে.মি দীর্ঘ বোঁটা গজায়। বোঁটায় বিদ্যমান ফাঁপা প্রকোষ্ঠগুলো মূলের সাথে অক্সিজেন সরবরাহ এবং বোঁটাকে খাঁড়া থাকতে সহায়তা করে। শাপলার মতো পদ্মের মূল পানির নিচে কাঁদায় বা মাটিতে যুক্ত থাকলেও, পদ্মের বোঁটা ও ফুল-পাতা কিন্তু পানি থেকে উপরে থাকে। পদ্মের পাতা অনেক বড়ো এবং কিনারা মসৃণ হয়, পানির থেকে ৬০ সে.মি উপরে অবস্থান করে। অস্থুল, রোমশ, নীলাভ সবুজ, বৃত্তাকার বা পেয়ালাকৃতির এই পাতার দৈর্ঘ্য ৪০-৪৫ সে.মি.। পাতার মধ্যভাগ থেকে শিরাগুলো বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছে।

বৃত্তাকার পদ্মের ফুলগুলো শাপলার চেয়ে বড়ো হয়, আড়াআড়ি ভাবে ১৫-২০ সে.মি.। ফুল হালকা গোলাপি বা সাদা রঙের হয়। ফুলগুলো দিনের আলোতে ফোটে, তবে দুপুরের পরেই বুঁজে যায়। ফুলের শুভ্র মিষ্টি সৌরভ দীর্ঘক্ষণ থাকে, এর থেকে বাণিজ্যিকভাবে সুগন্ধিও উৎপাদন করা হয়। ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার বৃত্যাংশের সংখ্যা ৪-৫টি। উপবৃত্তাকার, কুঞ্চিত পাপড়িগুলোর সংখ্যা সাধারণত ১৩-১৫টি, দৈর্ঘ্য ৪-১৫ সে.মি.। ফুলের কেন্দ্রে রয়েছে সোনালি হলুদ রঙের চোঙা বা ফানেল আকৃতির পুষ্পাক্ষ যা অসংখ্য ঘন সোনালি হলুদ পুংকেশর দ্বারা বেষ্টিত। এর উপরিতলে ১৫-৩৫ টি স্ফীতির মতো দেখতে ক্ষুদ্র গর্ভদন্ড থাকে। পদ্মের বীজসহ গোলাকার অংশকে গ্রামীণ ভাষায় ঠনা বলে। পদ্মের ফল বা ঠনাগুলোতেই ৮-১০ টি বীজ থাকে। এটি ৫-১০ সে.মি. পর্যন্ত বড়ো হয়ে থাকে। বীজ প্রথমে সবুজ থাকলেও, পরিপক্ক অবস্থায় এটি কালচে বাদামি রং ধারণ করে।

পদ্মের বংশবিস্তার দুইভাবে ঘটে, পুরনো গাছ মারা গেলে সেই ভাসমান শিকড় থেকে নতুন গাছের জন্ম হয়। ফল শুকিয়ে বীজগুলো পানিতে পড়ে গিয়ে বীজের মাধ্যমে প্রজনন ঘটায়। শিকড় ৬ ফুট পর্যন্ত মাটির গভীরতায় চলে যেতে পারে। পদ্ম কেবল সুগন্ধি কিংবা খাদ্য হিসেবেই নয় ভেষজ গুণের জন্যেও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ও চীনা চিকিৎসায় আছে এর ব্যবহার। ইনসোমনিয়া, ডায়রিয়া, হার্ট প্রবলেম এর জন্যেও এটি ব্যবহৃত হয়। মূলত এর রাইজোম, বীজ, পাতা, ফুল মূল চিকিৎসার কাজে আসে। এর বৃন্ত থেকে এক ধরনের অ্যালকয়েড সংগ্রহ করা হয় যা জ্বর, লিভার এবং হৃৎরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কচি কান্ড,পাতা, রাইজোম সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।

এক সময়ে বাংলার খাল-বিল, হ্রদ ঝিল, জলাশয় শাপলা-শালুক,পদ্মে ছেয়ে থাকত। কিন্তু শিল্পায়ন, অপরিকল্পিত সড়কপথ নির্মাণ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এর ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন, এদের আবাস্থল ধ্বংস করার কারণে এখন এরা হুমকির মুখে।

শালুক পদ্ম যদি কথা বলতে পারত হয়তো মানুষের কর্মকান্ড দেখে কিছু অভিশাপ দিত!

"যেদিন আমি হারিয়ে যাব,
বুঝবে সেদিন বুঝবে,
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায়
আমার খবর পুছবে–"
(অভিশাপ)

"ভোরে ঝিলের জলে শালুক পদ্ম তোলে কে
কে ভ্রমর-কুন্তলা কিশোরী
ফুল দেখে বেভুল সিনান 'বিসরি'
একী নতুন লীলা আঁখি তে দেখি ভুল
কমল ফুল যেন তোলে কমল ফুল
ভাসায়ে আকাশ-গাঙে অরুণ-গাগরি।।"
(*ভোরে ঝিলের জলে*)

দুটো পঙক্তিই কাজী নজরুল ইসলামের থেকে ধার নেওয়া।

ব্যাঙের ছাতা

অনামিকা ইসলাম অনামিকা

ব্যাঙের ছাতা।

আমাদের অতি পরিচিত। বর্ষা মৌসুমে মাঠঘাট, পঁচা মাটি, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় গজিয়ে ওঠে। অযত্নেই জন্মে, খুব অল্পসময়ের জন্যে। বৃষ্টির সময় মনে হয় যেন ব্যাং মশাই বৃষ্টির সময় এর নিচে বসে ডাকতে থাকে, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, বৃষ্টি আয়, বৃষ্টি আয়! এই ব্যাঙের ছাতা নিয়ে আমরা কতরকম ভাবনাই ভাবি। কী এই ব্যাঙের ছাতা? এটা কি শুধুই আগাছা, নাকি এর কোনো উপকারী দিকও আছে? এর নিচে কি আসলেই ব্যাঙ বসে থাকে?

ব্যাঙের ছাতা হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের ছত্রাক। ছত্রাক হচ্ছে মানুষ, পশুপাখি, উদ্ভিদ, মাছ, ব্যাকটেরিয়া,

ভাইরাসদের মতোই এক ধরনের জীব। প্রকৃতিতে অনেক ধরনের ছত্রাক ছড়িয়ে আছে। এককোষী, বহুকোষী, লম্বা, গোল, উপকারী, অপকারী এত ধরনের, এত অগুনতি ছত্রাক দুনিয়া জুড়ে আছে যে জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসে ছত্রাককে Fungi নামক একটা আলাদা রাজ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। নানা রূপের, নানা ধরনের ছত্রাকের ভিতর ব্যাঙের ছাতাও ছত্রাকের একটা রূপ। এই ব্যাঙের ছাতাকে মাশরুমও বলা হয়।

এদের দেহে অন্যান্য উদ্ভিদ, শেওলা ইত্যাদির মতো ক্লোরোফিল নামক সবুজ কণিকা থাকে না। আর যেসব উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবের শরীরে এই ক্লোরোফিল থাকে তাদেরকে খাদ্যের জন্যে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় না। তারা এই ক্লোরোফিলের মধ্যে সূর্যের আলো থেকে সৌরশক্তি নিয়ে তা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যশক্তিতে পরিণত করে। কিন্তু ব্যাঙের ছাতায় যেহেতু ক্লোরোফিল নেই তাই তাই এরা সালোকসংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সূর্যের আলো ব্যবহার করে নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। এরা তাই পরভোজী। বেঁচে থাকার জন্যে এরা বিভিন্ন পঁচা মাটি, যেখানে প্রচুর জৈব পদার্থ রয়েছে, এমন স্থানে বসবাস করে আর সেখান থেকেই খাদ্য উপাদান শোষণ করে। তবে আমরা ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম বলে সাধারণত যেগুলোকে চিনি সেগুলো Agaricaceae গোত্রের অন্তর্গত ব্যাসিডিওমাইসেটিস শ্রেণির Agaricus গণের বিভিন্ন প্রজাতির মৃতজীবী ছত্রাক। এই শ্রেণিতে ১৭টি বর্গ, ১০০টি পরিবার, ১৬৪৭টি গণ এবং প্রায় ২৬,০০০ প্রজাতির ছত্রাক রয়েছে। ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম মূলত এসব উচ্চশ্রেণির ছত্রাকের স্পোরোফোর বা প্রজনন অঙ্গ। এই ছত্রাকগুলোর মূলদেহ সূত্রাকার মাইসেলিয়াম আর হাইফা নামক অঙ্গ দিয়ে গঠিত। এদের ক্ষুদ্র সূত্রাকার দেহ আমাদের চোখে আলাদাভাবে বাঁধে না। একটা ব্যাঙের ছাতা মাটি থেকে তুলে ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই এর নিচের দিকে শিকড়ের মতো লম্বা সূত্রাকার অঙ্গ তথা ছত্রাকের মূলদেহ দেখা যাবে। এগুলো পঁচা আবর্জনার স্তূপ, উর্বর মাটি, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বসবাস করে। অনুকূল পরিবেশে এগুলো বংশবৃদ্ধি ঘটায়। আর তার জন্যে মাটির উপর ছাতার মতো অঙ্গ বের করে। যে মৌসুমে এরা প্রজননের জন্যে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, পানি ইত্যাদি পায় সে মৌসুমে এরা এই ছাতা বের করে। আর এই ছাতাকেই আমরা ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম বলে থাকি। এর উপরিভাগের টুপির মতো অংশই মূলত বংশবৃদ্ধির কাজ করে। এই অংশ থেকে স্পোর বা মুকুল বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই মুকুল অনুকূল পরিবেশে নতুন ছত্রাকের জন্ম দেয়।

পৃথিবীতে এই Agaricus গণেরই হাজার হাজার প্রজাতির মাশরুম আছে। এদের মধ্যে অনেক উপকারী আর কাজের মাশরুম যেমন আছে, তেমনি অপকারী আর বিষাক্ত মাশরুমও আছে। এই মাশরুম অনেকেই খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। আবার কোনোটার আছে ঔষধি গুণ। অনেক মাশরুম খুবই নরম, আবার অনেক মাশরুম কাষ্ঠল আর শক্ত। নানা রং, নানার আকৃতির মাশরুম দেখা যায় পৃথিবীর সর্বত্র। তবে আমরা মাঠেঘাটে যে মাশরুম গজাতে দেখি সেটির বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে *Agaricus compestris*
যাকে আমরা ব্যাঙের ছাতা বা মেঠো মাশরুম বলে চিনি। সাদা আর ছাতার পেটের দিকে লালচে রাঙা এই মাশরুমটাই মূলত এদেশের মাঠেঘাটে বর্ষাকালে জন্মে থাকে।

তবে ব্যাঙের সাথে আদৌ ব্যাঙের ছাতার কোনো সম্পর্ক নেই। বর্ষাকালে ব্যাঙের ডাক অনেক শোনা যায় আর এই মাশরুমও প্রচুর পরিমাণে গজায়, তাই এটাকে সবাই ব্যাঙের ছাতাই মনে করে। সাধারণত ব্যাং এই ব্যাঙের ছাতার নিচে আশ্রয় নেয় না বা এর উপর বসে

না। কারণ ব্যাঙ উভচর প্রাণী। এটা যেমন ডাঙায় থাকতে পারে, তেমনি বৃষ্টিতেও ভিজতে পারে, কোনো সমস্যা হয় না। তবে মাশরুমের ফ্রুটবডি তথা স্পোরোফোর বেশ বড়ো আর এর ছত্রটা বেশ চওড়া আয়তনের হলে কখনো কখনো এর নিচে ব্যাং আশ্রয় নিতেই পারে। শুধু ব্যাং কেন, অন্যান্য পোকামাকড়, ছোট পাখি এগুলোও আশ্রয় নিতেই পারে। এটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু না।

কয়েক ধরনের ব্যাঙের ছাতা: নিচে কয়েক ধরনের ব্যাঙের ছাতা তথা মাশরুমের কথা উল্লেখ করা হলো।

খাবার উপযোগী: মাশরুমকে পৃথিবীর অনেক স্থানে খাবার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বিশ্বব্যাপী মাশরুম খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পাশাপাশি বেড়েছে এর চাষ। চাষকৃত মাশরুম জংলি মাশরুমের চেয়ে ছোটো আকৃতির হয়ে থাকে। এর ভক্ষণযোগ্য অংশটি অল্প কিছুদিন সতেজ থাকে। অনেক মাশরুম কচি অবস্থায় খেতে ভালো কিন্তু পোক্ত হয়ে গেলে খেতে ভালো লাগে না, অনেক সময় বিষাক্ত হয়ে যায়। আবার অনেক মাশরুমে অল্পবিস্তর ক্ষতিকর উপাদান থাকে যার কারণে সেগুলো ভালোমতো তাপ দিয়ে রান্না করতে হয়। পৃথিবীতে অনেক প্রজাতির খাদ্যোপযোগী মাশরুম রয়েছে। যেমন:

Pleurotus বা ওয়েস্টার মাশরুম। এই মাশরুম পৃথিবীব্যাপী সুস্বাদু সব খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এমনকি এই মাশরুম দিয়ে ওয়েস্টার সসও বানানো হয়। যা নানান মজাদার খাবারের স্বাদ বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়।

Agaricus bisporus বা বাটন মাশরুম। এটি পৃথিবীর খাদ্যোপযোগী মাশরুমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুস্বাদু মাশরুম। তাছাড়া এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচিত আর বহুল ব্যবহৃত মাশরুম। সাদা রঙের, মাংসল, নরম আর সুস্বাদু এই মাশরুম পৃথিবীর সর্বত্র চাষ করা হয়।

Lentinula edodes বা শিতাকি মাশরুম। ছোটো ছোটো আকৃতির হালকা বাদামি রঙের এই মাশরুমগুলো বেশ নরম। এটাও সুস্বাদু মাশরুমগুলোর মধ্যে অন্যতম।

Flammulina velutipes, ইনোকি মাশরুম। খেতে যেমন সুস্বাদু, দেখতেও খুবই সুন্দর লাগে। গোলাপি রঙের এই মাশরুমগুলো যখন দলবেঁধে থাকে, দেখতে ফুলের মঞ্জুরির মতো লাগে দূর থেকে।

আবার অনেক মাশরুম খাদ্যোপযোগী হওয়ার পরেও স্বাদ, গন্ধ ভালো না হওয়ায় খাবার হিসেবে চলে না।

বিষাক্ত: অনেক মাশরুম আছে বিষাক্ত। এদের মধ্যে কিছু মাশরুম অল্প মাত্রায় বিষাক্ত। আবার কিছু কিছু মাশরুম খেলে সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ মারা যায়। কিছু মাশরুমের গায়ে হাত দিলেই আপনার বারোটা বাজবে। তাই এগুলো থেকে, দূরে, বহু দূরে থাকেন! কয়েকটা বিষাক্ত মাশরুমের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ফায়ার কোরাল (*Podostroma cornu-damae*) এটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত অন্যতম একটি বিষাক্ত মাশরুম। লেলিহান অগ্নিশিখার মতো দেখতে এই মাশরুম লেলিহান আগুনের চেয়েও ভয়াবহ। না জেনে এই মাশরুম খেয়ে অনেকেই মারা গেছে এবং যায়।

ডেথ ক্যাপ (*Amanita phalloides*) এটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত মাশরুম বলে গণ্য করা হয়। এর সাদা-সবুজ দেহাবয়বটা যতই সাদামাটা দেখতে হোক, এর বিষ কিন্তু আপনার প্রাণ নিয়ে নেবে।

ওয়েবক্যাপস (*Cortinarius species*) এটিও পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত মাশরুমগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটা ভালোভাবে না চিনলে ভুলে খেয়ে ফেলার সমূহ সম্ভাবনা আছে। তাই সাবধানে জেনেবুঝে সংগ্রহ করবেন।

দৃষ্টিনন্দন: অনেক মাশরুমের রূপ প্রাণহরা। এত সুন্দর, শুধু দেখতেই মন চায়। এদের মধ্যে কিছু অবিষাক্ত, কিছু বিষাক্ত। যেমন:

Amanita muscaria, লালের উপর সাদা সাদা। চোখ জুড়ানো, কিন্তু বিষাক্ত।

Lactarius indigo, নীল রংয়ের। এর কষও নীল। চোখের দেখা ফুরিয়ে গেলে খেয়ে ফেলবেন।

Hericium erinaceus, একে সিংহের কেশরও বলা হয়। সাদা সাদা রোঁয়ার মতো পশমি আর খেতেও ভালো।

Clavaria zollingeri, বেগুনি প্রবালের মতো দেখতে।

কুৎসিত: অনেক মাশরুম দেখলে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে, এতটাই বিদঘুটে। এমন কিছু মাশরুম হলো:

Clathrus archeri, একে ডেভিলস ফিঙ্গার বলে। দেখতে যেমন বিদঘুটে, স্পোর ফোটার সময় উৎকট গন্ধও ছড়ায়।

Xylaria polymorpha, দেখতে একদম মরা মানুষের হাতের মতো। গভীর রাতে এর ছবি দেখবেন আর ভয় পাবেন।

Hydnellum peckii, দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছে যেন! সাদা ছাতার ভিতর থেকে লাল লাল কষ গড়িয়ে পড়ে। এছাড়া অনেক মাশরুম থেকে ওষুধ, রং, আঠাসহ অনেক কিছু তৈরি করা হয়।

জাতীয় পাখি দোয়েল

শুভ সালাউদ্দিন

বাংলাদেশ থাকেন অথচ দোয়েল পাখির নাম শুনেননি এরকম বললে মহাপাপ হবে। দোয়েল বাংলাদেশের জাতীয় পাখি, দুই টাকার নোটেও রয়েছে দোয়েল পাখির ছবি, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত 'সাউথ এশিয়ান গেমস' এর মাসকটও ছিল দোয়েল, রাজধানী ঢাকাতে রয়েছে দোয়েল চত্বর, প্রকৃতিপ্রেমী কবি জীবনানন্দ দাশ তার বিখ্যাত 'বাংলার মুখ' কবিতায় তুলে এনেছেন দোয়েলের কথা ”অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে চেয়ে দেখি ছাতার মতো ব্ড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েলপাখি –", এমনকি লোকগাথার মধ্যেও দোয়েল আছে। চারিদিকে দোয়েলের যেন সমাচার।

দোয়েল নিয়ে বাংলাদেশের যশোরে প্রচলিত একটি গল্প আছে- এক দেশে কুচকুচে কালো এক দধিয়াল বাস করত। তার মতো সাদা দই আর কেউ বানাতে পারত

না। দেশটির বুড়ো রাজা একদিন অল্প বয়েসী এক সুন্দরীকে বিয়ে করতে করলেন। সমস্যা হলো নতুন রানি নাকি দই ছাড়া ভাতই খাবে না। রাজা জানতে পারলেন ঐ দধিয়ালের কথা এবং তাকে প্রতিদিন দই পৌঁছে দিতে বললেন। তার জাদুকরি দই খেয়ে রানি অমৃতের স্বাদ পেলেন আর তাদের মধ্যে হলো প্রেম। একদিন এ খবর রাজা জেনে গেলে রানির কাছে

দধিয়ালের যাওয়া বন্ধ করে দেন। অনেকদিন পর একরাতে দধিয়াল দুটি কালো হাঁড়িতে দই নিয়ে রানির পুরীর সামনে এসে ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলেন। রানি তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারল না তাই প্রার্থনা করল। তাতেই সে একটি পাখি হয়ে পিক করে ডেকে গাছে গিয়ে বসলেন। দধিয়ালও তখন পাখি হয়ে তার পাশে গিয়ে বসলেন। এরপর দু'জনেই উড়ে অন্য রাজ্যে চলে গেলেন। এরাই দোয়েল, দধিয়াল বা দয়েল পাখি। সেই দইয়ের সাদা আর হাঁড়ির কালো রং এখনও দোয়েলের বুকে দেখা যায়।

দোয়েল পাখির নামকরণ হয়তো এভাবেই হয়েছে কিন্তু সেটা বিষয় নয়। কথা হচ্ছে এতে একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে আগেও মানুষ দোয়েল পাখি নিয়ে আলোচনা করত এবং সেকারণেই এরকম গল্পের উৎপত্তি।

দোয়েলকে ইংরেজিতে বলা হয় Oriental Magpie Robin', গ্রামের দিকে দই নাচুনি পাখিও বলে অনেকে। যাহোক এর বৈজ্ঞানিক নাম হলো Copsychus saularis. পুরো ক্লাসিফিকেশন বলতে গেলে:

Kingdom:Animalia
Phylum:Chordata
Class:Aves
Order:Passeriformes
Family:Muscicapidae
Genus:Copsychus
Species:C. saularis

বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ইত্যাদি অঞ্চলে দোয়েল ছড়িয়ে রয়েছে। আজকে মূলত বাংলাদেশে পাওয়া যায় সেই সাবস্পিসিজের দোয়েল নিয়েই আলোচনা করা হবে।

বাংলাদেশের দোয়েল অন্যদেশের দোয়েলের চেয়ে লেজের দিকে একটু বেশি কালো। মোটামুটি দেশের সবস্থানেই কমবেশি দোয়েল পাখি দেখা যায়। অট্টালিকায় ভরপুর রাজধানী থেকে শুরু করে গাছগাছালিযুক্ত সুন্দরবন, সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায়। একটু চোখকান খোলা রাখলে গবাদি লোম, খড়কুটো, সাপের খোলস, গাছগাছালির শুকনা মূল দিয়ে তৈরি ঘর দেখতে পারবেন। দোয়েল লোকচলাচল করছে এমন স্থানে বাসা বাঁধতেই বেশি পছন্দ করে। বাসা তৈরির পর সবাইকে জানানোর জন্য গান করতে থাকে। দোয়েলের সব ডাক শুনে আপনার একইরকম মনে হতেই পারে কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা বিভিন্ন সুরে ডাকে যেমন বাসা তৈরির কথা জানানোর সময় একরকম সুর, ব্রিডিং সিজনে স্ত্রী দোয়েলকে আকর্ষিত করতে আরেক সুর আবার বিপদে পড়লে সাহায্য চেয়ে অন্যরকম সুরে ডাক দেয়। এমনকি তারা অন্য পাখির সুর পর্যন্ত নকল করতে পারে। অনেক পক্ষীবিশারদগণ আবার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ডায়ালেক্ট থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। এরা একাধারে ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত সুর করতে পারে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ সবঋতুতেই দোয়েলের ডাক শোনা যায়।

দোয়েল পাখি আকারে খুব বড়ো না মোটামুটি ১৫-২০ সেন্টিমিটারের মতো। ধরা চলে সাধারণ আন্ড্রোয়েড ফোনের সমান বা একটু বড়ো। পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, কেঁচো, খেজুরের রস এগুলো দোয়েল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মাঝে মাঝে নিজেও বিড়াল বা শিয়ালের খাদ্যে পরিণত হয়।

কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো দিয়ে স্ত্রী এবং পুরুষ দোয়েলকে আলাদা করা হয় যেমন: পুরুষ দোয়েলের ঘাড়ের নিচে পেটের অংশটুকু সাদা আর স্ত্রী দেয়েলের ঘাড়ের নিচের দিকের অংশ ঘিয়ে কালারের। স্ত্রী দোয়েল ঘর তৈরিতে এবং বাচ্চা লালনপালনে আর পুরুষ দোয়েল ঘর রক্ষা করতে বেশি অংশগ্রহণ করে।

বাসা বানানোর সপ্তাহখানেক পরেই স্ত্রী দোয়েল ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে চার পাঁচটা ডিম পাড়ে এবং তাতে ৮ থেকে ১৪ দিন তা দিলে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

পূর্বেই তুলনায় দোয়েল পাখির পরিমাণ কমে গেলেও বিলুপ্ত হওয়া নিয়ে চিন্তিত হবার তেমন কারণ নেই। International Union for Conservation of Nature (IUCN) এর তৈরিকৃত লাল তালিকাতে দোয়েলকে নূন্যতম বিপদগ্রস্থ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে পাখি সংরক্ষণের দিক থেকে আমাদের সচেতনতা নেই বললেই চলে। সাম্প্রতিক সময়ে পিরোজপুরের এক গ্রামে মাঠের ধান খেয়ে ফেলায় তালগাছে বাবুই পাখির ঝুলন্ত বাসা পুড়িয়ে, পিটিয়ে ধ্বংস করেছে গ্রামবাসী। এ নির্মম ঘটনার শিকার হয় দেড় শতাধিক বাবুই পাখির ছানা ও ডিম। পরে তিন জনকে আটক করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের বন্যপ্রাণী রক্ষা আইন ও ২০১২ সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী পাখি নিধন দণ্ডনীয় ফৌজদারি অপরাধ যার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি এক বছর জেল, এক লাখ টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে। একই অপরাধ ফের করলে শাস্তি ও জরিমানা দ্বিগুণের বিধানও রয়েছে।

যাহোক খুবই দুঃখজনক একটা ঘটনা। এধরনের ঘটনা যেন না ঘটে সেজন্য আমাদের সচেতন থাকতে হবে পাখি ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে আমাদেরই সাহায্য করে আর আমরা যদি এবারে তাদের ধ্বংস করতে থাকি তাহলে ইকোসিস্টেম বিরাট বড় প্রভাব ফেলবে।

আলোচনা হলো তো বাংলার দোয়েল নিয়ে কিন্তু শ্রীলঙ্কাতে নীল দোয়েল নামে আরেক রকমের দোয়েল আছে যেটার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ছবিটা না দিয়ে পারলাম না।
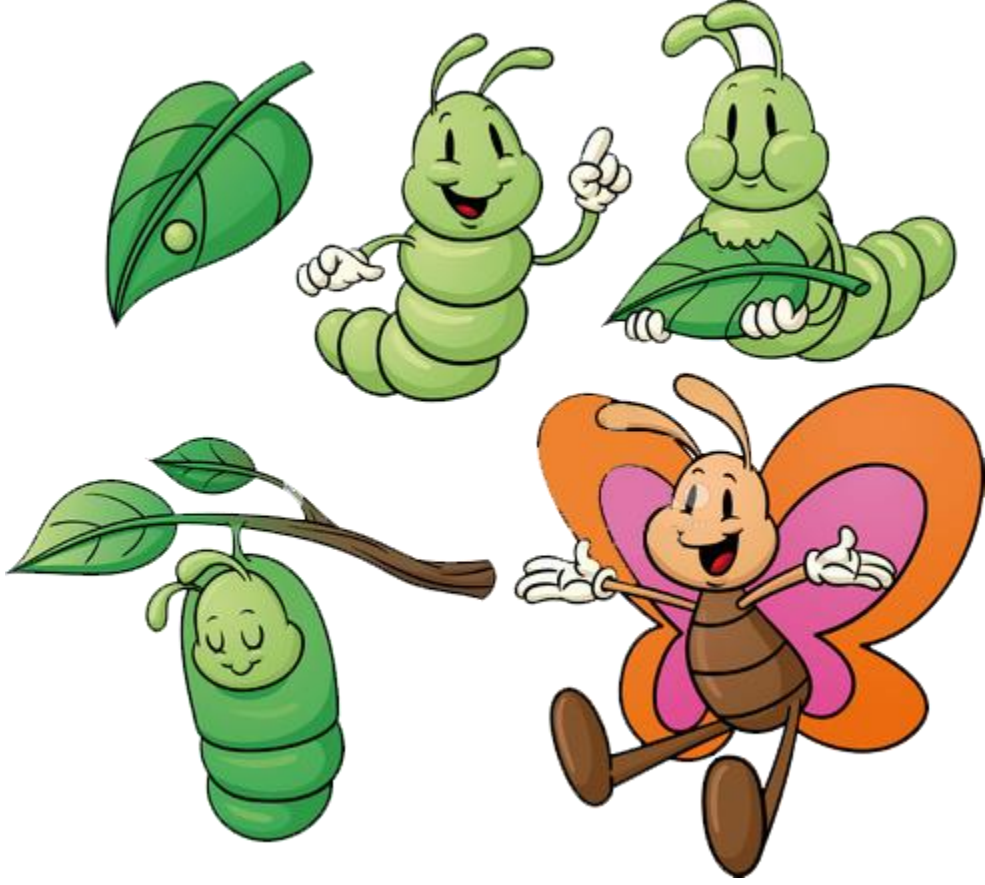
শুধু খাওয়াই যার কাজ!

নুপুর দেব

ডিম ফেটে বেরিয়ে এলো আমাদের গল্পের নায়ক। পিচ্চি শুঁয়োপোকা! বের হয়েই বেচারার খিদে লেগে গেছে। কিছু একটা এখন খেতে হবে। কী খাওয়া যায়?

অ্যাহ! এই ব্যাটা দেখি নিজের ডিমটাই খাওয়া শুরু করে দিল! (মানে ডিমের খোসাটা)

নিজের ডিম খেয়ে পেট ভরল না। যে গাছে জন্মেছিল, সেই গাছের পাতা খাওয়া শুরু করল। খেতেই আছে, খেতেই আছে। নাহ, এর পেট তো সহজে ভরে না। এক গাছের পাতা খেতে আরেক গাছে যাচ্ছে। পাতা খাচ্ছে, ফল খাচ্ছে। একটা কথা বলে রাখি। প্রত্যেকটা পোকার জন্য আলাদা আলাদা হোস্ট গাছ আছে।
সারাদিনটা ওর খাওয়ার উপর দিয়েই গেল। নিজের বডি ওয়েটের কয়েকগুন বেশি খাবার খেয়ে ফেলেছে! একদিনে! ওজন বেড়ে হয়ে গেল ৩/৪ গুণ! উফ, এবার একটু রেস্ট নেয়া যাক?
নাহ! ওকে আরো খেতে হবে। আরো খাবার প্রয়োজন; আরো প্রোটিন প্রয়োজন।

কিন্তু কেন খাচ্ছে এত? অলৌকিক ব্যাপার-সাপার নাকি? এ যেন খাওয়ার মেশিন!

আসলে ও তো সারাজীবন 'শুঁয়োপোকা' হয়ে থাকবে না। ওকে হতে হবে সুন্দর একটা প্রজাপতি অথবা মথ! শুঁয়োপোকা পাখা পেয়ে হয়ে যাবে 'প্রজাপতি' আর ওড়ে বেড়াবে ফুলে ফুলে।

প্রজাপতির কাজ শুধু দুইটাই। মেটিং আর ডিম দেয়া। বংশবিস্তারের জন্য তাদের লাগবে যথেষ্ট প্রোটিন। কিন্তু

শুঁয়োপোকার এত খাওয়ার দরকার টা কী? প্রজাপতি তো নিজে খেয়ে খেয়ে প্রোটিন জোগালেই পারে!
কাহিনিটা হলো যে , শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতির হওয়ার যে প্রক্রিয়াটা থাকে, ওই টাইমে শুধু পাখা যুক্ত হয় না। শুয়োপোকা যে দাঁত দিয়ে খায়, ওইটা আর থাকে না। প্রজাপতি হয়ে গেলে তার বদলে আসে নেক্টার। এটাকে আমরা বলতে পারি প্রজাপতির জুস খাওয়ার স্ট্র!

ওইটা দিয়েই প্রজাপতিরা ফুল থেকে মধু খায়। কিন্তু এভাবে তো বেশি প্রোটিন সংগ্রহ করা সম্ভব নাহ। বংশবিস্তারের জন্য ওদের লাগবে প্রচুর প্রোটিন।

তাই শুয়োপোকারা তাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য এত করে খায়! বেশি বেশি করে খেয়ে প্রোটিন স্টোর করে রাখে, কারণ পরে কাজে আসবে। খাওয়াটাই যেন শুঁয়োপোকার মূল দায়িত্ব।
শুঁয়োপোকাকে কী বলতে পারি? দায়িত্ববান খাদক?

এবার আবার পিচ্চি শুঁয়োপোকার কাছে ফিরে যাই। না না, পিচ্চি কেন হবে! ও তো একদিনেই অনেক বড়ো হয়ে গেছে।

২ সপ্তাহ কেটে গেল। আগের চেয়ে ২০/৩০ গুণ বড়ো হয়ে গেছে ও। স্টিল খাচ্ছেই, খেয়েই যাচ্ছে। এভাবে আরো কয়েক সপ্তাহ খাবে; হয়ে যাবে প্রাথমিক অবস্থা থেকে প্রায় শ গুন বড়!
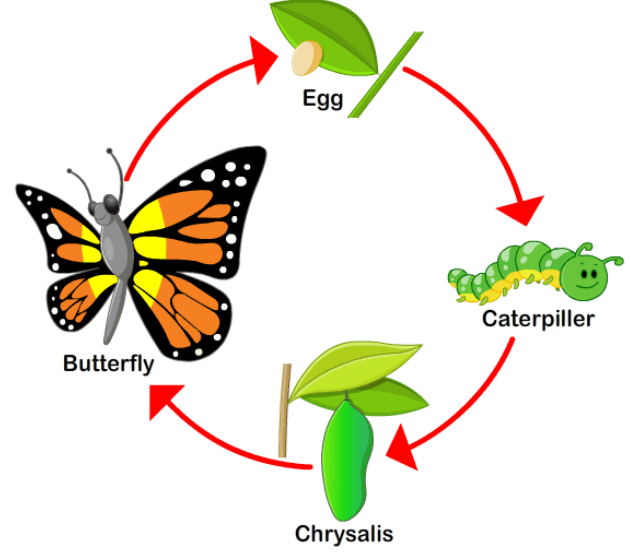
শুঁয়োপোকার খাওয়ার দায়িত্ব শেষ। এবার দরকার বিশ্রাম। সে একসময় পরিণত হবে সুন্দর একটা প্রজাপতিতে; উড়ে বেড়াবে ফুলে ফুলে। তার ডিম থেকে আবার জন্ম নেবে শুঁয়োপোকা আর একই গল্প চলতেই থাকবে।
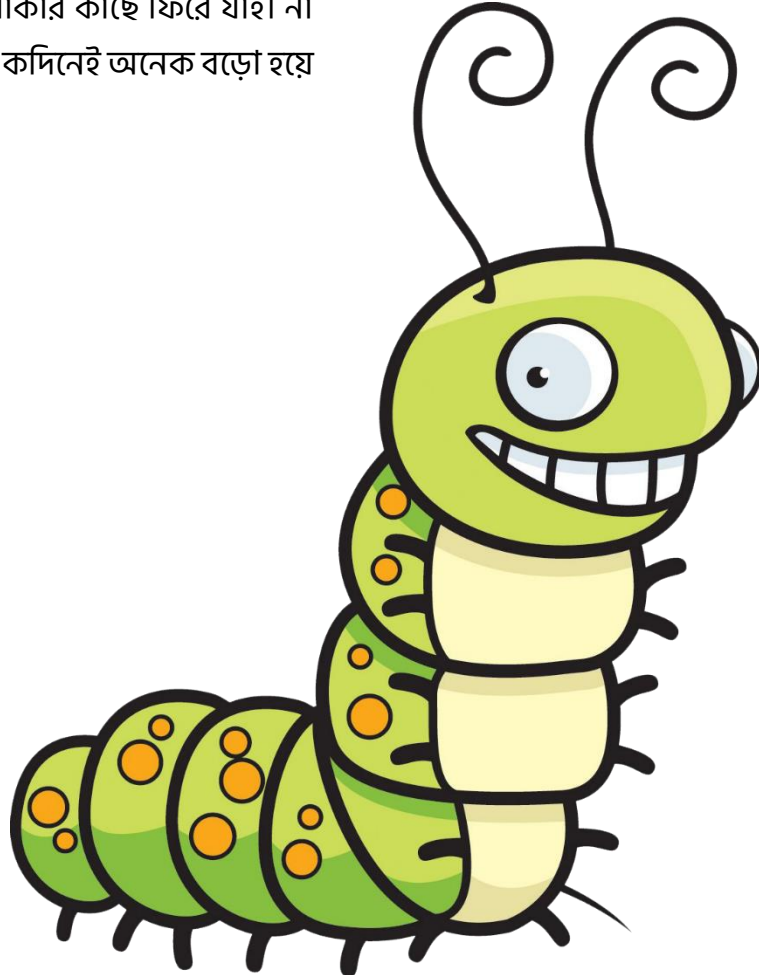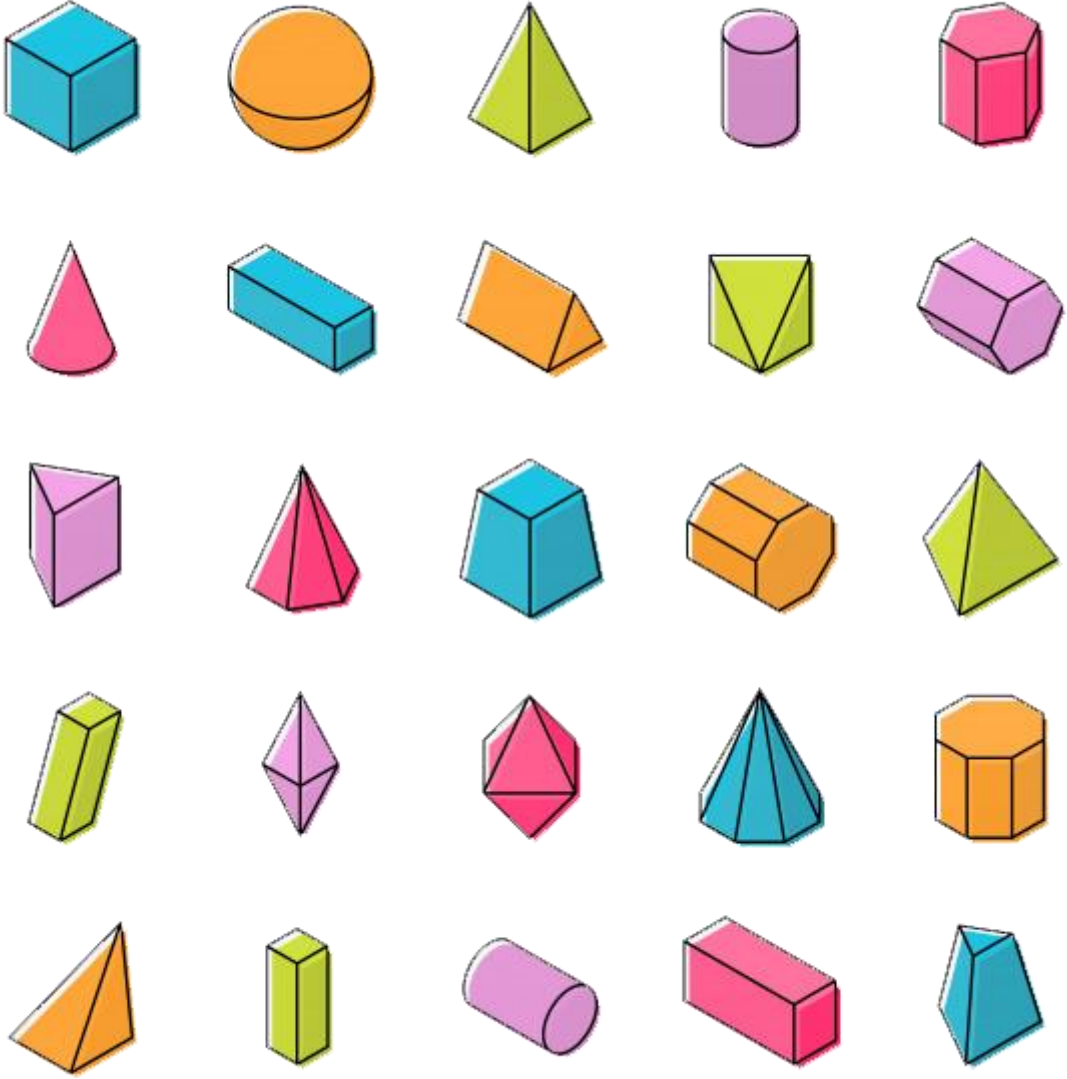
ফোলানো চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল

আশরাফুল ইসলাম মাহি

আমরা সবাই ফুলের ডিজাইন দেখেছি। নানান ঢঙে, নানান আকৃতিতে নানান জায়গায় থাকে। এগুলো যে ঠিক ফুলের মতো হয়, সেটা তো বলা একেবারেই যায় না। তো যাহোক, আমরা এটাকে দেখব ডিজাইন হিসেবেই, ফুল হিসেবে না।

আজ আমরা একটা ফুলের ডিজাইনের জন্য একটু বেশি মজার গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব।
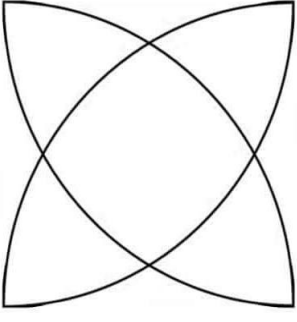
হ্যাঁ, এই ডিজাইনের কথাই বলছিলাম।

তো এই চিত্রে আমরা দুইপ্রকারের শেইপ বা আকৃতি খুঁজে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে চতুর্ভুজের মতো, মাঝে, যেন ফুলের মধ্যভাগ। আরেকটা হলো ফুলের পাপড়ি, অনেকটা ত্রিভুজ ত্রিভুজ দেখতে, চারটা আছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, এই মধ্যভাগটার ক্ষেত্রফল কত?

এই সমস্যাটা খুব মজার একটা সমস্যা। প্রথমত, আমরা সাধারণত সরলরেখা দিয়ে তৈরি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে থাকি। কিন্তু এই সমস্যায় আমরা একটু বক্ররেখা দিয়ে চতুর্ভুজের ন্যায় বানানো ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব। অনেকটা ফুঁ দিয়ে ফোলানো চতুর্ভুজের মতো ক্ষেত্র আরকি! দ্বিতীয়ত, এই সমস্যাটা দেশের একটা বিখ্যাত মজার গণিতিক সমস্যার বই 'নিউরনে অনুরণন' এর একটা ৪০০টা সমস্যার একটা। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না, সমস্যাটা বেশ চমৎকার। তো, কথা না বাড়িয়ে সমাধানটা করে ফেলা যাক।
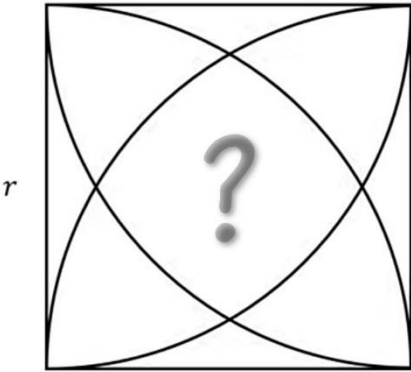
বোঝার জন্য আরেকটা চিত্রতে একটু বিস্তারিত রূপ দেখে নেই,

আমরা শুধু আগের চিত্রের কোণাগুলো যোগ করেছি। যোগ করে একটা সুন্দর বর্গক্ষেত্র পেয়েছি। এই বর্গক্ষেত্রের বাহু ধরি r ।

এখন আমাদেরকে কাজটা আরও সহজ করে ফেলতে হবে। গণিতে আপনি যত সহজে চিন্তা করবেন, তত বেশি সুন্দরভাবে সমাধান করতে পারবেন।

তো, আমরা এই চিত্রে কিন্তু কয়েকপ্রকারের অংশ পাচ্ছি। মাঝের চতুর্ভুজের মতো একটা, চতুর্ভুজটার বাঁকা চারবাহুর উপর দাঁড়ানো চারটা ত্রিভুজের মতো। এই ত্রিভুজের মতো গুলো সবার ক্ষেত্রফল সমান, চিত্রকে একটু পর্যবেক্ষণ করলেই ধরতে পারবেন। আরেক প্রকার আছে হচ্ছে অনেকটা জাতীয় স্মৃতিসৌধের মতো চারটা, বড়ো
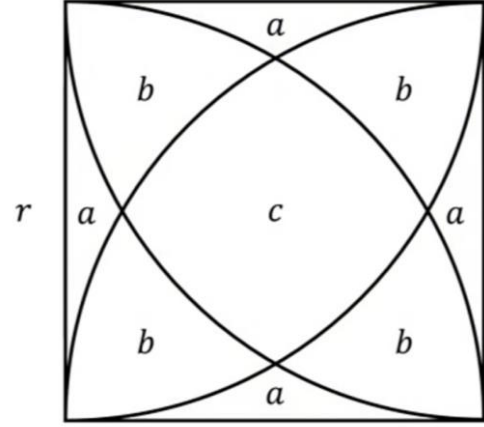
বর্গের চারবাহু বেয়ে ভিতরের দিকে উঠে গেছে।

আমরা এখানে শুধু একই আকৃতির অংশগুলোকে চিহ্নিত করেছি। a, b, c তিনটা ভিন্ন আকৃতির ক্ষেত্র— চিত্র থেকে একটু খেয়াল করে দেখে নিন।

তো আমাদের দরকার ছিল c । কিন্তু পেয়ে গেলাম তিনটা অজানা চলক, a, b, c !

এখন একটার মান জানতে আরেকটার মান লাগবে। যেহেতু চলক তিনটা, তাই আমাদের এদের মান বের করার জন্য তিনটা আলাদা আলাদা সমীকরণ আনতে হবে। তারপর এই তিনটেকে সমাধান করতে পারলেই কেল্লা ফতে! c খুঁজতে গিয়ে a আর b কে ফ্রি ফ্রি পেয়ে যাবো।

আমরা তাহলে তিনটে সমীকরণের জন্য তিনটা ধাপে কাজ করতে পারি। প্রতি ধাপে একটা করে সমীকরণ পাবো।

ধাপ-১:

আমরা সমগ্র বর্গের ক্ষেত্রফলকে লিখতে পারি বাহু গুণ বাহু = r^2

এবার চিত্রে খেয়াল করি,
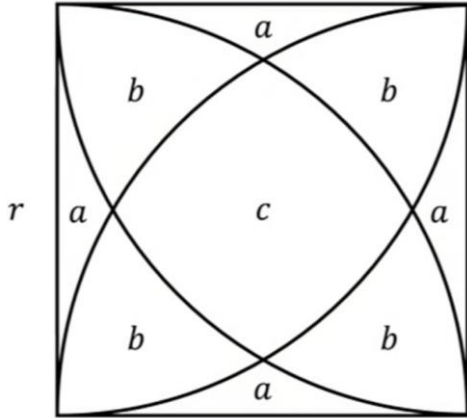
চিত্রতে a আর b আছে 4 টা করে, আর c আছে একটা, মানে সমগ্র চিত্রের বা বর্গের ক্ষেত্রফল হচ্ছে,

4a + 4b + c

তাহলে, অবশ্যই $4a + 4b + c = r^2$ ...... (1)

আমরা আমাদের একটা সমীকরণ খুব সহজেই পেয়ে গেলাম।

ধাপ-২:
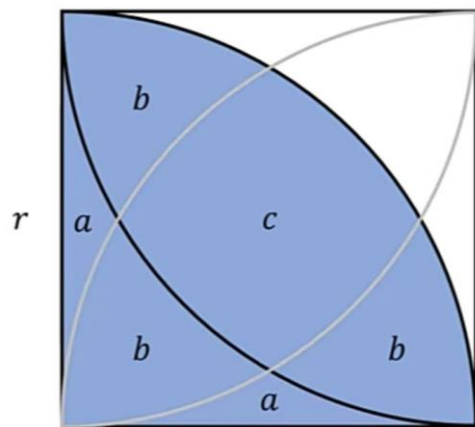
রং করা অংশ খেয়াল করুন। এটা কিন্তু একটা বৃত্তের অংশ! যার কেন্দ্র হচ্ছে বর্গের একটা কোণা। তো বর্গের বাহু সমান, আর কোণ সব 90°, তাই এই বৃত্তের অংশটা অবশ্যই 90/360 = ¼ বা একটা বৃত্তের ¼ অংশ। বৃত্তটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে বর্গের বাহু, r।

তাহলে এই অংশটার ক্ষেত্রফল,

$\frac{1}{4} \pi r^2 = \pi r^2/4$।

আবার, রঙিন অংশ মোট 2a + 3b + c এর সমান। তাই,

$2a + 3b + c = \pi r^2/4$ ......(2)

ধাপ-৩:
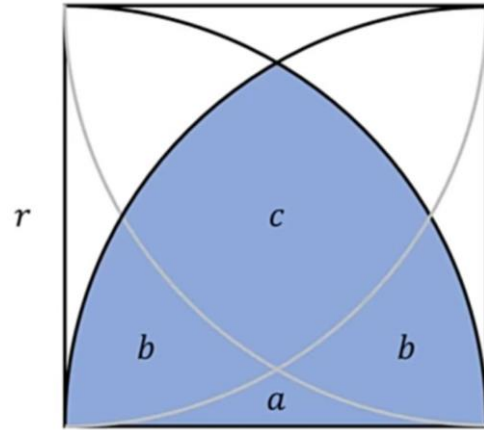
এবার একটু জটিল চিন্তা দরকার। আমরা দুই অংশে এই ধাপটা শেষ করব।
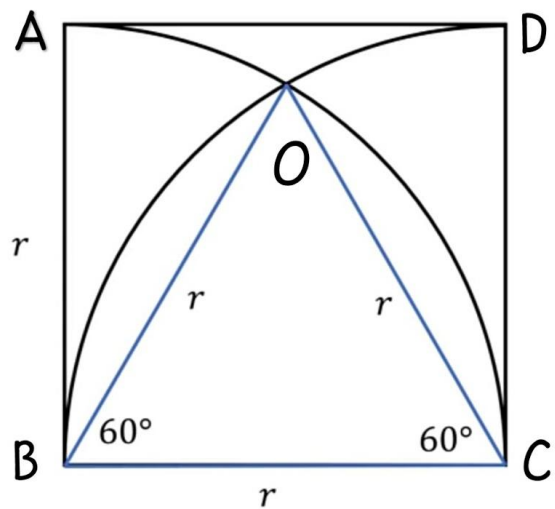
(ক) চিত্রটা দেখি,

লক্ষ্য করুন, এখানে দুটো বৃত্তাংশ, যাদের ব্যাসার্ধ r, তারা একটা কমন বিন্দুতে (O বিন্দু) ছেদ করেছে।

দুটোর ব্যাসার্ধই r, কারণ বর্গের সব বাহুই r এবং বর্গের বাহুই তো বৃত্তের ব্যাসার্ধ।
তাহলে আমরা ছেদ বিন্দু থেকে বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্রদুটো যোগ করি। BO আর CO পেলাম। শিওর, এদুটো রেখাংশও r, কারণ ছেদ বিন্দুটা হচ্ছে দুই বৃত্তেরই পরিধির উপর একটা বিন্দু। তাই, এদুটোও বৃত্তের ব্যাসার্ধ ছাড়া আর কিছু না।

তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি সমবাহু ত্রিভুজ BOC, যার প্রত্যেক বাহু r এবং অবশ্যই প্রত্যেক কোণ 60°।
এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল,
$r^2(\sqrt{3}/4)$,
সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সাধারণ সুত্র।

এখন দেখুন, এই যে 60° কোণের জন্য B কেন্দ্রীক BOC বৃত্তাংশ, এটার মধ্যেই কিন্তু BOC ত্রিভুজ আছে।
ত্রিভুজ BOC আর একটা অর্ধচন্দ্রাকার চ্যাপ্টা অংশ মিলে বৃত্তাংশ BOC গঠিত হয়েছে। তো আমরা যদি কোনোভাবে ওই চ্যাপ্টা অংশের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাই, তাহলে কিন্তু খুব সহজেই মূল চিত্রের রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল জেনে ফেলতে পারব। তখন রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে, (দুইটা চ্যাপ্টা অর্ধচন্দ্র + ত্রিভুজ BOC) ।
এখন তাহলে অর্ধচন্দ্রের ক্ষেত্রফলটা বের করি।
কীভাবে? এইযে, BOC বৃত্তাংশ থেকে ত্রিভুজ BOC বাদ দিয়ে।

(খ)
আমরা ছোটোবেলার ঐকিক নিয়ম ফলো করে BOC বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল বের করি,
360° কোণের জন্য বৃত্তের ক্ষেত্রফল πr^2
বা, 1° কোণের জন্য ক্ষেত্রফল $\pi r^2/360$
তাহলে, θ কোণের জন্য ক্ষেত্রফল $\pi r^2(\theta/360)$

এবার তবে, 60° কোণের জন্য,
$\pi r^2(60/360) = \pi r^2/6$ ।

এখন, অর্ধচন্দ্রের ক্ষেত্রফল,

$$\frac{\pi r^2}{6} - \frac{r^2\sqrt{3}}{4}$$

এবার একটু চিত্র দেখে মনে করে নেই,
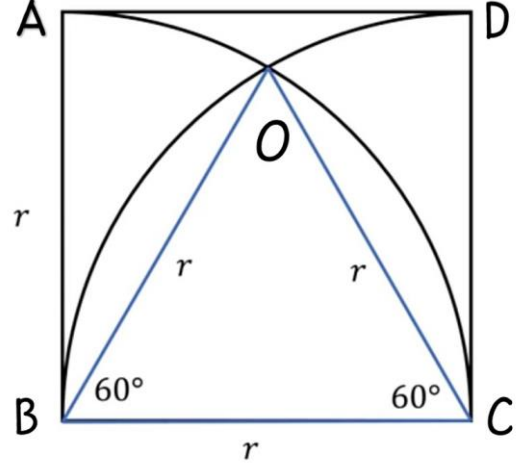
আমাদের মূল অংশটার ক্ষেত্রফল হবে,
2(অর্ধচন্দ্র) + ত্রিভুজ BOC
$= \pi r^2/3 - r^2\sqrt{3}/2 + r^2\sqrt{3}/4$
$= \pi r^2/3 - r^2\sqrt{3}/4$

হুহ্! ঝামেলা গেল তবে!
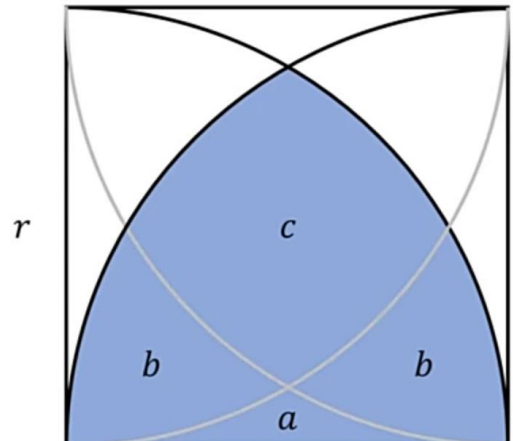
এবার সমীকরণটা আনার পালা,
তাহলে,

$$a + 2b + c = \frac{\pi r^2}{3} - \frac{r^2\sqrt{3}}{4}$$

আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত তিনটি সমীকরণ পেয়ে গেছি!
একসাথে একটু লিখি,
(1)

$$4a + 4b + c = r^2$$

(2)

$$2a + 3b + c = \frac{\pi r^2}{4}$$

(3)

$$a + 2b + c = \frac{\pi r^2}{3} - \frac{r^2\sqrt{3}}{4}$$

এখন যদি এই তিনটা সমীকরণ নিয়ে সমাধান করি, তাহলে a, b আর c এর জন্য মান বের হবে,

$$c = r^2\left(1 + \frac{\pi}{3} - \sqrt{3}\right)$$

$$b = r^2\left(\frac{\pi}{12} - 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$a = r^2\left(1 - \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

c আমাদের দরকার ছিল। কিন্তু আগেই বলেছি, তিনটাই পাবো। এগুলোতে শুধু r বা মূল বর্গের বাহুর মান বসিয়ে দিলেই কাজ শেষ। পেয়ে যাবো আমাদের শখের ক্ষেত্রফল!
তো, এবার বলুন দেখি, c যদি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হয় তাহলে r এর সর্বনিম্ন মান কত?

যদি বলতে পারেন, তাহলে আপনি পাচ্ছেন 100 বিসিবিয়ান ডলার পুরষ্কার!
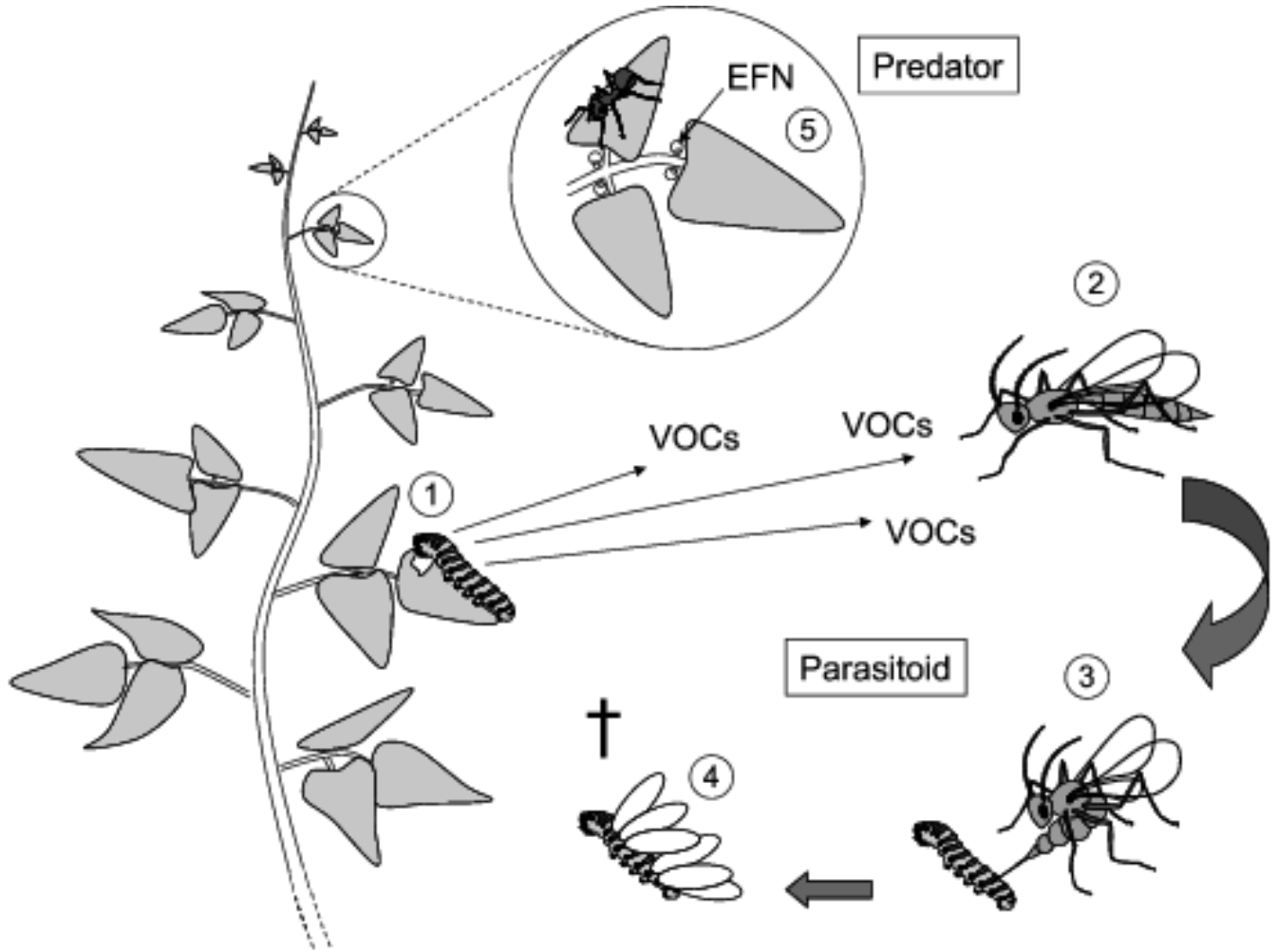
আমন্ত্রণে আত্মরক্ষা আর এক নির্মম মৃত্যু- শিম গাছের অভিনব ডিফেন্স মেকানিজম

ওমর খালিদ সোহাগ

A friend in need is a friend indeed- an unconditional friendship & loyalty in nature!

সবার কাছে একটা সুপরিচিত সবজি হল শিম। এই শিম গাছের ডিফেন্স মেকানিজম প্রকৃতিতে অনন্য, আর এই সম্পূর্ণ মেকানিজমের আড়ালে লুকিয়ে বাস্তুসংস্থানের এক অদ্ভুত গল্প।

শিম গাছের জন্য একটা ভয়ানক কীট হল ক্যাটারপিলার বা শুঁয়োপোকা। এই পোকা শিমের পাতা খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। গাছে শুঁয়োপোকার আক্রমণ একটা সাধারণ ঘটনা কিন্তু এই পোকাকে নষ্ট না করলে গাছ রক্ষা পাবে না। শিম গাছের জন্য সেই কাজ করতে পারে অন্য আর এক পোকা, যা কিনা এই শুঁয়োপোকার যম বা মেটা প্রিডেটর (মানে শিকারীর শিকারী)। এই শুঁয়োপোকার হাত থেকে বাঁচার জন্য বিবর্তনের ধারায়

শিমগাছ এক বিশেষ ক্ষমতায় নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে, শিমগাছ বিশেষ ভাবে সেই শুঁয়োপোকা হত্যাকারী পোকাকে প্রয়োজনের সময় নিজের কাছে ডেকে নিতে পারে, যাতে করে সেই পোকা এসে শুঁয়োপোকাকে নষ্ট করতে পারে আর গাছকে বাঁচাতে পারে। এই মেটা প্রিডেটর পতঙ্গগুলো Glyptapanteles গণের অন্তর্ভুক্ত।

ক্যাটারপিলার হত্যাকারী এই পোকার বংশগতিও আসলে ক্যাটারপিলারকে হত্যা করার মাধ্যমেই টিকে আছে। এই পোকার ডিম পাড়ার জন্য দরকার হয় ক্যাটারপিলার। পোকা এসে ক্যাটারপিলারকে আক্রমণ করে, এর দেহে এক ধরনের হুল ফুটিয়ে ডিম ইনজেক্ট করে। মানে ক্যাটারপিলারের দেহের ভেতরে ডিম পাড়ে এই পোকা। ডিম ফুটে এক সময় বের হয় অনেক লার্ভা, যা ক্যাটারপিলারের দেহ ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে। এই লার্ভাও যথেষ্ট চালাক। তারা জানে যে নিজেরা শক্তিশালী না হওয়ার আগেই যদি ক্যাটারপিলার মারা যায় তাহলে তারা খাদ্য পাবে না, তারাও মারা যাবে। এজন্য সুগঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা কেবল ক্যাটারপিলারের রক্ত খায়, দেহের অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশে হাত লাগায় না। রক্ত খেয়ে তাদের বেরিয়ে আসার মত ক্ষমতা হলে এবার তারা খেতে শুরু করে দেহের অন্যান্য অংশ। এই সময়ের মধ্যে তাদের ধারালো দাঁতও গজিয়ে যায়, যেটা দিয়ে তারা কাটতে শুরু করে ক্যাটারপিলারের দেহ। এসময় লার্ভাগুলো এক ধরনের কেমিক্যাল রিলিজ করে যা ক্যাটারপিলারকে প্যারালাইজ করে দেয়, যাতে করে তাদের বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়ায় কোনো বাধা না পড়ে। ভেতর থেকে খেতে খেতে দেহ ছিড়ে বেরিয়ে আসে সব মেটা প্রিডেটরগুলো, নিজেকে রক্ষা করার জন্য কিছুই করতে পারে না ক্যাটারপিলার। এক সময় নির্মমভাবে মৃত্যু হয় ক্যাটারপিলারের।

শিমের পাতায় যখন ক্যাটারপিলার এসে কামড় বসায় তখন গাছে এক ধরনের কেমিকেল রিয়্যাকশন শুরু হয় যাতে করে গাছ বুঝতে পারে যে সে বিপদগ্রস্ত। আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য এসময় সেই গাছ এক বিশেষ ধরনের কেমিক্যাল বা গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। এই গন্ধ হলো সেই শুঁয়োপোকা হত্যাকারী পোকার জন্য আমন্ত্রণবার্তা। সেই পোকাও শিম গাছের আশেপাশেই থাকে। গন্ধ পাওয়া মাত্র সে জেনে যায় যে তার জন্য খাবার রেডি, ডাক পড়ে গেছে বন্ধুর। আর দলে দলে পোকা চলে আসে শিমগাছে, শুঁয়োপোকায় নিজের ডিম ঢুকানোর জন্য আর শিমগাছকে বাঁচানোর জন্য।

.এই প্যারাসিটিক পতঙ্গ অনেক ক্ষেত্রে ক্যাটারপিলারের 'মাইন্ড কন্ট্রোল' করতে পারে। ক্যাটারপিলারের পেট ছিঁড়ে পতঙ্গের লার্ভাগুলো বেরিয়ে আসার পরে ক্যাটারপিলারের মৃত্যু হয় না, বরং নতুন বেরিয়ে আসা লার্ভাগুলো এবার প্রকৃতিতে উন্মুক্ত হয়ে যায় যাদের নিজেদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা এখনও তৈরি হয়নি, নিজেদের রক্ষা না করলে এরা আবার শিকার হতে পারে অন্য

কোনো প্যারাসিটিক অর্গানিজমের। হ্যাঁ, এদের ভেতরে ডিম পাড়বে এমন প্যারাসিটিক অর্গানিজমও আছে প্রকৃতিতে, তাদের বলা হয় Hyperparasitoids। যাই হোক, নিজেদের রক্ষা করার জন্য এরা সর্বোচ্চ যেটা করতে পারে সেটা হলো নিজেদের চারপাশে রেশমের মতো তন্তু দিয়ে এক ধরনের আবরণ তৈরি করা, যা তাদেরকে বাইরের আক্রমণ এবং বৈরী পরিবেশের হাত থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু এই আবরণ যথেষ্ট না। এই সময় শুরু হয় আহত ক্যাটারপিলারের এক অদ্ভুত আচরণ। সাধারণত একটা সুস্থ ক্যাটারপিলার তার চারপাশে রেশম তন্তুর মতো পদার্থের আবরণ তৈরি করে নিজেকে রক্ষার জন্য। কিন্তু এই আহত ক্যাটারপিলার এবার বেরিয়ে আসা লার্ভার উপরে, চারপাশে সেই রেশমের মত পদার্থের চাদর বুনে দেয় যা তাদের দ্বিতীয় সুরক্ষা প্রাচীর হিসেবে কাজ করে। এই চাদরের উপরে ক্যাটারপিলার লার্ভাগুলোর বডিগার্ড হিসেবে বাস করে, আর এক সময় খাদ্যের অভাবে মারা যায়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এর কাজ হয় নিজের হত্যাকারীর লার্ভাকে সুরক্ষা দেওয়া, এক মুহূর্তের জন্যও ক্যাটারপিলার তার এই নতুন দায়িত্ব ছেড়ে খাবারের খোঁজে অন্য কোথাও যায় না। ক্যাটারপিলারের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা ধারণা করে যে প্যারাসিটিক পতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হবার সময় এর দেহে সেই পতঙ্গ এক ধরনের ভাইরাস ছেড়ে দেয়, যা আস্তে আস্তে ক্যাটারপিলারের ব্রেইনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় এবং লার্ভা বেরিয়ে আসার এই পর্যায়ে তাকে দিয়ে এমন কাজ করায় যেটা স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো ক্যাটারপিলার করে না।

.

শিম গাছ দিয়ে গল্পটা বললাম কিন্তু এই একই মেকানিজম প্রকৃতিতে আরও অনেক গাছের আছে (যেমন ভুট্টা, বেগুন, বরবটি ইত্যাদি)। সবাই

.

ক্যাটারপিলারের আক্রমণে এভাবে গন্ধ ছড়িয়ে প্যারাসিটিক পতঙ্গকে সংবাদ পাঠায়, আর তারা এসে ক্যাটারপিলারকে নষ্ট করে, নিজের বংশবৃদ্ধি করে, একই সাথে গাছকেও বিপদ থেকে বাঁচায়। গাছের এই ডিফেন্স মেকানিজম যথেষ্ট ইফেক্টিভ। বাগানের একটা গাছের একটা পাতায় আক্রমণ হলেও সেই সম্পূর্ণ গাছ এই গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। অনেক গাছের ক্ষেত্রে তো দেখা যায় এক গাছের দেখে দেখে আশেপাশে যত গাছ আছে তারাও একই কাজ করা শুরু করে, এক পর্যায়ে বাগানের সব গাছ নিজেদের ডিফেন্স মেকানিজম এক্টিভ করে ফেলে।

বাস্তুসংস্থান এক অদ্ভুত জিনিস, কে কোথায় কাকে কিভাবে খাচ্ছে, তার খবর কেউ রাখে না। প্রকৃতি একই সাথে সুন্দর, আর নিষ্ঠুর।
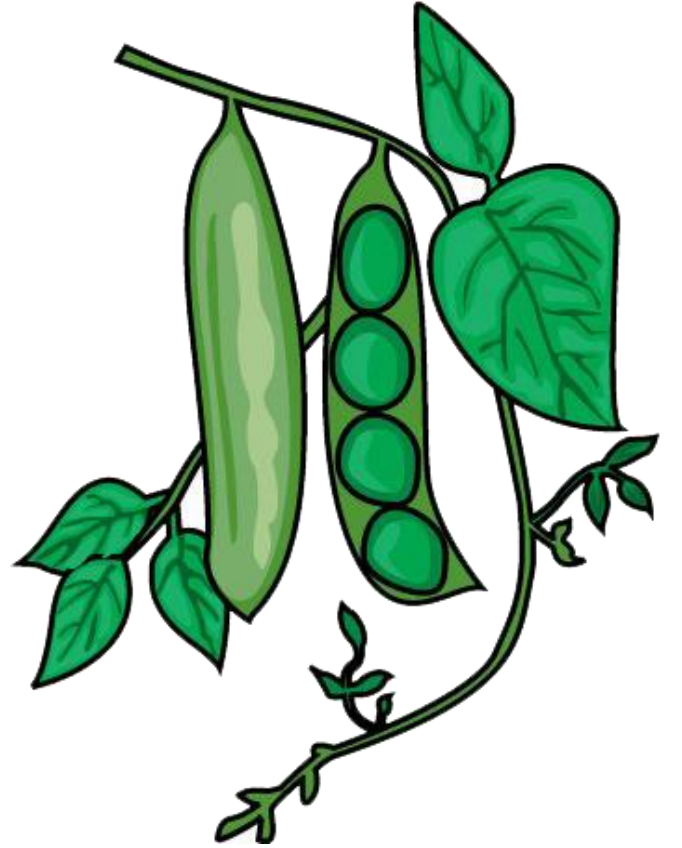
লাইরিডস উল্কাবৃষ্টি

হৃদয় হক

লাইরিডস উল্কাবৃষ্টি বেশ পুরাতন উল্কাবৃষ্টিদের মধ্যে এটি একটি হলেও এতে আগ্রহের ঘাটতি ছিলো। ফলে এই উল্কাবৃষ্টি বিজ্ঞানীদের নজর কাড়তে বেশ সময় নেয়। আমরা আগেই জেনেছি যে, উল্কাবৃষ্টির বর্ষণ হার স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হলে এদের উল্কাঝড় বলা হয়। ঠিক তেমনি ১৮০৩ সালে লাইরিডস উল্কাঝড় হয়েছিল। এটি দেখে সেইসময়কার এক সাংবাদিক লেখেন, "Shooting stars. This electrical phenomenon was observed on Wednesday morning last [April 20], at Richmond and its vicinity, in a manner that alarmed many, and astonished every person that beheld it. From one until three in the morning, those starry meteors seemed to fall from every point in the heavens, in such numbers as to resemble a shower of sky rockets. Several of those shooting meteors were accompanied with a train of fire that illuminated the sky for a considerable distance." লাইরিডস উল্কাবৃষ্টি সম্পর্কে উদ্ধৃত এই কথাগুলি সবচেয়ে জনপ্রিয়। ১৮০৩ সালের পরে এ নিয়ে কথাবার্তা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই উল্কাবৃষ্টি ছিল অবহেলিত।

তবে এই উল্কাবৃষ্টির প্রথম হদিস মেলে ৬৮৭ খ্রিষ্টপূর্বের চীনা জ্যোতির্বিদের নিকট। উনারা লেখেন, “at night the fixed stars did not appear; the night was bright. During the night, stars fell like rain, together with the rain.”

স্বাভাবিকভাবেই রাতের আকাশে অস্বাভাবিক কিছু দেখলে তা পেশাদার কিংবা অপেশাদার বা সৌখিন জ্যোতির্বিদরা নোট করে রাখেন। জ্যোতির্বিদ বাদেও অনেকেই রাখেন! ফলে পরবর্তীতে নানান দেশের

নানান জায়গা থেকেও এই উল্কাবৃষ্টির হদিস পাওয়া যায়। এমনকি ভারত থেকেও! ভারতীয় পত্রিকা Bombay Times-এ এ নিয়ে প্রকাশিত বেশকিছু ঘটনা পাওয়া যায় যা, British Association for the Advancement of Science (1852) এর ২১তম মিটিং এ রিপোর্ট করা হয়।

প্রথমটি পাওয়া যায় মুম্বাইয়ের মাজাগাঁও থেকে। সংবাদদাতা লেখেন, "a display of meteors, following each other in succession, appeared from a point about 15° above the north-eastern horizon. In the space of little more than half an hour about 20 were observed; they darted across the sky in all directions."

দ্বিতীয়টি আসে কুয়ালালামপুর থেকে। সেখানকার উনি লেখেন, "on looking out about half-past ten... the entire sky to the north was seen in a perfect blaze with meteors shooting from east to west. The phaenomenon lasted about 5 min, when all was again still."

তৃতীয় রিপোর্টটি পাওয়া যায় কানপুর থেকে। সেখানের সংবাদদাতা লেখেন, "This evening from 8 to 10 p.m. constant meteors flying across, chiefly from N. towards S., often three or four at a time. The largest I did not see. I had my face towards N., facing a white building, when suddenly the whole was a bright as you see in a vivid flash of sheet lightning."

তবে, এই অবহেলিত উল্কাবৃষ্টি ১৮৬৩ সালে স্বমহিমায় বিজ্ঞানীদের নজর কাড়তে শুরু করে। ফলে এই উল্কাবৃষ্টি ওপর গবেষণা শুরু হয়।

এই উল্কাবৃষ্টির জননী হলো (C/1861 G1) Thatcher নামের এক ধূমকেতু। প্রফেসর A.E. Thatcher ১৮৬১ সালে এই ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। সেই সালে মার্কিনরা এই ধূমকেতুর আবির্ভাব কে অশুভ লক্ষণ হিসেবে দেখেন। New York Herald পত্রিকা অনুযায়ী সেই বছর একটা সিভিল ওয়ার হবার ঘোষণা হয়। এই ধূমকেতু ৪১৫ বছরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। শেষবার একে ১৮৬১ সালে প্রদক্ষিণ করে যেতে দেখা যায়। সুতরাং, ২২৭৬ সালের আগে এর দেখা মিলবে না।

কিন্তু, এই ধূমকেতুর সাথে এই উল্কাবৃষ্টির সম্পর্ক ১৮৬১ সালেই বোঝা যায়নি। ১৮৬৭ সালের দিকেও জ্যোতির্বিদরা ধূমকেতুর সাথে নানান উল্কাবৃষ্টির যোগসূত্র স্থাপনে গবেষণা করছিলেন। সেইসময় জ্যোতির্বিদ E. Weiss যেসব ধূমকেতু পৃথিবীর খুবই নিকটে আসে তাদের অনেকেরই কক্ষপথের হিসেব করেছিলেন। আর গণনা করতে গিয়েই তিনি দেখতে পান যে, ধূমকেতু (C/1861 G1) Thatcher ২০শে এপ্রিল পৃথিবী থেকে মাত্র ০.০০২ জ্যোতির্বিদ্যা একক দূরে অবস্থান করেছিল! (পরবর্তীতে, আরো সঠিক ভাবে দূরত্ব নির্ণয় করা হলে তা পরিবর্তন হয়ে ০.৩৩৫ জ্যোতির্বিদ্যা একক হয়)। জ্যোতির্বিদ Weiss অবশ্য এই উল্কাবৃষ্টির প্রমাণ নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছিলেন। ঘাটাঘাটি করার সময় ২০শে এপ্রিল এই উল্কাবৃষ্টি দেখা যাওয়ার হদিস পেয়েছিলেন। আবার, স্বাধীনভাবে হিসাব-নিকাশ করে জ্যোতির্বিদ J. G. Galle ও লাইরিডস উল্কাবৃষ্টি এবং থ্যাচার ধূমকেতুর মধ্যে সম্পর্ক থাকার ইঙ্গিত দেন। এই সম্পর্ক স্থাপন শেষে শুরু হয় এই উল্কাবৃষ্টির যথার্থ রেডিয়ান্টের খোঁজ! এবং পরবর্তীতে নানান পর্যবেক্ষণ শেষে এই উল্কাবৃষ্টি রেডিয়ান্ট বিন্দু নির্ধারণ করা হয়। যার সাথে আমরা একটু পরেই পরিচিত হবো।

লাইরিডস উল্কাগুলো ভালোই উজ্জ্বল হয়। এতটাই উজ্জ্বল যে, এদের বেশিরভাগই ফায়ার বল হবার

সম্ভাবনা থাকে। আবার, এই ফায়ার বলগুলোও খুবই উজ্জ্বল হয়, ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের সুপরিচিত শুকতারা বা শুক্র গ্রহের থেকেও বেশি। এদের ফায়ার বলের পেছনে, প্লেনের পেছনের ধোঁয়ার মতো দেখতে যে ধোঁয়া ছড়ায় বা সহজে বললে এদের লেজ কয়েক মিনিট অবস্থান করে।

এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে এই উল্কাবৃষ্টি উপভোগ করা যাবে।

সাধারণত এই উল্কাবৃষ্টি শুরু হয় মধ্য-এপ্রিল থেকে। তখন এদের বর্ষণ হার খুবই কম থাকে। এই ধরেন ঘণ্টায় ৯টা। তবে যত রাত যায় ততই এই হার বৃদ্ধি পায়। আর সবচেয়ে বেশি হয় ২৯ তারিখ রাত ১২টার পরের দিন অর্থাৎ ২২ তারিখ সুয্যিমামা ওঠার আগ পর্যন্ত। অতঃপর আবার এই হার কমতে থাকে। কমতে কমতে ২৫শে এপ্রিলের ভেতরেই চলে যায় ZHR ৯ এর নিচে।

২৯, ২২, ২৩ এপ্রিল এই ৩ দিনই ভালো উপভোগযোগ্য রাত। তবে ২২ তারিখ ভোরের আগে হলো আদর্শ। এ সময়েই সর্বোচ্চ লাইরিডস উল্কাবৃষ্টির দেখা মেলে। ঘণ্টায় ৯০ থেকে ২৫ টার মতো। তবে ধারণা করা হয় ২০৪০ এবং ২০৪৯ সালে খুবই অল্প সময়ের জন্য এই উল্কাবৃষ্টি প্রতি ঘণ্টায় ৯০০টিরও বেশি উল্কা দেখবার সুযোগ করে দেবে। অর্থাৎ উল্কাঝড় হবে। এত বেশি হারের ঘটনা এই উল্কাবৃষ্টির জন্য প্রায় ৬০ বছর পর পর ঘটে থাকে। ৯৮০৩ সালে এদের বর্ষণ হার এত বেশি ছিল যে, প্রতি ঘণ্টায় ৭০০টির মতো দেখা গিয়েছিল। আবার ৯৯৮২ সালে সৌখিন জ্যোতির্বিদরা প্রতি ঘণ্টায় ৯০টির মতো দেখেছিলেন। ৯৯২২ সালেও একই হার পরিলক্ষিত হয়।

তবে যেমনটি বললাম। এই উল্কাবৃষ্টির ZHR কিন্তু কম। তাই বেশি আশা করা উচিত হবে না। অবশ্য, চাঁদ, মেঘ এবং আলোক দূষণ না থাকলে এই উল্কাবৃষ্টি ভালোই উপভোগ্য। আর ফায়ারবলের দেখা পেলে তো কথাই নেই। তবে, এ-সবের সমস্যা বেশি থাকলে উল্কাবৃষ্টি নিয়ে আশা খুবই কম রাখতে বলব।

নামকরণ

লাইরিডস উল্কাবৃষ্টির নামকরণ করা হয়েছে মূলত লাইরা (Lyra) বা বীণা মণ্ডল থেকে। যদিও এই উল্কাবৃষ্টির রেডিয়েন্ট মূলত হারকিউলিস মণ্ডলে অবস্থিত। তবে যখন এর নামকরণ করা হয় তখন আসলে আকাশপটে আমাদের আধুনিক ও নির্দিষ্ট ৮৮টি মণ্ডল ছিল না। এক এক জায়গায় এক এক তারার ম্যাপ ছিল। এই উল্কাবৃষ্টির রেডিয়ান্ট যদিও বীণা মণ্ডলের ভেগা বা অভিজিৎ তারার মোটামুটি নিকটে বা বীণা এবং হারকিউলিস মণ্ডলের সীমানার মোটামুটি মাঝামাঝি অবস্থিত, কিন্তু কড়ায়গণ্ডায় তা হারকিউলিস মণ্ডলের সীমানার ভেতরেই পড়ে।

বলে রাখা ভালো যে, হারকিউলিস মণ্ডল অনুজ্জ্বল হওয়ায় আকাশে বীণা মণ্ডলের সাহায্য ছাড়া একে খুঁজে পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। আমরা আকাশে বীণা মণ্ডলকে খুঁজব, সেইসাথে লাইরিডস উল্কাবৃষ্টির রেডিয়েন্ট'ও খুঁজে বের করব তবে, এর আগে বীণা মণ্ডলের পুরাণ ও ইতিহাস জানা যাক।

বীণা মণ্ডলের ইতিকথা

আকাশের তারাচিত্রে এখানে একটি হার্পের কল্পনা করা হয়। হার্প হল বীণা জাতীয় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। বেশিরভাগ বর্ণনায় দেখা যায় সূর্যদেব অ্যাপোলোর পুত্র আরফিয়াস ছিলেন থ্রেস নগরীর সেরা হার্পবাদক। আরফিয়াস তার পিতা থেকে এই হার্পটি উপহার পান। তিনি এটি এতই মধুর সুরে বাজাতেন যে, বন্যপ্রাণী থেকে গাছপালা পর্যন্ত তার সুরে স্তব্ধ হয়ে যেত।

পুরাণের এক বর্ণনায় পাওয়া যায় আরফিয়াস তার স্ত্রী কে হারালে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক সুরে গান করেন যে দেবতারাও কাঁদতে থাকেন। পরে সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে

আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলে তিনি প্রায় পাগল হয়ে যান। আগে তিনি ডায়োনিসাসের পূজক থাকলেও পরে সূর্যদেব অ্যাপোলো বাদে ডায়োনিসাসের পূজা না করায় অপদেবী মেইনাডারার হাতে মৃত্যু ঘটে। তবে তার দেহ হতে আলাদা হয়ে যাওয়া মাথাটি স্বাভাবিক স্বভাবেই গাইতে থাকে। পরে মাথাটি নদীতে পড়ে গিয়ে এক দ্বীপে গিয়ে পৌঁছালে সেখানের বাসিন্দারা তাকে মাটি চাপা দিয়ে একটি মন্দির বানান। পরে দেবী মুজেরা হার্পটিকে নিয়ে স্বর্গে গেলে তার সম্মানে এই বাদ্যযন্ত্রকে আকাশের লাইরা মণ্ডল হিসেবে স্থাপন করা হয়।

আর ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় এই মণ্ডলে একটি বীণার কল্পনা করে নাম রাখা হয়েছে বীণা মণ্ডল। সনাতন ধর্মের প্রায় সকলেরই দেবর্ষি নারদকে জানার কথা। কোনো কোনো বর্ণনা মতে তিনিই বীণা যন্ত্রের উদ্ভাবক। তার প্রিয় এই বীণাটিই যেন রাতের আকাশে আমরা দেখি।

আকাশপটে বীণা মণ্ডল

এ সময়ে বীনা মণ্ডল উদিত হয় রাত প্রায় ১০টার দিকে। ওঠার সময় উল্কাবৃষ্টি দেখা যায় না বললেই চলে। তবে রাত যত গভীর হয় মণ্ডলটিও তত ওপরে আসে। রাত ৪টা ৪০ মিনিটের দিকে আকাশে এর অবস্থান থাকে সর্বোচ্চ। এর পর আস্তে আস্তে নেমে যায় অস্তের পথে অতঃপর সকাল ১১টা ৫৮ মিনিটে চলে যায় দিগন্তের নিচে।

সাধারণত রাত ১২ টার পর সময় যতই আগায়, ততই উল্কাদের বেশি দেখার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে বীণা মণ্ডল যেহেতু ১০টার দিকে ওঠবে আমরা প্রায় ১১টা থেকেই মোটামুটি উল্কাবৃষ্টি দেখতে পাব। সোজা কথায়, রাত যত গভীর দেখার সম্ভাবনাও তত বেশি।

রাত ১২টার দিকে, আপনার অবস্থান থেকে সোজাসুজি উত্তর-পূর্বে তাকালে হালকা পূর্বেই নজর কাড়বে বেশ বড়ো বা উজ্জ্বল একটা তারা। এটি তখনকার সেদিকের আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা। এই তারার নিচে এবং ডানের ৪টি তারা দিয়ে একটি সামান্তরিক কল্পনা করা যায়। আর এদের নিয়েই বীণা মণ্ডল গঠিত। উক্ত বড়ো তারার পাশ্চাত্য নাম ভেগা, বাংলায় অভিজিৎ। রাতের আকাশের ৫ম তম উজ্জ্বল তারা। এই মণ্ডলের ওপরেই হারকিউলিস মণ্ডল অবস্থিত। তবে আমাদের রেডিয়েন্ট হলো, অভিজিৎ তারা থেকে হালকা ওপরে এবং ডানে।

আরেকটু সহজ করি। অভিজিৎ কে পাওয়ার পর একে কেন্দ্র করে, আপনার বাসায় যে দেয়াল ঘড়ি আছে সেই দেয়াল ঘড়িতে ১ বা ২ এ কোনো কাঁটা এলে সেই কাঁটাটি যে অবস্থায় থাকে, আপনার বাম হাতের শাহাদাত আঙুলটিও একই অবস্থায় অভিজিৎ তারাকে কেন্দ্র করে রাখুন। তাহলে শাহাদাত আঙুলের মাথাটি যেই স্থানে শেষ হয়েছে, আকাশের ওই স্থানের রেডিয়ান্ট বিন্দু।

মনে রাখবেন যত রাত হবে তারার অবস্থান পরিবর্তন হবে। অভিজিৎ তারাটি আরো ওপরে আসতে থাকবে। যেহেতু, রাত ৪টা ৪০ মিনিটের দিকে আকাশে মণ্ডলটির অবস্থান থাকে সর্বোচ্চ। তার এর আশেপাশের সময়ে দেখতে গেলে তুলনামূলক বেশ উত্তর দিকে এবং আরো কিছুটা ওপরের দিকে তাকালে অভিজিৎ তারাকে পাবেন।

সংযুক্তি: এবার চাঁদ ২টার দিকে অস্ত যাবে। তাই ২টার পরে দেখতে যাওয়া উচিত।

বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বনভূমি **সুন্দরবন**। সুন্দরী গাছের আধিক্যের জন্যই এমন নাম। জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এ জায়গার রয়েছে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য আর রামসার সাইট এর স্বীকৃতি।

সিলেটের সুনামগঞ্জে অবস্থিত বাংলাদেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট আর মিঠাপানির জলাধার **টাঙ্গুয়ার হাওর**। ক্ষেত্রফল ১০০ কিলোমিটার। স্থানীয় লোকজনের কাছে হাওরটি *নয়কুড়ি কান্দার ছয়কুড়ি বিল* নামেও পরিচিত।

হাকালুকি হাওর হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো হাওর। সিলেটের মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় বিস্তৃতি। সবচেয়ে বড়ো এ মিঠাপানির জলাধারের ক্ষেত্রফল ১৮১.১৫ বর্গ কিমি।

বাংলাদেশের একমাত্র মিঠাপানির জলাবন **রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট।** সিলেটের গোয়াইন নদীর কোল ঘেঁষে উনার অবস্থান।

ঢাকার অদূরে দেশের অন্যতম বড়ো বিদ্যাপিঠ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে প্রাণী ও উদ্ভিদের এক অভয়ারণ্য। এর জলাশয় বহু অতিথি পাখিদের সাময়িক আবাসস্থান।

মৌলভীবাজারের **লাওয়াছড়া** সুন্দরবনের পর সবচেয়ে পরিচিত নাম। এই রেইন ফরেস্টে রয়েছে দুর্লভ সব গাছপালা এবং পশুপাখি সহ বহু বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণীর আবাস।

প্রাকৃতিক অপার সৌন্দর্যের এক স্থান কক্সবাজারের **হিমছড়ি**। শীতল পানির ঝরনা, মেরিন রোডপাশে , কারও আকর্ষণের -সমুদ্র সৈকতসহ বিষয়গুলো যে স্থান হবে।

দেশের পাহাড় বেষ্টিত তিনটি জেলার একটা **বান্দরবান**। প্রাকৃতিক জলাধার, ঝর্ণা, লেক, আঁকাবাঁকা নদী, সর্বোচ্চ পর্বত চূড়া মিলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এটি।

IUCN Red List

মুস্তফা কামাল জাবেদ

জীবজগত নিয়ে যারা একটুখানি ঘাঁটাঘাঁটি করেন কিংবা দু-একখানা প্রবন্ধ পড়েন তারা IUCN এর Red List এর নাম প্রায়ই শুনে থাকবেন। যেখানেই কোনো প্রজাতির আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করা হয় সেখানেই দেখা যায় IUCN ব্যাটা EX, CR কিংবা VU এর মতো কিছু ট্যাগ জুড়ে দিয়েছে। এইরকম ট্যাগ দেওয়ার হেতুই বা কী আর এরাই বা কারা? এইরকম প্রশ্ন কারো মনে জাগুক আর না জাগুক, মনকে নাইলনের রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে চলুন জীবজগতের রক্ষাকর্তার দেশে কয়েক মিনিটের জন্য ট্রিপ দেওয়া যাক।

IUCN হলো International Union for Conservation of Nature, প্রকৃতি আর তার মাঝে থাকা অপরূপ জীববৈচিত্র্য নিয়েই উনাদের কাজকারবার। জীবজগতের কোনো প্রজাতির সংরক্ষণের অবস্থা জানাতে ১৯৬৪ সালে যাত্রা শুরু করা এই তালিকা মহোদয়ের জুড়ি মেলা ভার। শুধু তালিকা দিয়েই যে তারা ক্ষান্ত হয় এমন না, বিপন্ন কিংবা বিলুপ্তির পথে আছে এমন প্রজাতিকে সংরক্ষণের জন্য আঞ্চলিক শাখা থেকে উপরের লোকজনের (!) দৃষ্টি আকর্ষণ, মাঠ পর্যায়ে কাজ এসবও করা হয়ে থাকে।

IUCN খুব করে চায় প্রতি ৫ বছর পর পর একটা প্রজাতির বর্তমান অবস্থা হালনাগাদ করতে, কিন্তু চাইলেই কি আর সব সম্ভব হয়? তাই তো কিছু ক্ষেত্রে ১০ বছর পর পর করা লাগে। আর হালনাগাদ প্রক্রিয়াটাও যে চাট্টিখানি কথা এমন না, পিয়ার রিভিউড পদ্ধতিতে করা এ মূল্যায়নের (evaluation) অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়াও বিবেচনায় রাখা লাগে।

একদম তাজা খবর অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ১৩৪,৪০০ এরও বেশি প্রজাতিকে মূল্যায়ন (evaluate) করা হয়ে গেছে। যার মাঝে আছে পশুপাখি, তরু-লতা আর আমাদের সবার প্রিয় ব্যাঙের ছাতা (ছত্রাক)। এই বড়ো হিসেবনিকেশ নিয়ে গর্ব হলেও, খারাপ খবর হলো এর মাঝে থাকা ৩৭,৪০০ টি প্রজাতিই বিলুপ্তির পথে। কেউ

হয়তো হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে, কেউবা হয়েছে লম্বা সময় ধরে চলা মহামারীতে, কেউবা আবার আমাদেরই হাতে জীবন দিয়েছে! এই তো কদিন আগেই, একদম বিলুপ্ত নীলগাইকে দি গ্রেট মানুষের হাতে কয়েকবার প্রাণ দিতে দেখা গেল, সুইট না?

অনেক প্যাঁচাল হলো, এখন ৫ টা ক্রাইটেরিয়া (মানদণ্ড) দেখা যাক।

১. মৃত্যুহার।
২. জীবনের আঙিনা, আই মিন ভৌগোলিক পরিসীমা।
৩. একই প্রজাতির সংসার আগে থেকেই ছোটো কি না (মানে আগে থেকেই সংখ্যা কম কি না)
৪. ওই প্রজাতি নিষিদ্ধ (মানুষের অবাধ চলাচল) মানে রেষ্ট্রিকটেড কোনো জায়গায় বাস করে কি না।
৫. পরিমাণগত বিশ্লেষণে (Quantitative analysis) করা হয় জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা, বাসস্থানের আবদার আর threat হিসেব থেকে। তো এই বিশ্লেষণ থেকে ওই প্রজাতির সামনে বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না সেটা।

ক্রাইটেরিয়া তো পাওয়া গেল, বাকি রইল ক্যাটাগরি। এইবার এগুলো গলাধঃকরণ করা যাক।
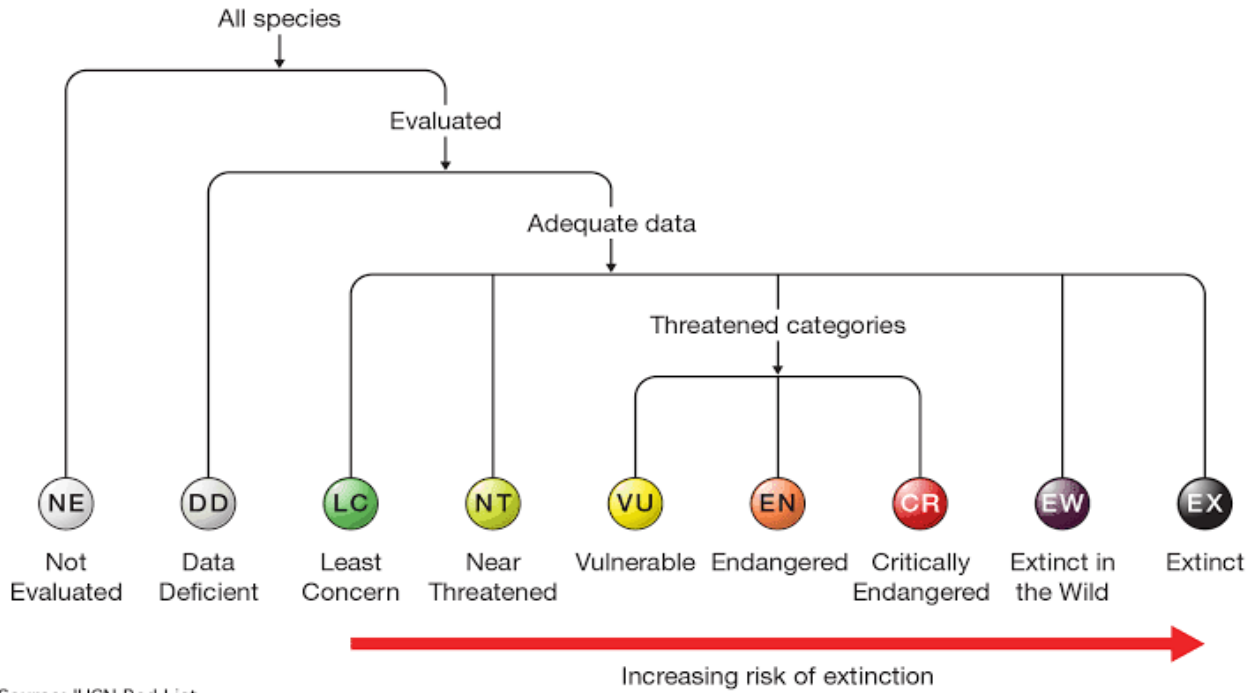
IUCN এর হিসেবে তাবৎ পৃথিবীর যত প্রজাতি আছে সবগুলোকে ধরে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **Evaluated** (যেগুলো মূল্যায়ন করা হয়েছে সেগুলো)

২*. **<u>NE</u>-Not Evaluated** (যেগুলো মূল্যায়ন করা হয়নি সেগুলো)

উপ্স! জোকের মতো হয়ে গেল। তাও বলি, এই Evaluated (মূল্যায়ন করা) প্রজাতিগুলোকে আবার ২ ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগ আর ভাগ! (-_-)

১. **Adequate Data** (পর্যাপ্ত তথ্য আছে এমন)

২*. **<u>DD</u>-Data Deficient** (একদম অল্প তথ্য আছে এমন) এদের ব্যাপারে বায়োলজিক্যালি যে কম জানা গেছে এমন না। কিন্তু IUCN এর ক্যাটাগরিতে ফেলতে হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেসব কাজ/গবেষণা করা প্রয়োজন সেসব করা হয়নি, ফলে তথ্যও...

উদাহরণ: পিগমি কিলার তিমি (*Feresa attenuata*)

এইবার এই Adequate Data কে আরো ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগের বাচ্চা! দাঁড়ান দাঁড়ান, এক্ষেত্রে Threatened ক্যাটাগরি বাদে বাকিগুলো তেমন ফরমাল না। আমরা বরং ক্যাজুয়াল বাচ্চার মতোই এগোই।

(Lower Risk-কম ঝুঁকিপূর্ণ)

১*. LC হলো সিলেটের এক ধরনের পাথর। কিডিং! <u>LC</u> মানে **Least Concerned**। এদের নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয় না। আপাতত তারা প্রায় সবজায়গাতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে আর দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। উদাহরণ: ডাহুক (*Amaurornis phoenicurus*)

২*. <u>NT</u> হলো **Near Threatened**। এদের নিয়ে এখন খুব বেশি ভাবতে হবে না যদিও। কিন্তু ভবিষ্যতে যে এরা মাথার ঘাম মাটিতে ফেলার ব্যবস্থা করবে না এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। শীঘ্রই Threatened ক্যাটাগরিতে নাম লেখানোর পাঁয়তারা করছে বোঝা যায়। উদাহরণ: এশিয়ান সোনালি (বন) বিড়াল (*Catopuma temminckii*)

(Threatened-হুমকিগ্রস্ত)

৩*. **<u>VU</u>-Vulnerable** হলো বিপদগ্রস্ত/শঙ্কাগ্রস্ত ক্রমাগত মৃত্যুর কারণে এই ক্যাটাগরির প্রজাতিরা অনেক ঝুঁকিতে আছে বলা যায়। ১০ বছর অথবা ৩ প্রজন্মে ৩০%-৫০% কমে গেছে এমন।
আর এদের বর্তমান সংখ্যা থাকবে ১০০০ এর মতো। উদাহরণ: মেঘলা চিতা (*Clouded Leopard*)

৪*. <u>EN</u> হলো **Endangered**। বাংলা করলে দাঁড়ায় বিপন্ন। কমন জিনিস, না? অনেক জীব মারা যাওয়ায় এরকম অবস্থা তৈরি হয়। যদি দেখা যায় ১০ বছর অথবা ৩ প্রজন্মে ৫০%-৭০% কমে গিয়েছে আর সংখ্যা ২৫০ এর কম তবে তাকে বিপন্ন ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়। উদাহরণ: বাঘ/রয়েল বেঙ্গল টাইগার (*Panthera tigris tigris*)

৫*. **<u>CR</u> Critically Endangered** হলো মহাবিপন্ন। বিপন্নের পরের ধাপ হলো এটি। গণহারে অথবা অন্যভাবে মৃত্যুর কারণে যখন পপুলেশন শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ কমে যায় তখন তাকে মহাবিপন্নের কাতারে ফেলা হয়। এই ক্যাটাগরির সবাই শীঘ্রই বিলুপ্তির পথে হাঁটবে। এদের ইন্ডিভিজুয়াল ধরা হয় ৫০ এরও কম। উদাহরণ: চীনা বনরুই (*Manis pentadactyla*)

(Extinct-বিলুপ্ত)

৬*. **<u>EW</u>-Extinct In Wild** বুঝতেই পারছেন, এটা হলো বিলুপ্তির প্রথম ধাপ। বন্যজগতে সে নেই-ই। যা আছে সেটাও কৃত্রিমতার ছোঁয়ায়। চিড়িয়াখানা বা এই টাইপ জায়গায়। উদাহরণ: সবুজ ময়ূর (*Pavo muticus*)

৭*. **<u>EX</u>-Extinct** এই হলো আমাদের সর্বশেষ ধাপ, বিলুপ্ত! এইখানে লাস্ট ইনডিভিজুয়াল যে আছে সে মারা গেছে। নয়তো কয়েকটা লগে এই প্রজাতির কোনো চিহ্নই পাওয়া যায়নি। উদাহরণ: শ্লথ ভালুক/মন্থর ভালুক (*Melursus ursinus*)

আরেকবার দেখে নিই,

CR
Critically Endangered

(এইখানে সবগুলো ফ্যাক্টর নিয়ে বলা হয়েছে যে এমন না। ক্রাইটেরিয়া ৫ টাই বিবেচনা করা হয়। যদিও পপুলেশনেরটা মেজর হিসেবেই থাকে। পার্শিয়াল ফ্যাক্টরসহ সবগুলো নিয়ে ডিটেলস জানতে IUCN RED LIST Category and Criteria তে ঢু মারতে পারেন। আর মেইন ক্যাটাগরিগুলোতে অ্যাস্টারিস্ক (*) দেওয়া আছে সাথে ব্র্যাকেটে ওই ক্যাজুয়াল বাচ্চাগুলো)

দশের লাঠি একের বোঝা বলে একটা কথা আছে, এক্ষেত্রেও এই পুরো কাজ IUCN একা করে না। তাদের সাথে কাজ করে, BirdLife International, the Institute of Zoology (the research division of the Zoological Society of London), the World Conservation Monitoring Centre এবং আরো অনেকে। রেড লিস্টের অর্ধেকই উনাদের হাত ধরে এসেছে।

IUCN Green Status, এইটাকে রেড এর উলটো ধরে সংরক্ষণ করা লাগবে না এমন প্রজাতির তালিকা ধরলে ভুল হবে। মূলত জীববৈচিত্র্যকে খুব ভালোভাবে সংরক্ষণ এর জন্য এই উদ্যোগ। ভালোরকম জীববৈচিত্র্য আছে এমন জায়গাকে সংরক্ষণ আর সচেতনতা এসব বেসিসে ০%-১০০% এর স্কোর ফলো করে **Green List** স্ট্যাটাসের ট্যাগ দেওয়া হয়।

আমাদের ছোট্ট সুন্দর এই গ্রহকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। দিনে দিনে আমরাই তাকে বাসের অযোগ্য করে তুলছি, সাথে সাথে হারিয়ে ফেলছি পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ গাছপালা আর পশুপাখিকে। একটুখানি ভালোবাসা আর যত্ন নিয়ে যদি আমরা চারপাশটা দেখা শুরু করি তাহলেই পরিবর্তন আসা শুরু করবে। কোনো এক সময় যে ২০২১ এর পৃথিবী দিবসের থিম **Restore Our Earth** কে আমরা পাস্ট টেনসে নিয়ে পড়তে পারি সেই প্রত্যাশাই রইলো।

বিকেল বেলার গল্প

রিজুফা জামান শোভা

এখন বিকাল ৫টা। নিশি আর শশী বেরিয়ে পড়েছে হাঁটতে। প্রায়ই হাঁটতে বেরোয় দুই সখী। আজ বেরিয়েছে নার্সারির উদ্দেশ্যে। নিশি কিছু ফুলগাছ কিনবে তার বাগানের জন্য। পথিমধ্যে নানান গল্প তাদের।

আজ কথা হচ্ছে নিশির ফুলবাগান নিয়ে। শশী হা করে শুনছে শুধু।

তারা এখন বাড়ি ফিরছে। এ মা! শশীর মন খারাপ কেন?!

-শশী, কী হয়েছে?

-তুমি তো জানোই, আমি গাছ ভীষণ ভালোবাসি। কিন্তু আমরা এখানে ভাড়া বাসায় থাকি। গাছ লাগানোর সেরকম কোনো জায়গা নেই। নার্সারিতে এত এত গাছ দেখে একটু মন ভার, আর কিছু না।

-তুমি আগে বলবে না? বাড়িই তো চলে আসলাম। যাহোক, কত ধরনের ইন্ডোর প্ল্যান্ট আছে! যেমন ধরো, স্পাইডার প্ল্যান্ট।

-স্পাইডার লিলির কথা বলছ?

-না গো বাবা।

-তাহলে?

উদ্ভিদ পরিচিতি:

'স্পাইডার প্ল্যান্ট' নামে সমাদৃত।

আরো যেসব নামে ডাকা হয়: Spider Ivy, Ribbon plant.

কোনো এক শ্রদ্ধাভাজন সায়েন্টিস্টের আদর করে রাখা নাম, অর্থাৎ বাইনমিয়াল নেইম: *Chlorophytum comosum*

Family: Asparagaceae

Sub-family: Agavoideae

Order: Asparagales

-আচ্ছা। এরা পেটদের (Pets) জন্য কতটা হার্মফুল? আমার পুষি একটু দুষ্ট স্বভাবের, তাই জিজ্ঞেস করছি। শুনেছি, রিধি ওর বিড়ালের দরুন বাসায় অ্যালোভেরা রাখে না। অ্যালো প্ল্যান্ট কনজিউম করে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল বিড়ালটা।

-The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) অনুসারে, পেটদের জন্য স্পাইডার প্ল্যান্ট নন-টক্সিক প্ল্যান্টদের তালিকাভুক্ত। তা সত্ত্বেও এদের এইসব হাউজপ্ল্যান্ট থেকে দূরে রাখতে সাজেস্ট করা হয় এবং পাতা খাওয়ায় নিষেধ আছে। স্পাইডার প্ল্যান্টে থাকা ক্যামিক্যাল কম্পাউন্ডস এদের পেটে ব্যথা, বমি, ডায়রিয়া-এসব সমস্যার কারণ হতে পারে।

আর হ্যাঁ, অ্যালোভেরা পেটদের জন্য টক্সিক।

-বুঝলাম। এবার এদের বেনেফিটগুলো বলো।
-হি হি, বাসা যাবে না?
-সমস্যা নেই। মাকে বলে এসেছি যে তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি।
-শোনো তবে।

"কই মাছের প্রাণ।"-প্রবাদটা এই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বেশ মানিয়ে যায়।
আই মিন, এরা সহজে মরে না। যদিও এদের অভিযোজন ক্ষমতা যথেষ্ট ভালো, আলোকিত স্থান কিন্তু ডিরেক্ট সানলাইট আসে না, এমন জায়গায় এদের রাখাটাই শ্রেয়।

এই অর্নামেন্টাল ইন্ডোর প্ল্যান্ট কিন্তু যা তা কোনো উদ্ভিদ নয়। এরা বাতাসকে নির্মল করে।
ফরমালডিহাইড, একটি হার্মফুল হাউজহোল্ড ক্যামিক্যাল, যা আমাদের কাপড়চোপড়ে, কাঠ ও প্লাস্টিকের জিনিসপত্রে থাকে। তো এই ফরমালডিহাইড ঘর থেকে তাড়াতে স্পাইডার প্ল্যান্ট এতটাই ভূমিকা রাখে যে 'The NASA Clean Air Study'তে এরা সেই সেরা ৩ হাউজপ্ল্যান্টের মধ্যে আছে, যেগুলো ঘরের কমন ক্যামিক্যাল ফরমালডিহাইড এবং জাইলিন দূরীকরণে সহায়ক।
এছাড়াও কার্বন-মনো-অক্সাইড, টলুইন, জাইলিন-সহ ক্ষতিকর ক্যামিক্যালগুলো দূর করতে স্পাইডার প্ল্যান্ট এফেক্টিভ।

বেশ কিছু রিসার্চের মাধ্যমে অবজার্ভ করা হয়েছে যে, যেসব হসপিটাল রুমে স্পাইডার প্ল্যান্ট রাখা হয়েছে, সেইসব রুমের সার্জিক্যাল রোগীরা যেসব রুমে রাখা হয়নি সেসব রুমের রোগীদের অপেক্ষা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাঁদের অল্প ব্যথার ঔষধ খাওয়ানো হয়, ব্লাড প্রেশার এবং হার্ট রেট ইস্যুতে ভোগেন না, অ্যাংজাইটি কম থাকে এবং ডিপ্রেশন থেকে মুক্ত থাকেন।
অনেক জানা হলো, এইবার চলো তোমার জন্য গাছ কিনতে যাই।
-চলো।

P.C.: Plant Store Ireland & Wikimedia.

মায়াবন বিহারিনী হরিণী

মেঘদূত

ফসল কাটার পরে
শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।
এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে--
যার কোনো দাম নেই,
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয় নি কখনো।
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবীর সবকিছুতে সার্থকতা থাকতে নেই। কিছু কিছু জিনিস হয়তো শুধুই অপ্রয়োজনের, সে আপাতদৃষ্টিতে হোক কিংবা প্রকৃতপক্ষেই। এই প্রবন্ধের নামের কথাই ধরা যায়, আসলেই কি এর কোনো তাৎপর্য আছে? না কি সে নলিনী বাবুর কণ্ঠের 'নিষাদের' মতোই সার্থকতাহীন? হয়তো হ্যাঁ। হয়তো না। কে জানে!

এমনই হয়েছে আমাদের বনফুলগুলোর ভাগ্য। সার্থকতা কিংবা প্রয়োজনের বালাই নেই বলে অনাদরে অবহেলায় থাকে। না পায় ভালোবাসা, না পায় আদর যত্ন। সবার অলক্ষ্যে অনেকখানি অভিমান নিয়ে দিনশেষে ঝরে যায়। রূপ লাবণ্যে কিংবা সুগন্ধে বাগানের ফুল থেকে যে উনারা কম যান এমন না। তবুও কেন জানি মর্যাদাহীন হয়েই তাদের জীবন কাটে। ফিলোসফি টাইপ কথা অনেক হলো, এইবার গুটিকয়েক বনফুল সম্পর্কে জানা যাক।

নীলফুল

লতা জাতীয় এই গাছের নিবাস পাহাড়ে। বড়ো বড়ো পাতা আর ডালের মাথায় বড়ো হালকা নীল ফুলের থোকা। লতানো এই গাছটি ২০ মিটার পর্যন্ত বড়ো হয়। অপরূপ এই ফুলের কারো সাথে তুলনা চলে না। এই নাম তেমন প্রচলিত না, সাথে করে আকাশনীল, নীল বনলতাও বলা যায়।

ইংরেজি: Bengal clockvine
বৈজ্ঞানিক নাম: *Thunbergia grandiflora*

রুয়েলিয়া/পটপটি

এই ফুলের খুব ভালো কোনো বাংলা নাম নেই। রুয়েলিয়া নামটা সুন্দর, আর প্রচলিতও। পটপটি নামটাও খারাপ না, তাৎপর্য তো আছেই। ফল ফেটে যায় বলে কেউ বলে পটপটি, কেউবা আবার চটপটি, খাওয়ার চটপটি না কিন্তু ;)। ফুল কলমি ফুলের মতো, রং হালকা বেগুনি। ষোড়শ শতকে গির্জায় মাটি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দেখে স্পেনীয় ধর্মযাজক মেক্সিকো থেকে এই গাছ নিয়ে আসেন। বর্ষজীবী এই গুল্মের পাপড়ির উপরের অংশ ৫ ভাগে বিভক্ত।

ইংরেজি: Popping pod
বৈজ্ঞানিক নাম: *Ruellia tuberosa*

হৈমন্তী/ছোটো ছাতিম

বাংলা সাহিত্যের হৈমন্তীর কথা তো সবাই-ই জানি, আজ বনের হৈমন্তী কে দেখি। সাতটি পাতা নিয়ে দলবেঁধে আমাদের সপ্তপর্ণী তথা (বড়ো) ছাতিম তৈরি হয়। এ তো ছোটো, তাই এর পাতার ৩/৪ টা স্তবক। এর ফুলের গুচ্ছ যেন বড়ো ভাইয়ের থেকেও বেশি সুন্দর। চারদিকে ছড়িয়ে পড়া গুচ্ছ থেকে মন-মাতানো সৌরভ ভেসে আসে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে ফুল ফুটতে শুরু করে, তখন বনে গেলে এর মিষ্টি ঘ্রাণের সুবাসে ভাসতে হবে।

ইংরেজি: Hard milkwood
বৈজ্ঞানিক নাম: *Alstonia macrophylla*

আমরুল

"আমি ছোটো আমাকে মেরো না" টাইপ ছোটোখাটো ফুল। রং হিমুর পাঞ্জাবির মতো হলুদ। ফুল যেমন তেমন, পাতা অনেক বাহারি। পাতাই যেন আরেক ফুল হয়ে ডানা মেলেছে। কই মাছের প্রাণ নিয়ে বিরূপ পরিবেশেও টিকে থাকে। সাধারণত ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় জন্মে।

ইংরেজি: Indian sorrel
বৈজ্ঞানিক নাম: *Oxalis corniculata*

চাঁদমালা

চাঁদের মালা চাঁদমালা, নামটা সুন্দর না? ফুলটাও খুব সুন্দর। এই অনিন্দ্য সুন্দর ফুলের বসতবাড়ি পানিতে হওয়া সত্ত্বেও বনফুলের তালিকায় দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। (যদিও নওয়াজেশ আহমেদের বনফুল বইয়ে এইটা আছে) ভাসন্ত এ গাছ লম্বা হতে হতে ৩ মিটারও চলে যায় কখনো। যখন ফুল ফোটে তখন মনে হয় যেন অনেকগুলো তারার মেলা বসেছে। হার্ট শেইপের পাতাওয়ালা এই ভদ্রমহিলাকে বড়ো চাঁদমালা আর পাচুলিও ডাকা হয়।

ইংরেজি: Water snowflake
বৈজ্ঞানিক নাম: *Nymphoides indica*

অনন্তলতা

অনন্ত অসীম টাইপের লতাওয়ালা এই বিদেশিনীর জন্য যুতসই নাম, অনন্তলতা। আদিনিবাস পৃথিবীর ওই প্রান্তের আমেরিকায়। মেয়েদের প্রিয় (মেইবি) রঙে নিজেকে ঢেলে সাজানো এই ফুল বেশি ফোটে এপ্রিল থেকে নভেম্বরের দিকে। বনের এই বাগানবিলাসের হালকা সবুজ পাতা কাশিতে উপকারী।

ইংরেজি: Coral vine
বৈজ্ঞানিক নাম: *Antigonon leptopus*

কালো বাসক

সবার চিরপরিচিত শুভ্র বাসকের চাচাতো বোন এই অভিনব কালো বাসক। নামের মধ্যে কালো থাকলেও ইনি মোটেও কালো নন। অপূর্ব নীল রঙে ছাওয়া এই ফুলের রূপ দেখে যে-কেউ মুগ্ধ হতে বাধ্য। আছে গাঢ় সবুজ রঙের রাগী চেহারায় আশকরার ভাব আছে এমন পাতা। শীতের শেষ থেকে বসন্ত পর্যন্ত ফোটা এই ফুলের ছোট্ট ছোট্ট বীজ থেকে চারা গজানো ভারি কঠিন। আদর করে কেউ কেউ একে মুরালিপাতাও ডাকেন।

ইংরেজি: Blue sage
বৈজ্ঞানিক নাম: *Eranthemum pulchellum*
অনেক বিরক্ত করা হলো, এইবার বিদায় নিই। আবার কোনো একদিন দেখা হবে অন্য কোনো জগতে অন্য কিছু মায়াবিনী ফুল হাতে রেখে, ততদিন পর্যন্ত ভালো মন্দ দুটোতে মিলেমিশে থাকবেন, কে জানে মন্দেরও হয়তো ভালো আছে!

শেষ বেলায় মহাদেব সাহার বাণী শুনে যাই,

ফুলগুলি কোথায় ফুটেছিল? কাননে,
না স্বচ্ছ সরোবরে? ফুলগুলি কি
ফুটেছিল গীতবিতানের পাতায়, নাকি
শান্তিনিকেতনে? ফুলগুলি ফুটেছিল
কোন আকাশের বুকে? ফুলগুলি
ফুটেছিল আমার অন্তরে অন্তরে।

রাক্ষস খোক্ষস এবং ভোক্ষস

মুস্তফা কামাল জাবেদ

ছোটোবেলা থেকেই আমরা দৈত্য দানো আর রাক্ষস খোক্ষসের গল্প শুনে শুনে বড়ো হয়েছি। কখনো ঠাকুরমার ঝুঁলিতে কখনোবা অন্য কারো বুলিতে। রাক্ষসদের কাজই ছিল কচকচ করে কাউকে খেয়ে ফেলা; শাকচুন্নী আর পেত্নী যেন ছিল আরেক ধাপ ওপরে, মট করে ঘাড় মটকানোতেই বোধহয় তারা বেশি মজা পেত। যদিও বাংলা সিনেমার ভিলেনের মতো উনারা সবসময়ই হারতেন।

আজ আমরা সেরকমই কিছু মানুষের, থুক্কু, গাছের গল্প শুনবো। যাদের সুয্যিমামার আলো, বায়ুমণ্ডলের বায়ু আর ধরণীমাতার থেকে খাবার-দাবার নিয়েও ঠিকমতো ক্ষিধে মিটে না। পরিণত হতে হয় স্বৈরাচারী রাক্ষসে। যেমনটা আমরা দেখেছিলাম **'Journey to the center of the earth'** মুভিতে। যদিও ওইটা কেবল একটা মুভিই ছিল তবু রিয়েল লাইফেও উনারা কম যান না।

আজকের গল্পে একে একে পর্দার আড়াল থেকে বেড়িয়ে আসবেন সূর্যশিশির, কলসী উদ্ভিদ, ঝাঁঝিদাম এবং ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ।
সবাই স্বাগত জানান, মঞ্চে আসছেন সূর্যশিশির!

সূর্যশিশির (Sundew)

Drosera capensis

শিশির যে শুধু সাকিব ভাইয়ার হবে এমন না, শিশির সুয্যিমামারও হতে পারে। যাকে শীতের সকালে হলুদের ছোঁয়া লাগানো শূন্য মাঠের মধ্যে দেখা যায়। ২-৪ সেন্টিমিটারের লাল রঙের এই গোল গোল গাছগুলো অনেএএএক কিউট, মাংসাশী উদ্ভিদদের মধ্যে ইনিই বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর। সিমপ্লি বললে ভয়ংকর সুন্দর! আমাদের জন্য অবশ্য উনি খুব ভয়ের কিছু না কিন্তু পিচ্চি পিচ্চি পোকামাকড়কে পেলেই হাড় হাভাতের মতো গিলতে শুরু করেন। এই বদ সূর্যশিশির অনেক ধরনেরই হয়, আমরা মূলত খোশগল্প করব Spoon-leaved sundew নিয়ে। দেখতে একটুখানি চামচের মতো বলে সবার প্রিয় চুল বাঁকানো বিজ্ঞানীরা বেচারাকে এমন নাম গছিয়ে দিয়েছেন। তাতে অবশ্য খুব বেশি দুঃখ পেতে হবে না, ১৯৪টা মাংসাশী (পড়ুন রাক্ষসী) উদ্ভিদ নিয়ে হেঁটে বেড়ানো এই জেনেরার সবারই অনেক টেস্টি টেস্টি নাম আছে, এইটার বিষাদ ওইগুলো দিয়ে ভালোমতোই পুষিয়ে নেওয়া যাবে!

[*Drosera spatulata,* নাঈম ভাইয়ার তোলা]

সূর্যশিশিরের আনাগোনা সাধারণত পুরো বছরজুড়েই থাকে। কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে অবশ্য উনি প্রায়ই হারিয়ে যান। হার্বেশিয়াস (লতা জাতীয়) এ গাছ প্রজাতিভেদে ৩ মিটার পর্যন্তও স্টেম প্রডিউস করতে পারে। ৩ মিটার হলো গিয়ে ইয়া লম্বা, একেবারে ১০ ফুটের কাছাকাছি। রসুনের যেমন গোড়া বলা হয় একটা এদেরও তেমনি একটা **রোজেট** থেকে বাকি পাতাগুলো বের হয়। এই রোজেটা খালার সীমানা ১ থেকে ১০০ সেমিও হতে পারে। রোজেটা খালার বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে (পাতা) বলা হয় **ল্যামিনা**। এই ল্যামিনাতেই চলে সেই আদিকাল থেকে হয়ে আসা পোকামাকড়দের ধ্বংসযজ্ঞ। টিপিক্যাল যজ্ঞে যেমন নানান জোগাড়যন্ত্র

করতে হয় এইখানে সেরকম না লাগলেও দুটো জিনিস লাগবেই, সেগুলো হলো (১) **স্টকড গ্রন্থি** আর (২) **সিসিল গ্রন্থি**।

প্রথমটার কাজ হলো মিষ্টিইই **মিউসিলেজ** তৈরি করা। ওই যে সূর্যের সোনালি আলোয় ল্যামিনাতে চিকচিক করতে দেখা যায় ওগুলোই হলো এই মিউসিলেজ, এই চিকচিক করা দেখেই বোধহয় বোটানিক্যাল (*Drosera*), বাংলা, ইংরেজি সব জায়গাতেই এমন নাম সেঁটে দেওয়া হয়েছে। এই মিউসিলেজের লোভে পড়েই ওই পোকাদের বারোটা বাজে, ওই যে বলে না? "*লোভে পাপ পাপে মৃত্যু*" তারই প্র্যাক্টিকাল ভার্শন আরকি! এই গ্রন্থির আরেকটা বড়ো কাজ হলো এনজাইম দিয়ে ওই পুষ্টিকর পোকাগুলো ডিসলভ করে ফেলা। কী ভয়ংকর রে বাবা!
দ্বিতীয়টার কাজ মেয়েদের মনের মতো প্লেইন এন্ড সিম্পল! তোমার জন্য পুষ্টিকর স্যুপ তৈরি হয়েছে? ওকে ইট দেম।

খাবার কাজটা কিন্তু রেস্টুরেন্টে গেলাম আর খাবার অর্ডার দিলাম এমন না। কোনো একটা পোকা ল্যামিনার মিষ্টি মধু খেতে এসে টেন্টাকল ছুঁলে ওইটা কার্ল করতে শুরু করে, তারপর আস্তে আস্তে পুরো পোকাকেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে; এ যেন আজন্মের ভালোবাসা। একটু পরেই এই ভালোবাসার ম্যান্টিসরূপী উপাখ্যান দেখা যায়। শুরু হয় পোকা নামক খাবারের ভবলীলা সাঙ্গ হবার পালা।

গাছ হয়েও আরেকটা পোকা ভালোমতো মেরে হাত ধুতে উনার ১৫ মিনিটও লাগে না (খেতে সপ্তাহও লাগতে পারে) মনুষ্য জগতে এই প্রবণতা থাকলে বোধহয় বেচারাকে পাবনার হেমায়েতপুরের মানসিক হাসপাতালে স্থান পেতে হতো। ব্যাপারটা এমন, আমার বাড়িতে ভাত নেই, তো আমি হাতি ঘোড়া যা পাব সবই খেয়ে নেবো। ইয়াম্মি! (যেহেতু মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি না পেয়েই এদের এই পাগলামো)
রোজেট থেকে বের হওয়া লম্বা স্টেমে বছরে একগাদা ফুলের দেখা পাওয়া যায়। সেই রঙিন ফুল গোলাপি, লাল, হলুদ, বেগুনি কিংবা সাদাও হয়। ফুল থেকে অনেকগুলো ছোটো ছোটো কালো বীজ বের হয়, তা থেকে খুব সহজেই বংশের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে নতুন আরেক দল রাক্ষস জন্ম লাভ করে। *Drosera spatulata* এর ক্ষেত্রে জার্মিনেশনটা খুব ভালোরকমই হয় বলা যায়, আমি ছোটোবেলাতে যে জায়গাগুলোতে এই গাছ দেখতাম এখনও সেখানে এদের দেখতে পাই, কালের গহ্বরে এজন্যই বোধহয় হারিয়ে যায়নি।
এসিডিক মাটির এই প্ল্যান্ট কসমোপলিটান এর মতো এশিয়া থেকে ইউরোপ, ইউরোপ থেকে অস্ট্রেলিয়া সব জায়গাতেই থাকে। আমাদের দেশে সেরকম সংরক্ষণের উদ্যোগ না থাকলেও ইউরোপের কিছু দেশ যেমন, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, চেক রিপাবলিক, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি, ফ্রান্স এবং বুলগেরিয়াতে একে রীতিমতো আইন করে সংরক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে! অন্য জিনিসে ব্যবহারের জন্য সূর্যশিশিরের ফেভিকলের মতো আঠালো মিউসিলিজ নিয়ে গবেষণাও চলছে অনেক তোরজোর করে।

উল্লেখ্য বাংলাদেশের সিলেটে সূর্যশিশির পাওয়া যায় অনেক, এছাড়াও হাসান ইমাম ভাইয়ার কাছে এদেশের সবচেয়ে বড়ো সংগ্রহশালা আছে।

কলসি উদ্ভিদ (Pitcher Plant)

কলসি উদ্ভিদের নাম শুনে গাঁয়ের বধূর কলসী টাইপ সাদাসিধে কোনো কিছু ভাবলে ভুল হবে। এ ব্যাটা বাইরে দেখতে যতই সাদাসিধে হোক, ভেতরে ভেতরে এর বিরাট শয়তানি। ফ্যামিলিতে যেমন সবগুলো ছেলে মেয়ে ভালো হওয়ার মাঝে কোনো একটা বদ হয়ে যায়, এই

গাছেরও ভালো ভালো পাতার মাঝে কোনোটা রূপান্তর হয়ে যায় পাজি কলসিতে। সেখানে থাকে ফ্রুটিকার মতো জুসি বাট পিওর জিনিস, নেক্টার। এই নেক্টারের লোভেই সবাই মরণফাঁদে যায়।

Nepenthaceae

যে পাতাটা কলসি হয় তাকে বলে **পিটফল ট্র্যাপ**। অনেক পরিবারের সদস্যকেই কলসি উদ্ভিদ বলা হয়, তার মধ্যে Nepenthaceae আর Sarraceniaceae ফ্যামিলির টাকা-পয়সা বেশি থাকায় এরাই বেশি পরিচিত।

টাকা-পয়সাওয়ালা গোষ্ঠীকে মোটাদাগে দুই টাইপে ফেলা হয়। *Nepenthaceae* কে বলা হয় ওল্ড ওয়ার্ল্ড পিচার প্ল্যান্ট।

Sarraceniaceae

আর Sarraceniaceae কে বলা হয় নিউ ওয়ার্ল্ড পিচার প্ল্যান্ট। এই নামকরণের হেতু দেখা যাক, নেপেন্থেসি এর ক্ষেত্রে তাদের পাতার একটা অংশ কলসিতে রূপান্তরিত হয়, অন্যদিকে Sarraceniaceae এর পুরো পাতাটিই কলসি হয়ে যায়। একজন মডার্ন আর আরেকজন ওল্ড ফ্যাশনেড বলা যায়!

লিক্যুইড পূর্ণ জায়গাকে সবাই কেতাবি ভাষায় বলে **ফাইটোটেল্যালমাটা**। এই মধুর মতো জিনিস খেতে গিয়ে পোকা, ব্যাং এমনকি পাখিও ফাঁদে পড়ে যায়, তারপর বন্ধ হয়ে যায় ঢাকনা। একবার ভেতরে পৌঁছালেই আপনি শেষ, না পারবেন ওপরে ওঠতে, না পারবেন ওইখানে টিকে থাকতে। তাও যদি আপনি *মুখে হাসি বুকে বল* নিয়ে ওঠতে শুরু করেন তাহলে প্রথমেই নিচের দিকে মুখ করা কাঁটার খোঁচা খেতে হবে। খোঁচা নিয়েও যদি একটুখানি ওঠেও যান তবে এরপরই

আপনার জন্য অপেক্ষা করছে পা পিছলে হুস করে পড়ার অনুভূতি। সব শেষে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে প্রাণ হাজমোলা! আই মিন এইবার পালা হজম করার। এইটা দুইভাবে হতে পারে, কিছু উদ্ভিদ এইটা করে বৃষ্টিপাতের থেকে আসা কিলবিল করা ব্যাকটেরিয়া দিয়ে, কেউবা আবার অন্যের জিনিস ধার না নিয়ে নিজেই এনজাইম সিক্রেশন শুরু করে। খাওয়া যেমনই হোক, দিনশেষে সবার পরিণতি হয় নাইট্রোজেন আর সাথে অন্য কিছু উপাদানে, কারণ কলসির চাই পুষ্টি, পুষ্টি আর পুষ্টি।

সব সাইকো মাংসাশী উদ্ভিদের মতো এরাও পুষ্টিহীন মাটিতে জন্ম নেয় আর বেড়ে ওঠে।

Darlingtonia californica, জোস নামের এই গাছকে জনগণ কোবরা প্ল্যান্ট নামেও চিনে। নামের সাথে মিল আছে কি না জানি না তবে এর পিটফল ট্র্যাপে কেউ একবার পড়লে খুব সহজে ওঠবে বলে মনে হয় না, ভেতরে ঢুকার পর বের হওয়ার জন্য কানাগলির মতো আরো ফাঁদ দেখা যায়। শখ করে ঢুকতে গেলেই একেবারে যে চিপকে আটকে যাবেন না তা নিশ্চয়তা দিতে পারি না।

ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ (Venus Fly Trap)

রাক্ষুসে উদ্ভিদদের মাঝে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী হলো এই ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ। দেখতেও কিন্তু সুন্দর খুব, একেবারে বিউটি এন্ড দ্য বিস্ট আর বিউটি উইথ ব্রেইনের সংকর। ঝিনুকের যেমন খাপের ভেতর মুক্তো থাকে তেমনি এর খাপের ভেতর থাকে নেক্টার, মোটাসোটা পোকা খাপের ভেতর আটকে রেখে হজম করাই এর জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

খাপের ভেতরে ছোটো ছোটো কয়েকটা ট্রিগার হেয়ার থাকে, আর কোনো কিছু ট্রিগার মানেই উটকো ঝামেলা তৈরি হয় এ তো সবারই জানা। **ছুঁয়ে দিলে মন** মুভির মতো কেউ যদি একটুখানি ছুঁয়ে দেয় এগুলোকে তাহলেই কেল্লা ফতে। তাও আপনাকে একটা সুযোগ দেওয়া হলো, আপনি ভালো মানুষ? ওকে, দ্রুত দৌড় দিন। টাইম বোমার টিক টিক শুরু হয়ে গেছে! টিক টক টিক টক! ফাস্ট! [ওই টিক টক না কিন্তু :")] বোমাটোমা ভয় না পেয়ে আর পড়ে পাওয়া সেই সুযোগ কাজে না লাগিয়ে লোভীর মতো আরো মধুর সন্ধান করলে কি আর শেষ রক্ষা হবে? উহু। দ্বিতীয়বার যখনই আপনি একখানা চুল ছুঁইবেন আপনার জীবন নদী জোয়ার ভাটার তখনই ইতি। ১ সেকেন্ডের ১০ ভাগের এক ভাগ সময়েই ট্র্যাপ ক্লোজ হয়ে যাবে। বন বয়াজ!

প্রথমবার ছোঁয়ার পর ২০ সেকেন্ডের জন্য একটা টাইমার চালু হয়, এর ভেতর দ্বিতীয়বার লোভী হাত না বাড়ালেই তো চলতো, হাজার হোক মেমোরি প্ল্যান্ট বলে কথা!

ছোটো পোকাদের জন্য আবার ভেনাসের বিশেষ ডিসকাউন্ট আছে। আর দেবে নাইবা কেন! ছোটো পোকা খেয়ে যে নিউট্রিশন পাওয়া যাবে তার থেকে বেশি এনার্জি বরং এর মেকানিজমেই খরচ হয়ে যাবে।

এজন্য ছোটো পোকারা সহজেই কাঁটার ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবার রাস্তা পায়, এর ১২ ঘণ্টা পর খাপ আপনাতেই আবার খুলে যায়। আর দুর্বল পোকা কিংবা ধুলাবালি, বৃষ্টির ফোঁটার মিথ্যা প্রলোভন এড়াতে ওই টাইমার সিস্টেম ভীষণ কাজে আসে।

আপনি যদি একটা পোকা হতেন তবে ওইখানে আটকে যাবার পর কী করতেন? বের হয়ে আসার জন্য ছটফট করতেন নিশ্চয়ই? উফ্! এতে হলো কী, আরো কয়েকটা চুল (রোম) ছোঁয়া হয়ে গেল। যদি ওই সংখ্যাটা ৫ এর ঘরে চলে যায় তাহলেই শুরু হবে রান্নাবান্না aka ডাইজেশন প্রসেস। ডিনার শেষ হতে প্রায় ১০ দিন লেগে যায়, ১০ দিন শেষেই ভেনাস আবার তার আগের রূপে Back to the pavilion!

যদিও ভেনাস মানে রোমান ভালোবাসার দেবী আর বোটানিক্যাল নাম (*Dionaea muscipula*, muscipula মানে হলো ফ্ল্যাই ট্র্যাপ) থেকে আসা Dionaea হলো (Dione এর কন্যা) গ্রিক প্রেম আর সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতি কিন্তু এই বেচারির মাঝে সৌন্দর্য কিংবা প্রেম ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না। তবে একটা কথা, ৬ ইঞ্চির ফুল ফোটানোর সময় ওরা ভালোই আচরণ করে। তখন যে পোকামাকড় পরাগায়নের জন্য দরকার! ঘাট পার হয়ে গেলেই উনি আবার পুরোনো ধান্দায় ফিরে আসেন। কী সেলফিশ রে বাবা!

সূর্যশিশিরের মতো মতো তার চাচাতো ভাইয়েও কিন্তু রোজেট আছে, রোজেটা খালা ইজ এভরিহোয়্যার! একটা রোজেট থেকে অনেকগুলো পাতা বের হয়, কিছু থাকে নরমাল কিছু আবার সাইকো। পুষ্টিহীন মাটিতে জন্ম নেওয়া এই সাইকো গাছের বীজ ভালোরকম জার্মিনেশনের জন্য আবার প্রাকৃতিক আগুনেরও দরকার পড়ে! ৩-৫ বছরে একবার হওয়াই লাগবে, এমন আবদার।

যদিও ৪-৫ বছরে একদম বড়ো হয়ে যাওয়া এই গাছের বাণিজ্যিকভাবে এখন বিপুল পরিমাণে চাষ হচ্ছে তবুও ১৯৭৯ এর পর থেকে নিজের দেশের বাড়ি ক্যারোলিনাতেই এর সংখ্যা কমেছে ৯৩%। এসবের ফলে এই সুন্দর উদ্ভিদটি এখন বিপন্ন এর তালিকায়।

ঝাঁঝিদাম (Bladderworts)

ব্লাডারওয়ার্ট, যার বাংলা করলে দাঁড়ায় ঝাঁঝিদাম, এই গাছ ভাইটি ব্লাডারের মতো থলের সাহায্যে তার শিকার ধরে খায়। লম্বা ডাটায় চিকনকাঁটা সরু লম্বা পাতা। মাঝে মাঝে ওই পাতার বদলে থাকে ছোটো ছোটো থলে, দেখতে শুনতে ভালোই। কিন্তু ওগুলো যে ফাঁদ সে তো আর সবার মাথায় থাকে না, তাই ঢুকতে গিয়েই ঘটে মহা বিপত্তি। স্থল, জল এই দুই ধরনের পরিবেশেই বেঁচে থাকা এই উদ্ভিদ অ্যান্টার্কটিকা বাদে পৃথিবীর সব জায়গাতেই বাস করে। যদিও এদের ৮০% ই স্থলজ তবু জলজগুলোই যেন বেশি আদুরে।

পিটার টেইলর, ফ্রান্সিস আর্নেস্ট লয়েডের মতো গুণীজনদের মত অনুযায়ী ব্লাডারওয়ার্টের ট্র্যাপ হলো উদ্ভিদ জগতের সবচেয়ে জটিল স্ট্রাকচারগুলোর একটি। উনাদের মুখের কথা আপনি কেন বিশ্বাস

করবেন? প্রমাণ তো দিতে হবে, তাই না? আসুন, দেখা যাক তবে।

ব্লাডারওয়ার্টের বাইরের স্তরে আছে মিউসিলেজ, আমাদের সেই চিরচেনা মিউসিলেজ যার লোভে প্রাণ দিয়েছে হাজারো যোদ্ধা। এইটা দেখেই হোক আর বাসা বানানো কিংবা এমনিই ঘোরাঘুরি করার শখে হোক একবার আপনি ওইদিকে গেলেই হয়েছে। গেছেন তো গেছেন, রোমশ জিনিসগুলোতে টাচ করার কী দরকার? নানান লেয়ারের সিকিউরিটিতে ভরপুর হাজারটা মেকানিজম এইবার একটিভ হয়ে যাবে। ছুট করে বাইরের দরজাটা বন্ধ হয়েই সবকিছু কীরকম যেন ভেতরে যেতে শুরু করবে, ঠিক যেন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। স্বচ্ছ দেয়ালের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার একইসাথে কার্ভও করতে শুরু করে। তারপর আপনাকে চিরেচ্যাপ্টা করে আর পানি বের করে দিয়ে তবেই বেচারার শান্তি, যদিও কয়েকঘণ্টার ডাইজেশন শেষ না হলে পুরোপুরি সুশীল শান্তি বলা যায় না। এই ভেতরে টেনে নেওয়ার প্রসেসটা ঘটতে চোখের পলক ফেলার মতো সময়ও লাগে না।

০.২ মিমি থেকে ১.২ সেমি সাইজের এই ট্র্যাপগুলো নিয়ে ঝাঁঝি মশার লার্ভা, ড্যাফনিয়া এমনকি ব্যাঙাচিও দিব্যি খেয়ে নিতে পারে। খাওয়ার পর নেক্সট লাঞ্চের জন্য রেডি হতে উনার ১৫-৩০ মিনিটও সময় লাগে না। চরিত্রের এই কলঙ্ক উন্মোচন হওয়ার আগে যদিও উনাকে সাধারণ এক ভাসন্ত উদ্ভিদই মনে হতো কিন্তু তিনি এখন সব মাংসাশী উদ্ভিদের গ্যাংস্টার হয়ে বসে আছেন। গুন্ডারূপী এই গাছের কিউট কিউট ফুলও হয়, যেগুলো আবার ওপরে মাথা দোলায়।

ব্লাডারওয়ার্ট নিয়ে আর কিছু বলব না, চুপটি করে নাঈম ভাইয়ার সায়েন্সভেঞ্চারের দিকে খানিকক্ষণ তাকাই,

"মিজের করাতগুলো থেকে বাঁচতে দিক বেদিক হারিয়ে কোথায় ছুট লাগিয়েছিলে খেয়াল নেই। এ জায়গাটা ঘন জঙ্গল টাইপ। একটা গাছে বিশ পঁচিশ ফুট চওড়া বেলুনের মতো কী জানি ঝুলছে। আধা স্বচ্ছ ভেতরটা। সামনে রোমের মতো কিছু ঝুলে আছে।

তোমার কৌতুহল জাগল। সাহস করে হাত দিলে।

রোম সরে যাবে। বেলুনের মুখ খুলবে। তুমি প্রচণ্ড একটা ত্বরণ অনুভব করবে। ৬০০ জি। আট জি ত্বরণ মানুষকে অজ্ঞান করতে ব্যস্ত। ৬০০ জি ত্বরণ তুমি সহ্য করতে পারার কথা না। তুমি জ্ঞান হারাবে।

এক সেকেন্ডের মাত্র একশ ভাগের এক ভাগ সময়ের ভেতর তুমি পাচার হয়েছো বেলুনের ভেতর। পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী শিকারি গাছ ব্ল্যাডারওয়ার্ট একফোঁটাও সময় নষ্ট না করে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে তার উদরে।

ওই দেখো, চারপাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় আঠালো রস পড়ছে, ড্রিপ ড্রিপ করে শব্দ হচ্ছে চারপাশে। তোমার হজম হতে আর বেশিক্ষণ লাগবে না।"

ব্যাঙটি Greater balloon frog (Uperodon globulosum), Microhylidae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

মোটেই বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি নয়। বেশিরভাগ সময় মাটির নিচে কাটায় বলে চোখে পড়ে না। বর্ষার সময় সাধারণত চোখে পড়ে। তবে অনেক সময় মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করার ফলেও বেরিয়ে আসতে পারে।

কার্টেসীঃ শাশ্বত রায়
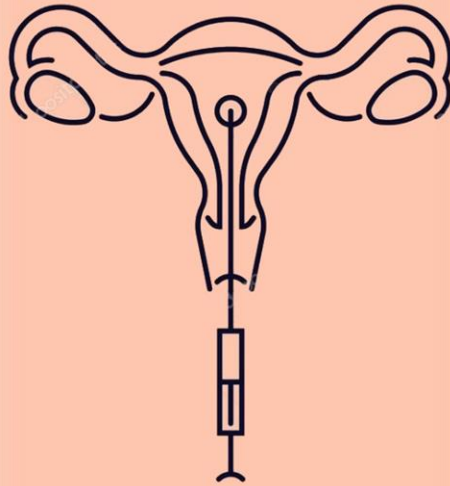
A.I ল্যাব

নাঈম হোসেন ফারুকী

১।

আজকের গল্প রিলেটিভিটি, কোয়ান্টাম বা কোন ফাটাফাটি সায়েন্টিফিক কনসেপ্টের গল্প নয়। আজকের গল্প দরিদ্র এক দেশের ছোটো এক সরকারি বিজ্ঞানাগারের। A.I ল্যাব মানে এখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ল্যাব নয়, সাভারের অদূরে জাহাঙ্গীরনগর গেটের আর্টিফিশিয়াল ইন্সেমিনেশন ল্যাব। আমার খুব সৌভাগ্য, কিছুদিন আগে অফিসের কাজের সূত্রে ওই ল্যাবের ভেতরটা দেখা হয়েছিলো।

A.I ল্যাবের কাজ গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন। এদের কিছু উন্নত জাতের ষাঁড় আছে, এরা তাদের সিমেন কালেক্ট করে, হিমায়িত করে সারা দেশে পৌঁছে দেয়। এদের সম্পর্কে মোটামুটি এইটুকুই ছিল আমার ধারণা। এদের অফিসে যেয়েও যে এদের সম্পর্কে খুব একটা হাই ইম্প্রেশন হলো বলা যায় না। মাসিক রিপোর্ট লেখার জন্য এরা এখনো রেজিস্টার খাতা মেইন্টেইন করে, ডেটাবেজ তো দূরের কথা সামান্য এক্সেল শিটও এখনো ব্যবহার করা শিখেনি। বেশিরভাগ সরকারি অফিসের এই অবস্থা, এদের দোষ দিয়ে লাভ কী!

কাজ শেষে ল্যাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত সায়েন্টিস্ট শান ভাই ল্যাবটা ঘুরে দেখার অফার করলেন। এই সুযোগ হাতছাড়া করার কোন মানে হয় না, রাজি হয়ে গেলাম।

শান ভাই পুরো প্রক্রিয়াটার একটা প্রেজেন্টেশন রেডি করে রেখেছেন, সেটা চালু করলেন।

আর আমরা বাস্তবের দুনিয়া থেকে পা রাখলাম স্বপ্নের জগতে।

২।

A.I ল্যাবে বেশ কিছু উন্নত জাতের ষাঁড় আছে। ষাঁড়গুলো ওয়েল ট্রেইন্ড, সামনে পাত্র ধরলে এরা সিমেন দেয়। সেই সিমেন ল্যাবে নিয়ে এসে কাসা নামের একটা যন্ত্রে ধরা হয়। মেশিন কয়েক সেকেন্ডে বলে দেয়, সিমেন ভালো কি মন্দ।

শান ভাই যন্ত্রটা দেখালেন। একটা কম্পিউটার, তার পাশে একটা মাইক্রোস্কোপ। একটু স্যাম্পল নিয়ে মাইক্রোস্কোপে রাখলেন। পর্দায় ভেসে উঠল আন্ড্রুস্পারম নামের একটা সফটওয়ারের স্ক্রিন। এই সফটওয়্যার মানুষের হেড ট্যাগ করার মতো একটা একটা করে শুক্রাণুর মাথায় ট্যাগ করছে। আমাদের চোখের সামনে স্পার্মগুলো নড়ছে সাঁতার কাটছে। আন্ড্রুস্পার্ম প্রতিটা স্পার্মের ৩০ টা করে প্রপার্টি লাইভ দেখাচ্ছে। কার মাথা কত মোটা, লেজ কী হারে নড়ছে, মাইটোকন্ড্রিয়ার অবস্থা কীরকম সব। অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া ঘেটে সে বলে দিচ্ছে কোন স্যাম্পল আসলেই ভালো, কোনটা খারাপ। শান ভাই সফটয়ারটাকে ট্রেইন করাচ্ছেন, দিনে দিনে সে শিখছে, কীভাবে আরও ভালো, আরও নিখুঁত ক্লাসিফাই করা যায়।

ক্লাসিফাই শেষ হলে প্রিজারভ করার পালা। লিকুইড নাইট্রোজেনে -196 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সিমেন প্রিজারভ করতে হয়। -196 ডিগ্রি খুবই লো টেম্পেরাচার, প্রায় সব জীবদেহ ওই তাপমাত্রায় মারা যাবে। তাই কী কেমিক্যাল দিয়ে প্রিজারভ করলে স্পার্ম মরবে না, আইস ক্রিস্ট্যাল ফর্ম করবে না তাই নিয়ে হয়েছে বিস্তর গবেষণা।

একটা ষাঁড় একবারে প্রায় ৬২ বিলিওন স্পার্ম দেয়। এত স্পার্ম একটা গাভীর লাগে না। অনেক গবেষণা করে দেখা গেছে ২৫ মিলিওন স্পার্মই যথেষ্ট। কাসা মেশিন হ্যাঁ বললে তাই স্পার্মগুলোকে অনেকগুলো ছোটো শিশিতে ভাগ করা হয়। আগে একটা গরু একবারে একটা গাভীকে প্রেগন্যান্ট করতে পারত, এখন ৫০০টা গাভীকে পারে।

ভাগ করা শেষ, প্রিজারভেটিভ অ্যাড করা শেষ, এবার ফ্রিজিং এর পালা। -196 এ একবারে নামালে হবে না। কত সেকেন্ডে, কীভাবে নামাতে হবে সব ঠিক করা আছে, একটু ভুল হলে স্পার্ম মারা যাবে। ফ্রিজিং মেশিনটাও তাই প্রোগ্রামেবল। সব ঠিক ঠাক মতো ইনপুট দেওয়ার পর সে ৬০ মিনিটের মধ্যে তাপমাত্রা -১৯৬ এ নামিয়ে আনে।

তারপর এদেরকে ভরা হয় নাইট্রোজেন ফ্লাস্কে। প্রায় ৩ ফুট লম্বা একটা ফ্লাস্ক, এদের দেওয়াল ৬ ইঞ্চি পুরু। এই সিলিন্ডারগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোন পাওয়ার লাগবে না। একবার ঢুকিয়ে দিলে ৬০০ বছর পর্যন্ত স্পার্মগুলোকে -১৯৬ এ ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারবে।

এবার বিতরণের পালা। একই গরুর সিমেন এক জায়গায় বারবার বিতরণ করা যাবে না, যদি মা ও মেয়েকে একই ষাঁড় দিয়ে প্রেগন্যান্ট করি জেনেটিক ডিজিজ হবে। শান ভাইয়ের ৪ টেরাবাইটের SSD তে সেভ করা আছে ঠিক কোন ষাঁড়ের কোন সিমেনের বোতল কোন এলাকায় কবে গিয়েছিল।

এরপর ফিডব্যাকের পালা। কতগুলো গাভী প্রেগন্যান্ট হচ্ছে, তাদের বাচ্চারা কীরকম দুধ দিচ্ছে, মাংস দিচ্ছে সব রেকর্ড হচ্ছে। শান ভাই বললেন, আমেরিকায় ৯০ টা ক্রাইটেরিয়া রেকর্ড করা হয়, আমাদের ৩, ৪টা রেকর্ড করতেই খবর হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ এই তথ্যগুলোর মূল্য বুঝে না, প্রায়ই ভুল ভাল বানানো ইনফরমেশন আসে।

সবশেষে একটা যন্ত্র দেখালেন, এখনো কেনা হয়নি, সামনে আসতে পারে। X ক্রোমোজোম আর Y ক্রোমোজোমের ওজনে সামান্য পার্থক্য আছে, এই যন্ত্র সেই পার্থক্য দেখে মোটামুটি ৭০-৮০ % নিখুঁতভাবে স্পার্মগুলোকে আলাদা করতে পারে। আপনি দুধের খামার দিয়েছেন? আপনার তো ষাঁড় খুব বেশি দরকার নেই, X ক্রোমোজোমওয়ালা সিমেন নিয়ে গেলেই চলে!

৩।

বাইরে খটখট খটখট করে লাল লাল রেজিস্টার বইয়ে চলছে রিপোর্ট লেখার কাজ। ভেতরে শান ভাইরা বিলিওন বিলিওন ডেটা আনালাইজ করে নিখুঁত গবেষণা করে চলেছেন। বাইরে ৫ লাখ টাকা নষ্ট করে ফটোকপি আর ফ্যাক্স মেশিন কেনার মিথ্যা হিসাব দেখানো হচ্ছে। ভেতরে শান ভাইরা বার বার বলেও বুঝাতে পারছেন না কেন তার আম্ব্রুস্পার্ম সফটওয়্যারটির ২টা নতুন ফিচার কেনা লাগবে।

কিন্তু নিশ্চয়ই সরকারের কোনো এক পর্যায়ে ২, ৪ জন শান ভাই এখনও আছেন, না থাকলে তো ওই কাটিং এজ টেকনোলোজির A.I ল্যাবের জন্মই হতো না। যতদিন এই শান ভাইরা থাকবেন, এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।
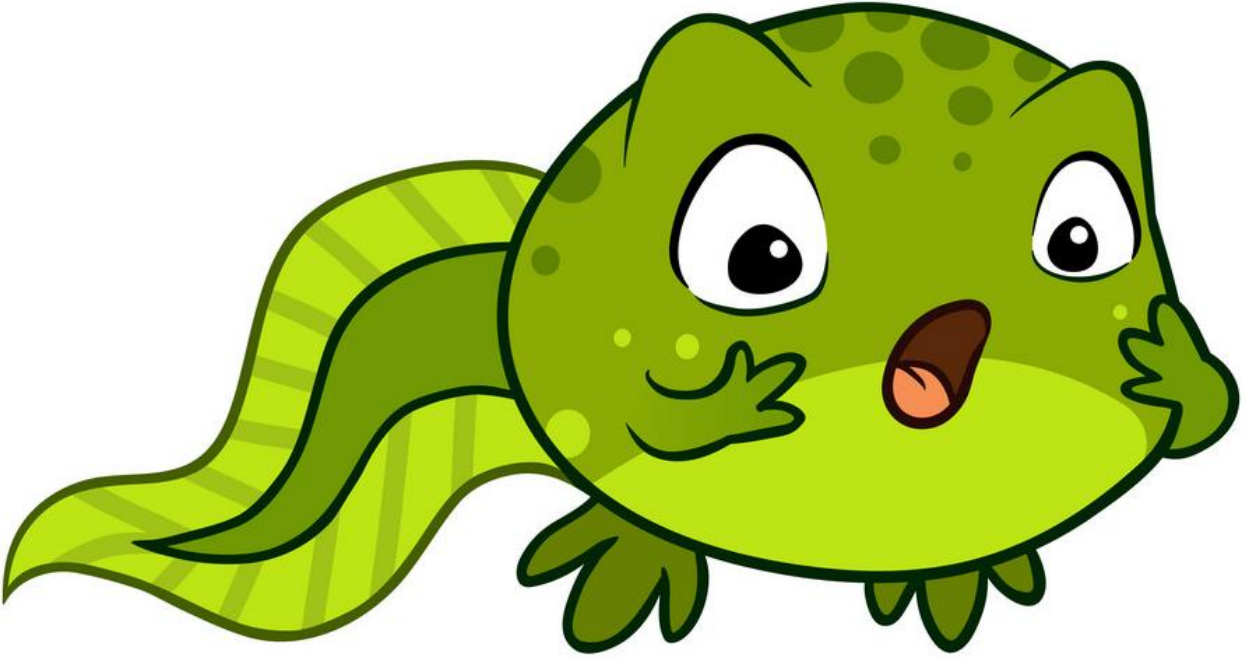
ব্যাঙ বললেন ব্যাঙাচ্চি
দাঁড়া তোদের ঠ্যাঙাচ্ছি।
তা শুনে কয় ব্যাঙাচ্চি,
আমরা কি স্যার, ভ্যাঙাচ্ছি?

-অন্নদাশঙ্কর রায়

১.

'ব্যাঙাচি ফ্লিপ' অ্যাপটা প্লে স্টোরে দেওয়া যাবে কি? তাহলে সবার জন্য ওটা সহজ হতো। অ্যাপটা এক কথায় দারুণ। আমার খুবই ভালো লেগেছে। কোনো অ্যাপের মধ্যে পৃষ্ঠা উল্টায়ে পড়তে যে কী মজা! আহ্! Thanks a lot, TaRaRa ভাই, অ্যাপটা ডেভেলপ করার জন্য।

With love
–সীমান্ত সিনহা

ব্যাঙাচি:

ধন্যবাদ সীমান্ত সিনহা। অবশ্যই যাবে, কেন যাবে না? তবে কী বলো তো, অ্যাপটি অনেকটা পরীক্ষামূলক অ্যাপ। খুবই স্বল্প সময় নিয়ে করা হয়েছিল। **ব্যাঙাচি ফ্লিপ** অ্যাপে যে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে পড়া যায় এটা পাঠকদের কাছে কেমন

লাগবে সেটা জানার জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম। এখন তুমি বলে দিলে, আমরা চেষ্টা করবো অ্যাপটি উন্নত করার। আর হ্যাঁ, তানভীরই অ্যাপটা বানিয়েছিল, কিন্তু কী বলো তো, ও এত অলস যে ওকে দিয়ে কিছু করানো যায় না। বিরক্তিকর, তাই না? তো 'ব্যাঙাচি ফ্লিপ' অ্যাপটা প্লে স্টোরে প্রকাশ করা হবে, কবে নাগাদ হবে সেটা সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে শীঘ্রই, ব্যাঙাচি ফ্লিপ তখন আরো উন্নত হয়ে আসবে নতুন কিছু ফিচার নিয়ে।

২.

প্রিয় ব্যাঙাচি,

আমি জানি না, তুমি দেখতে কেমন। কিন্তু তোমার ম্যাগাজিনগুলো পড়ে খুব ভালো লাগে। কখনো ভূত নিয়ে বোঝাও, কখনো প্রাচীন পৃথিবী নিয়ে, কখনো কল্পবিজ্ঞান, আবার কখনো অ্যাস্ট্রোনমি।

তোমার লেখা আমার খুব ভালো লাগে। আমার ইচ্ছা করে মাঝে মাঝে তোমার সাথে দেখা করতে। হয়তো তুমি মানুষ না, কিন্তু তোমার মধ্যে আমি মনুষ্যত্ব খুঁজে পাই। এত ছেলেমেয়েদের লেখাকে একসাথে করে তাদের লেখার যে মূল্য দাও, সেটি অনেক বড়ো ব্যাপার। তোমাকে আমি আরও চাই। তোমার এমন ভালো কাজের পাশে আজীবন থাকতে চাই।

ইতি

তোমার ভালোবাসার, প্রিয় বালক।

–আবদুল্লাহ আল নাদরুন

ব্যাঙাচি:

ধন্যবাদ নাদরুন। এই দেখো, তোমাদের আনন্দ দিতে পারার মাঝেই তো আমার সার্থকতা। আমাকে নিয়মিত পড়া মানেই তো আমার সাথে দেখা করা। আমার পাতায় লেখাগুলো পড়ে যদি তোমরা কিছু শিখতে পারো তাহলেই তো আমি সার্থক। আমি চেষ্টা করবো আরো বড়ো হতে। কিন্তু কী বলো তো তারজন্য তো বেশি বেশি লেখা লাগবে। তোমরা লিখতে থাকো আর আমি তো আছিই তোমাদের লেখা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

৩.

হ্যালো, সুইট লিটল ব্যাঙাচি,

বলো, কখন তুমি ব্যাং হবা? ব্যাং হতে আর কত দেরি, ব্যাঙাচি?

–তাজউদ্দিন আহমদ

ব্যাঙাচি:
হ্যালো তাজউদ্দিন আহমেদ। আমি ব্যাঙাচি হিসেবেই সুন্দর আছি না, বলো? ব্যাঙ হয়ে গেলে কি আমাকে ভালো লাগবে?

৪.
অ্যাস্ট্রোবায়োলজি নিয়ে কোনো সংখ্যা প্রকাশ করা যায় না?
–মোহাম্মদ তন্ময়

ব্যাঙাচি:
হ্যালো তন্ময়। হ্যাঁ, যায় তো। কেন যাবে না? কিন্তু পর্যাপ্ত লেখা না পেলে একটা আস্ত ব্যাঙাচি কীভাবে হবে বলো তো? তুমি বরং আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারো। চটপট অ্যাস্ট্রোবায়োলজি নিয়ে কিছু একটা লিখে ফেলো তো। আর বন্ধুদেরও উৎসাহিত করো লিখতে। কে বলতে পারে দেখা গেল কিছুদিন পরই তোমার কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা পেয়ে গেলে। আর হ্যাঁ, আমার রিভিও দিয়ো কিন্তু। তোমরা যদি আমার ভুলত্রুটি না ধরিয়ে দাও, কীভাবে আদর্শ ব্যাং হবো বলো তো?

৫.
একটি ব্যাঙাচি।
একটা সময় ব্যাঙাচি বলতে ব্যাঙের ছানা বুঝতাম। ব্যাঙেরা ওই ছোট্ট দশায় পানিতে থাকে। আমাদের প্রিয় ম্যাগাজিন ব্যাঙাচিও আছে এখন অনলাইনে, অনেকটা পানিতে।

যেদিন ছোট্ট ব্যাঙাচি বড়ো হয়ে মাটিতেও বসবাসের উপযুক্ত হয়, সেদিন কিন্তু সে পানিতে বেশি থাকে না।

আমাদের প্রিয় এই ব্যাঙাচি কবে হার্ডকপির আসনে বসবে জানা নেই।

হার্ডকপির এই এক অসুবিধা, সাপ্লাই করা সমস্যা। পরিশ্রম আগে থেকে দ্বিগুণ বেড়ে যেতে পারে। আমাদের সবার প্রিয়, ব্যাঙাচির প্রকাশক, নাঈম ভাইয়ার এখনও মুড নেই হার্ড কপি বের করার।
তবে আমরা চাই হার্ড কপি।
চাই, চাই, চাই।

পুনশ্চ: ব্যাঙাচি ডিসেম্বর সংখ্যা এত পরে কেন বের হলো?
–আশরাফুল ইসলাম মাহি

ব্যাঙাচি:
ঠিক বলেছ মাহি, আমি এখন ইন্টারনেটের পানিতে তোমাদের জন্য বিনামূল্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অপেক্ষায় আছি কে কখন আমাকে ডাউনলোড করে পড়বে। ছোটো ব্যাঙাচি ছোটো কিউট থাকলেই হয় না বলো? বড়ো হলে তো মজাটাই মাটি হয়ে যাবে। দেখো-না, সবাই কেমন তার শৈশবে ফিরে যেতে চায়। আমিও ছোট্ট ব্যাঙাচি থাকতে চাই। তা নাহলে তো আমি উন্মুক্ত হয়ে সবার জন্য ঘুরতে পারবো না। বড়ো হলে কত ঝামেলা। তখন আমাকে কত পথ পাড়ি দিতে হবে তোমাদের কাছে পৌঁছাতে। আর ছাপাখানার মধ্যকার যে গরম! কীভাবে টিকে থাকবো আমি? তার চেয়ে ইন্টারনেটের পানিতে স্বাচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানো ভালো নয় কি বলো? যখন তখন যে কেউ আমাকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে পড়তে পারে। তবে তুমি যেহেতু অনেক কঠোর দাবি করছ, আর আমি তো তোমার কথা ফেলতে পারি না। তাই আশা দিয়ে রাখছি, হার্ডকপি তুমি একদিন তোমার হাতে পাবে ভবিষ্যতে। কিন্তু সেই অপেক্ষায় থেকে কিন্তু আমাকে পড়া বন্ধ করে দিয়ো না আবার। তাহলে কষ্ট পাব।

আর ডিসেম্বর সংখ্যা প্রকাশিত হতে সময় লাগার পেছনে কারণ হলো আমাকে দেখভাল করার লোকদের অনুপ্রেরণা নেই। কারণ তোমরা তো আমাকে পড়ে রিভিও দাও না। তাহলে আমি আরো উন্নত আর সময়নিষ্ঠ হবো কী করে?

৬.
ছোট্ট ব্যাঙাচি,
না, তুমি তো এখন ছোট নেই। এই তো ২০২০ সালের মে মাসেই তোমার জন্ম হলো আর সামনের মাসেই তোমার জন্মদিন। যদিও তোমার ক্যালেন্ডারে তুমি জানুয়ারিতেই আছো। কিন্তু তাতে কী? আর শোনো, তোমাকে ফোনের স্ক্রিনে দেখতেও খুব ভালো লাগে। কিন্তু আশা করি, একদিন তোমায় হাতে নেয়ার সুযোগ পাবো।

অগ্রীম শুভ জন্মদিন!

– নুপুর দেব

ব্যাঙাচি:
অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, নুপুর দেব। আমিও তো চাই তোমাদেরকে আনন্দ দিতে। কেন নয়? অবশ্যই সুযোগ পাবে। কিন্তু কবে নাগাদ পাবে সেটা ঠিক করে বলতে পারছি না এখন। আমাদের ম্যাগাজিনটি কিন্তু কপিরাইট এর আওতাধীন। তবে তুমি চাইলে অবাণিজ্যিকভাবে নিজের জন্য এককপি ছাপিয়ে নিতে পারো। তাহলেই হাতে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য আবারও ধন্যবাদ তোমাকে।

ব্যাঙাচিকে চিঠি লিখুন

ফেইসবুক: https://www.facebook.com/bcb.bangachi/

ই-মেইল: feedback@bangachi.com

ডাকবাক্স:
টিম ব্যাঙাচি, এমিকন ইলেকট্রনিক্স, ৮ম তলা, বিসিক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, ৯/৯ রোড-০৩, এভিনিউ-০৫, সেকশন-০৭, মিরপুর, ঢাকা-৯২৯৬

অতিপ্রাকৃত ভৌতিক অস্তিত্ব আর অপূর্ব প্রকৃতির সন্ধানে টিম বিসিবির সিলেট সফর

এ আর মুবিন

ইদের দিন দুপুরবেলা যখন বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাবার কথা ভাবছিলাম, ঠিক সেই সময় **নাঈম হোসেন ফারুকী** ভাইয়ের ফোন এলো। নাঈম্ভাই জানালো উনি মাত্রই সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে, আমাকে আজকের মধ্যেই কয়েকটা ভূতুড়ে প্লেইস জোগাড় করতে হবে। ভূতুড়ে প্লেইসে গিয়ে রাত্রিবেলা বিসিবি গ্রুপে লাইভ প্রোগ্রাম করা হবে, এটা হচ্ছে বিসিবির Ghost Hunting প্রোগ্রামের অংশ। আগেও এরকম বিভিন্ন ভৌতিক স্থানে নিশিযাপন করে টিম বিসিবি লাইভ প্রোগ্রাম করে, বলা বাহুল্য, কোথাওই অতিপ্রাকৃত কিছুর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি।

তো, আমি এই ফোন পেয়ে একইসাথে আনন্দে আত্মহারা এবং টেনশনে ধন্দে পড়ে গেলাম! খুশির কারণ হচ্ছে; নাঈম ভাইকে সঙ্গ দেওয়া আমার কাছে সবসময়ই বিশেষ কিছু। আর টেনশনের কারণ হচ্ছে; ইদানীং যে হারে মানুষের সংখ্যা বাড়তেছে তাতে নাকি মানুষের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ভূত-প্রেত-অশরীরীরা দেশ ত্যাগ করে শরণার্থী হচ্ছে (আম্মুর কথা)। তার ওপর এই লকডাউনে ভূতপ্রেত কই খুঁজে পাই? বন্ধু সিপনকে ফোন করে সব জানালাম সে বলল , **মালনীছড়া** চা বাগানের ভেতর **'কালাপাথর'** নামক একটা জায়গা আছে, জায়গাটাকে ঘিরে অনেক ভৌতিক গল্প প্রচলিত, দিনের বেলাতেও কেউ যেতে সাহস পায় না। টিনএজ বয়সে সব বন্ধুরা দলবেঁধে গিয়েছিল, কিন্তু ভয় পেয়ে সবাই চলে এসেছে, টিকে ছিল মাত্র দুজন! সেই দুজনের একজন হচ্ছে সে নিজে, অপরজন ক্লাসের ফার্স্টবয় কবির। যা-হোক, একটু আশ্বস্ত হলাম, ওখানে তাহলে যাওয়া যায়।

যথারীতি নাঈম ভাই **সিলেটের ধোপাগুল** এসে পৌঁছুলেন রাত ৮টার দিকে, বিসিবির সাবেক মডারেটর জাবেদের বাড়িতে খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়ে সবাই বেড়িয়ে পড়লাম কালাপাথরের উদ্দেশ্যে, কবিরকেও ফোন করে মালনীছড়া আনানো হলো, সাথে এলো আরও দুজন। মালনীছড়া পৌঁছানোর পর তারা শোনালো ভিন্ন কথা, কালাপাথর আর আগের সেই ডেঞ্জার জোন নেই, জনবসতি স্থাপন আর ঝোপঝাড় সাফ করে এর রহস্যময়তা মিইয়ে আনা হয়েছে! তবে মন্দের ভালো হিসেবে জানলাম; মালনীছড়া চা বাগানের একটু ভেতরেই একটা শ্মশান আছে, ওইখানে নাকি কয়েক বছর আগে কোন **ঘোস্ট হান্টিং ইউনিট** এসে লাইভ পোগ্রাম করেছিল, তারা সেখানে রাত্রিবেলা অস্বাভাবিক কুকুর আর বিরাট বড়ো গোরু দেখতে পেয়েছিল। এছাড়া চা বাগানে বাস করা অনেকেই রাত্রিবেলায় এখানে অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখেছে, মাথাহীন গোরু, সিঁদুর-ঘোমটা পড়া নারী অবয়ব, এইরকম আরও অনেক ঘটনা।

এইভাবে ঘটনার বর্ণনা শুনতে শুনতে অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে পথ চলছিলাম, হঠাৎ একজন বলে উঠল– "আমরা তো জায়গামতো চলে এসেছি"! ফোনের ফ্লাশ জ্বালিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখি আমি একটা মাটিচাপা দেওয়া কবরের ওপর দাঁড়িয়ে! উল্লেখ্য, হিন্দু চা শ্রমিকেরা বেশিরভাগই মৃত্যুর পর লাশকে মাটিচাপা দিয়ে দেয়। আর এই মাটিচাপা দেওয়ার স্থানগুলোকেই এখানে সাধারণত শ্মশান বলা হয়। তবে মড়া পোড়ানোর জন্য আলাদা শ্মশানও আছে।

শ্মশানে এলেও ফেইসবুক লাইভে যাওয়া সম্ভব হলো না, ফোনের নেটওয়ার্ক একেবারে নাই হয়ে গিয়েছিল!

কিছুক্ষণ পর থেমে থেমে নেট আসা-যাওয়া করতে লাগল, তাতে ভাঙা ভাঙা লাইভে যতটুকু পারা যায় কাভার করলাম।

যা যা দেখেছি–

চা বাগানের টিলার মধ্য দিয়ে পিচরাস্তা, দুপাশে একটু পরপর বাশঝাঁড়, আকাশে চাঁদ নেই, তার ওপর মেঘে আকাশ কালো হয়ে আছে, মোটকথা চরম অপার্থিব দৃশ্য। শ্মশানে পাশাপাশি অনেকগুলো সমাধি, কবরের মতোই মাটি উঁচু করা আছে, প্রত্যেকটা সমাধির পাশেই মাটির পাতিল পড়ে আছে, সঙ্গীরা কেউই এগুলোর ব্যাপারে কিছু বলতে পারেনি, হতে পারে এটা ওদের শেষকৃত্যের কোনো রীতিনীতির অংশ। পথে পথে মসুর ডাল পড়ে থাকতে দেখেছি, সমাধির ওপর মসুর ডাল ছিটিয়ে দেওয়া হয়, এর গন্ধে নাকি শেয়াল বা অন্যান্য প্রাণীরা সমাধি খুঁড়তে আসতে পারে না, এটা কতটুকু বিজ্ঞানসম্মত তা আমার জানা নেই।

রাতের দৃশ্য; চা বাগানের ভেতর বাঁশঝাড়

যা-হোক, একটা সমাধি পেয়েছি চুন-সুরকি দিয়ে পাঁকা করা, প্রথমে এটাকে আমরা মড়া পোড়াবার বেদী ভেবেছিলাম, কিন্তু না, এটা নিজেই একটা সমাধি, মাথার দিকে সিমেন্টের ওপর আঁচড় কেটে কিছু লেখা আছে, আমরা শুধু সমাহিত ব্যক্তির নামের প্রথম অংশ 'বেউলা' আর জন্ম-মৃত্যু সন পড়তে পেরেছি। সাদা সাদা কুঁড়ি ফুলের গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শ্মশানজুড়ে। আমরা একটা অদ্ভুত সুন্দর ব্যাঙও দেখতে পেয়েছি, ব্যাঙটার নাম সম্ভবত ***Leptobrachium smithi Matsui.*** কিছু সুদৃশ্য ব্যাঙের ছাতাও দেখা গেছে, নাঈম ভাই এগুলোর ছবি তুলে সাথেসাথেই বিসিবিতে পোস্ট করে দিয়েছে।

শ্মশানে ব্যাঙ! *Leptobrachium smithi Matsui*

রাতের বেলা চা বাগানের ভেতর সাধারণত বাইরের কেউ প্রবেশ করতে পারে না, ভাগ্যিস ওখানে আমাদের পরিচিত ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল, আমাদের জন্য বরাদ্দ

করা সময় ফুরিয়ে যাওয়াতে আমরা বেরিয়ে আসি, তবে যে উদ্দেশ্যে এসেছিলাম, অতিপ্রাকৃত কিছুর উপস্থিতি টের পেতে, এই উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে, ভূত-প্রেত-অশরীরীর নামগন্ধও পাইনি, গরু-ছাগল, কুত্তা-বিলাই এসবের কিছুও চোখে পড়েনি।

শ্মশান ভ্রমণের এখানেই সমাপ্তি।

পরদিন ভোরে ধোপাগুলে পোকাখেকো গাছ সূর্যশিশির দেখতে গিয়ে লাইভে আসার কথা ছিল, কিন্তু গিয়ে দেখি সূর্যশিশিরগুলো গতবারের তুলনায় ছোটো ছোটো, এখনো এদের পূর্ণ মৌসুম আসেনি, তাই সেখানে লাইভ করার প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়।

সূর্যশিশির নিয়ে সংক্ষেপে একটু বলি, সূর্যশিশির (Sundew) হচ্ছে একধরণের মাংসাশী উদ্ভিদ (Carnivorous plant), এর বৈজ্ঞানিক নাম ***Drosera spatulata.*** বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর এবং সিলেটে এর দেখা মেলে। এখন পর্যন্ত সারাবিশ্বে ৯৩০ ধরনের সূর্যশিশিরের প্রজাতি পাওয়া গেছে। তো, সিলেটের ধোপাগুলে যা দেখছিলাম, এর লোমশ পাতাগুলো চামচের মতো, পাতায় পাতায় আঠালো নেক্টার (mucilage) থাকে, যা দেখতে শিশিরের মতো। পোকামাকড় এই নেক্টার খাওয়ার লোভ সামলাতে পারে না, ফলে আঠালো নেক্টারে আঁটকে যায়! সেইসাথে পাতাটাও কুঁচকে গিয়ে পোকার মুক্তির পথ আরও কঠিন করে তোলে, পাতা থেকে এনজাইম নিঃসৃত হয়ে পোকাটাকে ধীরে ধীরে হজম করতে থাকে।

ধোপাগুলের সূর্যশিশির

যা-হোক, দুপুরে আমরা রওনা দিই হিলুয়াছড়া চা বাগানের ভেতর অবস্থিত **বিয়াবন শাহ রহ.** এর মাজারে, উনার সম্পর্কে যা যা শুনলাম সেটার সারমর্ম হচ্ছে– অত্যাচারী হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দ যাতে কোনোভাবেই পালিয়ে যেতে না পারে সেইজন্য হজরত শাহজালাল ইয়ামনি রহ. বিয়াবন শাহ রহ. কে এই দিকে পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত করেন। ছোটো একটি টিলার ওপর অবস্থিত প্রাচীন একটি বটগাছের নিচে বিয়াবন শাহ রহ. এর মাজারটা অসম্ভব নির্জন, এখানে বসে বনমোরগ সহ বিভিন্ন পশুপাখির ডাক শোনাটা সত্যিই রোমাঞ্চকর।

বিয়াবন শাহ রহ. মাজারের বটগাছ

তারপর আমরা রওনা দিই **'হারং হুরং'** গুহাটির উদ্দেশ্যে, এই গুহা নিয়ে দু-চারটা বাক্যব্যায় করি; 'হারং-হুরং' শব্দ দুটি সিলেটের প্রাচীন আঞ্চলিক ভাষার শব্দ। সিলেটি ভাষায় 'হারং' শব্দের অর্থ সাঁকো বা বিকল্প পথ আর 'হুরং' মানে 'সুড়ঙ্গ'। অর্থাৎ 'হারং হুরংশব্দ দ্বারা বিকল্ 'প সুড়ঙ্গ পথ বোঝায়। কথিত

আছে; ১৩০৩ সালে রাজা গৌড় গৌবিন্দ যখন হজরত শাহজালাল রহ. এর সিলেট আগমনের খবর পান, তখন তার সৈন্যবাহিনীসহ পেঁচাগড় গিরিদুর্গের এই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর নিরুদ্দেশ হয়ে যান! এই সুড়ঙ্গটিকে বাগানের লোকেরা “গৌর গবিন্দ রাধা গুহা” নামে চিনে; এখানে প্রতি শনি এবং মঙ্গলবার পূজা দেওয়া হয়। সুড়ঙ্গটি প্রায় ৭০০ বছর বা তারও বেশি আগেকার সময়ের। ফলে এটাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মাঝে নানা লোককাহিনি প্রচলিত রয়েছে। অনেকের ধারণা এ সুড়ঙ্গটি জৈন্তা পর্যন্ত বিস্তৃত। যেসব ব্যক্তি গুহাটিতে প্রবেশ করেছেন, তাদের কেউই জীবিত বের হয়ে আসেনি বলে জনশ্রুতি আছে। আর যদিও বা কেউ বের হয়েছে তবে কিছুদিনের মধ্যে অপ্রকৃতস্থ হয়ে সে মারা গিয়েছে। ভারতের তিনজন তান্ত্রিক এখানে প্রবেশ করেছিলেন। তাদের মধ্যে মাত্র একজন ফিরে এসেছেন আর খুব অল্পদিন বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনিও স্বাভাবিক ছিলেন না। সিলেটের একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী গুহাটি খননের উদ্যোগ নেন, কিন্তু তিনিও অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখে সংস্কারকাজ মাঝপথে বন্ধ করে দেন। এই গ্রামের এক বৃদ্ধ যৌবনকালে ঢুকেছিল। ভিতরে কিছু একটা দেখে সে ভয়ে বেড়িয়ে আসে। এরপর থেকে লোকটি পাগল, তেলিহাটির বিখ্যাত কবিরাজও তার চিকিৎসা করতে পারেনি। এই হচ্ছে বিভিন্ন দৈনিক গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে বাংলা উইকিপিডিয়ার ভাষ্য।

আমরা যেটা দেখলাম–

মালনীছড়ার মূল গেইট থেকে সিএনজিতে চেপে চা বাগানের টিলার পাশ ঘেঁষে বানানো কাঁচা রাস্তা ধরে নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আমরা ‘হারং-হুরং’ পৌঁছাই, তখন প্রায় সন্ধ্যা সমাগত। গুহায় প্রবেশের আগে রাস্তার দু-ধারে অর্কিডের সারি চোখে পড়ে, বিশাল লম্বা লম্বা কয়েকটা কেয়াগাছও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। ছোটো-খাটো একটা টিলার ভেতর দিয়ে গুহার প্রবেশ মুখ, প্রবেশ মুখের ওপরে গাছের শেকড়-বাকর ছড়িয়ে আছে, সেসব শেকড়ে জায়গায় জায়গায় ফিতা বাঁধা! মনের উদ্দেশ্য পূরণ হবার নিমিত্তে এসব ফিতা বেঁধে ‘মানত’ করা হয়েছে। মোট দুটো গুহা আছে এখানে, ডান পাশেরটা তুলনামূলক ছোটো, এর পাশে নাকি আরেকটা গুহা ছিল সেটা মাটি ধ্বসে বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা তুলনামূলক বড়ো সর্ব বাম পাশের গুহাটায় ঢোকার সিদ্ধান্ত নিলাম, গুহার ব্যাস তেমন একটা বড়ো না, হাঁটু গেড়ে ঢুকতে হয়। নাঈম ভাই সবার আগে প্রবেশ করলেন, উনার হাতের ফোনে ভিডিয়ো রেকর্ড হচ্ছে, গুহার দেওয়ালজুড়ে বিভিন্ন গাছের শেকড়, পেছন থেকে শিপন টর্চ জ্বালিয়ে নাঈম ভাইকে রাস্তা দেখাচ্ছে। প্রায় ১০ ফুট যেতেই একটা বাদুড় চোখে পড়ল! বেচারা গুহার দেওয়ালে উলটো হয়ে ঝুলে ছিল! নাঈম্ভাই বিশ ফুটের মতো এগিয়ে গেলেন, জানালেন আর সামনে এগুনো সম্ভব না, কারণ গুহার সুড়ঙ্গ ক্রমেই সরু হয়ে আসছিল, এরপর এগুতে হলে বুকে হেঁটে এগুতে হবে! টর্চের আলোয় যতটুকু দেখা গেল গুহার সরু সুরঙ্গপথটা কিছুদূর গিয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। আমরা ফিরে বেরিয়ে এলাম। এই গুহায় ঢোকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এখন পর্যন্ত আমাদের কারও কোনো ধরনের শারীরিক বা মানসিক সমস্যা দেখা যায়নি।

হারং-হুরং গুহায় যাবার পথে আমরা একটি বেশ বড়োসড়ো ট্রি ফার্ণ দেখতে পাই, এটা ***Cyathea delgadii*** হতে পারে, যদিও আমরা এখনো এর প্রজাতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারিনি। আমরা ধারণা করছি এরকম ট্রি ফার্ন বাংলাদেশে বিরল, এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি চলছে।

ট্রি ফার্নের সাথে নাঈম ভাই

সবশেষে আমরা গিয়েছিলাম সালুটিকরের **'চেঙের খাল'** সংলগ্ন একটা হাওড়ে, সেই হাওড়ের মধ্যখানে উঁচু ঢিবির মতো একটা জায়গা, পিরামিড আকৃতির একটা স্থাপনা আছে সেখানে, যাকে এলাকাবাসীরা মন্দির বলে অভিহিত করে। আর আছে কিছু বড়োসড়ো পাথর, এগুলোর ব্যাপারে কেউ সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। তবে আমরা ধারণা করছি এটা হতে পারে প্রাচীন আমলের কোনো দালানের ধ্বংসাবশেষ। তো, এই জায়গা নিয়েও প্রচুর অলৌকিক ঘটনা প্রচলিত আছে, এখানে রাত-বিরাতে দূর থেকে অনেক রোমহর্ষক দৃশ্য দেখা যায়, জায়গাটার আশেপাশে প্রতি বছর নাকি অন্তত ৬ জন করে মানুষ মারা যায়, এই বছরও একজন শিশু মারা গেছে। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম বিসিবির পক্ষ থেকে, আমরা লাইভে এসে সবাইকে দেখাতে চেয়েছি এখানে কোথাও কোনো অলৌকিক ব্যাপার ঘটে কি না, কিন্তু যারপরনাই আমরা হতাশ হয়েছি, তবে ভ্রমণ শেষে আমাদের লোকাল গাইড সবাইকে একটি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, রাত-বিরাতে এই মন্দির মাড়িয়ে 'বেয়াদবি' করার কারণে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কারও অবশ্যই শারীরিক ক্ষতি হবে, নাঈম ভাইয়ের ক্ষেত্রে নাকি সেটা আরও বেশি সত্যি। তো আমরা এই জার্নি শেষ করে নিরাপদে যার যার বাড়ি ফিরে গেছি,

২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, এখনো কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

সামনে থেকে; মিশু দেব, নাঈম হোসেন ফারুকী, মুস্তফা কামাল জাবেদ, এ আর মুবিন এবং শিপন মিয়া।

পাতা ব্যাং/ লাল-চোখ ব্যাং

আবু রায়হান

ব্যাং হলো বহুল পরিচিত এক ধরনের উভচর প্রাণী। American Museum of Natural History দ্বারা পরিচালিত উভচর প্রাণীদের নিয়ে কাজ করার সাইট amphibiansoftheworld.amnh.org
এর মতে বিশ্বে ৫৫টি+ গোত্রে (Family) বিস্তৃত প্রায় ৭,৩৪৭টির মতো ব্যাঙের প্রজাতি রয়েছে।
আর বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় ৪০ প্রজাতির ব্যাং, যা সারাদেশে বিস্তৃত।

সিলেটে নাঈম ভাই, মুবিন ভাই আর জাবেদ ভাই ঘুরতে গিয়ে মালনিছড়া টি স্টেটের ভেতর দেখা পান এই ব্যাঙের।

নাম-পরিচয়:

ব্যাংটির পরিচয় জানার প্রচেষ্টায় কতক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর ব্যাংটির বৈজ্ঞানিক নাম Leptobrachium smithi বলে নিশ্চিত হই।

আসামে বলে রঙা-চকুয়া ব্যাং (লাল-চোখ ব্যাং)।
আর বাংলায় বলে পাতা ব্যাং, লাল-চোখ ব্যাং।
ইংরেজি: Smith's slender-handed frog, Red-eyed Frog

বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিন্যাস:

রাজ্য: Animalia
পর্ব: Chordata
শ্রেণি: Amphibia
বর্গ: Anura
গোত্র: Megophryidae
গণ: Leptobrachium
প্রজাতি: L. smithi
দ্বিপদী নাম: *Leptobrachium smithi*
Matsui, Nabhitabhata, and Panha, 1999

বর্ণনা:

এটা মধ্যম আকৃতির ব্যাং। এই প্রজাতির পুরুষ ব্যাংটির দৈর্ঘ্য ৩৬–৬৮ মি.মি (মুখ–পায়ুছিদ্র)। আর স্ত্রী ব্যাঙের দৈর্ঘ্য ৫০–৭৮ মি.মি (মুখ–পায়ুছিদ্র)।
এদের মাথা মোটামুটি বেশ বড়ো ও চ্যাপটা।

চোখ দুটো বড়ো এবং অক্ষিগোলক মাথা থেকে দেহের

বাইরে কিছুটা বের হয়ে থাকে। চোখের আইরিশের ওপরের কিছু অংশের রং লাল/হলুদাভ-লাল/হলুদ, নিচের অংশ কালো।

আঙ্গুলের ডগাগুলো কিছুটা গোলাকার এবং আঙ্গুলগুলো বেশ লম্বা।
শরীরে কালো কালো ছোপ ছোপ, কখনো লম্বা, অনিয়মিতভাবে সাজানো ডোরাকাটা দাগ বিদ্যমান। কখনো এ দাগ কেবল পায়ের দিকে, আবার কখনো প্রায় সারা শরীরে বিস্তৃত।

বাসস্থান:

এগুলোকে প্রায়শই আপনি কোনো চিরহরিৎ বন, পর্ণমোচী বন ও রেইনফরেস্টে বর্ষাকালে এদের বাসস্থানের জায়গায় কোনো পাতার নিচে বা পাতা পচে তৈরি হওয়া স্থানে (litter) দেখতে পাবেন। তাই এর আরেক নাম Smith's litter frog। চোখ লালচে হওয়ায় এদেরকে Red-eyed frogও বলা হয়ে থাকে।

শব্দ:

এদের পুরুষ ব্যাং সূর্যাস্তের পরপরই বনে ডাকতে শুরু করে (পানিতে বসে নয়, ডাঙায়)।

এদের ডাকের শব্দ বেশ উচ্চ এবং মে থেকে আগস্ট মাসে এদের ডাক শোনা যায়।

Nature Study Society of Bangladesh এর মতে, বাংলাদেশে এ প্রজাতিটি সর্বপ্রথম ২০০৫ সালে 'আসমত' নামক একজন ব্যক্তির দ্বারা বাংলাদেশের

দক্ষিণ-পূর্ব অংশ (পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি) থেকে সর্বপ্রথম রিপোর্ট করা হয়।

এই প্রজাতির ব্যাং সিলেটের বেশ কয়েকটি স্থানেও যেমন রেমা-কালেঙ্গা বন, লাউয়াছড়া বনেও পাওয়া যায়।

এছাড়া ভারত, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, লাওসসহ আরও কিছু দেশে এর দেখা মেলে।

সংরক্ষণ অবস্থা:

এটি IUCN অনুযায়ী এটি Least Concerned, মানে এটির বিলুপ্তি নিয়ে আপাতত চিন্তা নেই।

ট্রি ফার্ণের নতুন প্রজাতি?

মুস্তফা কামাল জাবেদ

অনেক আগের কার্বোনিফেরাসের যুগ থেকে পৃথিবীর সাথে এগিয়ে চলা ফার্ণ হলো ভাস্কুলার উদ্ভিদ (পরিবহনের জন্য জাইলেম আর ফ্লোয়েম আছে) সমাজের এমন এক সদস্য যে ফুলও দেয় না, বীজও না! তাহলে বংশবৃদ্ধি করে কেমন করে? উপায় আছে, সেটা হলো স্পোর। এগুলোর পাতা প্রথমে কয়েল টাইপ (ফিডলহেড) থাকে, পরে এইটা বড়ো হতে হতে মোটাসোটা ভাগ করা পাতা, যাকে বলে ফ্রন্ড ওইটা হয়ে যায়।

আশেপাশে আমরা নানান ধরনের ফার্ণ দেখতে পাই, তার মধ্যে Cyatheales, Marattiales আর Polypodiales অর্ডারের ফার্ণগুলোকে বলে ট্রি ফার্ণ। বেশিরভাগ ট্রি ফার্ণকেই ট্রাংকের মতো স্টেম আর আর্বোরেসেন্ট (গাছের মতো) বিহেভিয়ার দিয়ে আলাদা করা হয়। ঠান্ডা আবহাওয়ার রেইন ফরেস্ট, যেমন: অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং তার আশেপাশের এলাকায় এইগুলো পাওয়া যায় অনেক।

সব ফার্ণের মতো এগুলোও স্পোর দিয়ে তার বংশ বৃদ্ধি করে। ট্রাঙ্কগুলো মডিফাইড রাইজোম হিসেবে থাকে, আর ট্রি লাইক হলেও এতে উডি টিস্যু খুব কমই থাকে। এই জিনিসটার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য কোষ প্রাচীরে লিগনিন এর ভান্ডার আর স্টেমের নিচের অংশে পিচ্চি পিচ্চি রুটের আচ্ছাদন থাকে। সারা পৃথিবীতে ৩০০ প্রজাতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ ফার্ণগুলো লম্বায় ৯ মিটার থেকে ২০ মিটারও হতে পারে। আবার কেউ কেউ কয়েক ফুট মোটাও হতে পারে।

বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, মাধবকুন্ড, সাতছড়ি এই টাইপ

জায়গায় এর অস্তিত্ব আছে। পানসে স্বাদের এই গাছকে কবিরাজরা কাটাকুটি করে নানান কাজে ব্যবহার করে, বেচা বিক্রির বহর দেখে সর্বরোগের মহৌষধ বলে চালালেও এখন অবাক হবো না। একে মুরসালিন, হরিণখুরি নামেও ডাকা হয়।

পাতা

উপরের অংশ

পুরো গাছ

টিম বিসিবির পক্ষ থেকে সিলেটের ট্যুরের অংশ হিসেবে হিলুয়াছড়ার ভেতরে হারং হুরং গুহায় যাওয়া হচ্ছিল। সফরসঙ্গী ছিলেন গ্রুপের এডমিন নাঈম ভাইয়া, মডারেটর মুবিন ভাই এবং মেম্বার শিপন ভাই। তো ওইখানে যাওয়ার রাস্তাটা যথেষ্ট রোমাঞ্চকর ছিল, আঁকাবাঁকা রাস্তা, তার উপর একদিকে ঢাল। একটু

পরপর এই গাড়ি পড়ে যাচ্ছে এমন অবস্থা! এর মাঝে এক জায়গায় সাঁই করে বাঁদর গেল আর ওইখানেই নাঈম ভাইয়ার চোখে পড়ল আপন ক্ষমতায় বিরাজ করা এক ট্রি ফার্ণ। ট্রি ফার্ণ যে বাংলাদেশে খুব কমন এমন না। বাংলাদেশের ট্রি ফার্ণ নিয়ে লেখা আছে এমন পেপারই পাওয়া গেল টোটাল দুটো; একটা হলো সিলেটের সাতছড়ির, আরেকটা ময়মনসিংহের। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় খুব বেশি সময় অবস্থান করা বা বেশি করে ছবিও তোলা যায়নি।

স্কলার অনুযায়ী বাংলাদেশে ট্রি ফার্ণের ডকুমেন্টেড দুইটা প্রজাতি আছে, পেপারও ওই দুটো।

একটা হলো ময়মনসিংহের *Angiopteris evecta.*

আরেকটা হলো সাতছড়ির *Cyathea gigantea.*

এই দুটোর কোনোটার সাথেই আমাদের দেখা গাছের মিল পেলাম না।

পাতার রং, আকার বা কান্ডের রং আলাদা।

সম্ভবত অফলাইন রেকর্ডেড আরো দুইটা প্রজাতি আছে, ওগুলোর সাথেও মিল পাওয়া গেল না।

তবে ঘাঁটাঘাঁটি করে যতটুকু মনে হলো এটা Cyathea গণের অন্তর্ভুক্ত, যদিও শিওর না। আর plant list এ এর ২০০+ প্রজাতি রয়েছে, এতগুলো চেক করা বা খুব ভালো ভালোভাবে এর থেকে আলাদা করা সহজসাধ্য না, আর সময়সাপেক্ষও।

আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই এর প্রজাতি শনাক্ত করা সম্ভব হবে। যদি এনলিস্টেড থেকে কোনোভাবে মিস না করা হয় আর মিলিয়ে নিতে কোনো ভুল না থাকে তবে এটা বাংলাদেশের নতুন কোনো ট্রি ফার্ণ এর প্রজাতি হলেও হতে পারে!
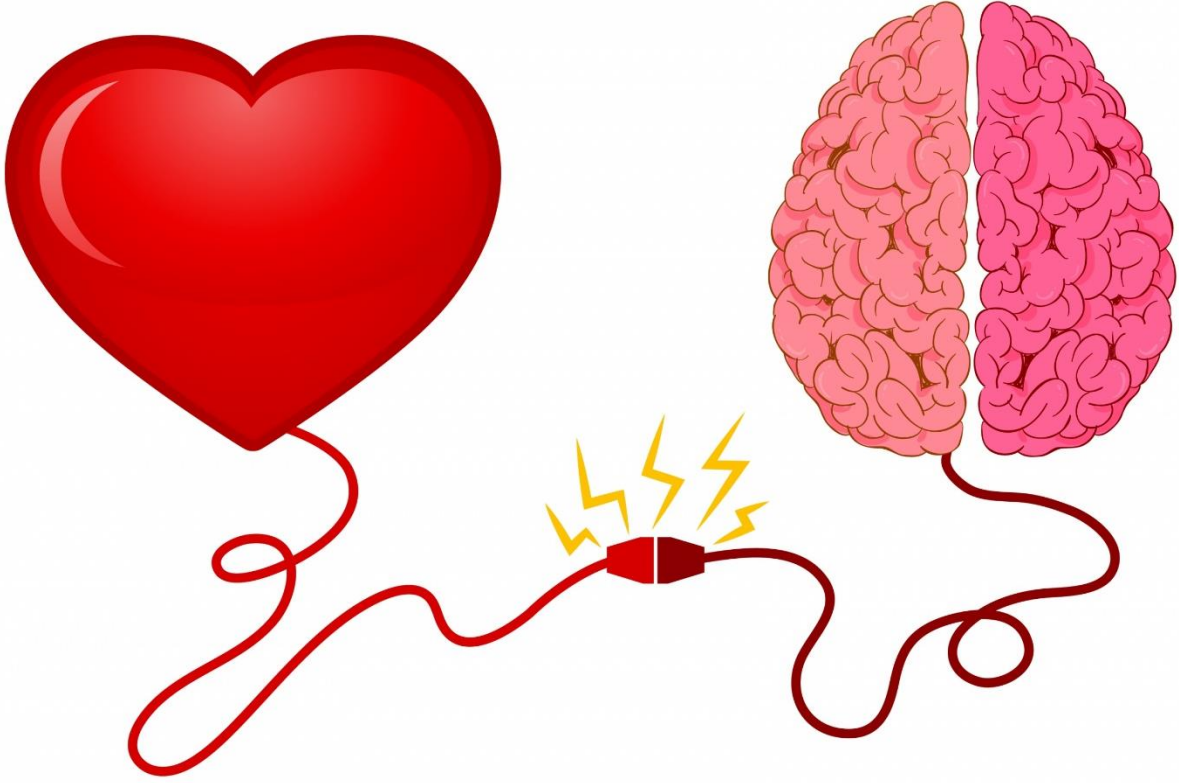
Stolen Love from Brain to Heart

তানভীর রানা রাব্বি

ভালোবাসা সহ যত প্রকার অনুভূতি আছে, সবই মস্তিষ্কে সংঘটিত হওয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া। কিন্তু ভালোবাসার সাথে হৃৎপিন্ড/heart জড়িয়ে আছে সেই প্রাচীন কাল (not really) থেকে। একটা সময় মনে করা হতো শরীরের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে হৃদপিন্ড। কিন্তু সবকিছু সেই ভুল ধারণা থেকে সরে আসলেও **ভালোবাসা** আজও সরে আসেনি। এখন ভালোবাসার পেছনে মস্তিষ্ক ঘটিত রসায়ন বিশ্লেষণ করা যাক।

প্রথম ধাপ:

প্রেমে পড়ার প্রথম দিকে cortisol নামক হরমোনের প্রভাব খুব বেশি থাকে। এই হরমোন নতুন বা অপরিচিত কিছু গ্রহণ করার প্রাথমিক যে ভীতি তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। এইসময় serotonin (5-hydroxytryptamine) নামক এক monoamine neurotransmitter-এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। আবার মস্তিষ্কের prefrontal cortex অংশ এ সময় কর্মক্ষমতা হ্রাস করে দেয় যাতে আপনি আপনার সঙ্গীকে খুব বেশি যাচাই-বাঁছাই করতে না হয়। এজন্য দেখবেন বেশিরভাগ মেয়েদের প্রথম প্রেম থাকে পুরা আজাইরা ছেলের সঙ্গে তবে সবাই না (I repeat সবাই না)।

২য় ধাপ:

এই সময় ভালোবাসায় কিছুটা স্থিরতা আসে। এই সময় নিরাপত্তা, দৃঢ়তা আর ভারসাম্য আসে সম্পর্কে। আবেগ থাকে, সাথে ঘনিষ্টতা, অঙ্গীকার বাড়ে। cortisol, serotonin - এর পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে আসে, অন্যদিকে oxytocin আর vasopressin এর পরিমাণ

বাড়তে থাকে। তো পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে এসব হরমোন মস্তিষ্কের বিভিন্ন গ্রহন প্রোটিনের সাথে বন্ধন তৈরি করে, আর সেটা মস্তিষ্কে ভালোলাগার অনুভূতি তৈরি করে। যখন এই হরমোন আর receptor এর মধ্যে মিলন ঘটে, তখন dopamine নামের neurotransmitter - এর নিঃসরণ হয়। যার ফলে আসাধারণ অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

Oxytocin আর vasopressin কিন্তু একই কাজ করে না। মেয়েদের oxytocin তুলনামূলক বেশি থাকে, সেজন্য তারা প্রেমিকের সাথে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। “বাবু খাইসো” টাইপের। আবার পুরুষদের vasopressin থাকে যেটা তাদেরকে সাহস যোগায়। এটা ভীতিকর, চাপদায়ক পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাহায্য করে। এজন্যই মায়েরা সন্তান আদর করে যত্ন নেয়, আর বাবারা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন।

এটাই মূলত ভালোবাসার চক্র, তবে একটা অংশ যুক্ত করি। যদিও সেটা সম্পর্ক ভাঙার ব্যাপার।

৩য় ধাপ:

অনেক সময় দেখা যায় দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ায় বুকে ব্যথা হয়। আর এটা ভুল নয়, আসলেই সত্য। শারীরিক ব্যথার এবং মানসিক ব্যথার সময় মস্তিষ্কে একই উদ্দীপনা কাজ করে। তাছাড়া এসময় অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে। এসময় adrenaline/epinephrine হরমোন নিঃসরণ বেড়ে যায়। যার কারণে ব্যাপক মানসিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। clinical depression সহ নানা ধরণের মানসিক প্রভাব পড়তে পারে। So সাবধান, কারণ এসব ব্যাপার অনেক বেশি tough & hurting. Who knows better than me :)

রেমা-কালেঙ্গা

নাঈম হোসেন ফারুকী

১।
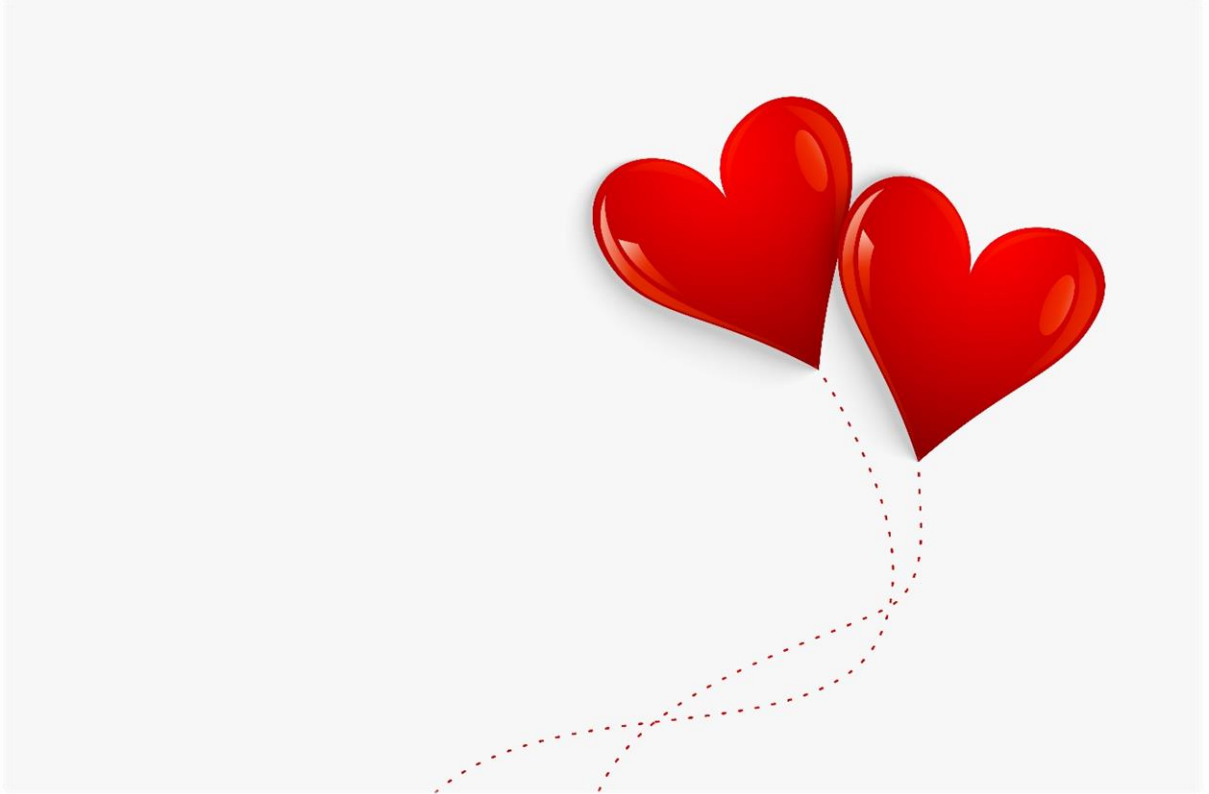
নিশুতি রাত

গাড়ি চলছে দুপাশে বনের মধ্য দিয়ে। আশেপাশে কালো কালো গাছ। ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে জ্বলজ্বলে চোখ। কান পাতলে বহুদূরের জান্তব হুঙ্কার ভেসে আসছে। রাতের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে ভেসে সেই হুঙ্কার গাড়ির কাছে, আরও কাছে আসছে।

ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আগুনের আলোয় ঝলসে উঠছে রহস্যময় বনভূমি।

এবার বাজ পড়ল একেবারে কাছে। গাড়ি হুট করে ব্রেক কষল।

শায়েস্তাগঞ্জ এসে গেছে। বাইরে খটখটে রোদ। ঝড়বৃষ্টির চিহ্ন মাত্র নাই।

বাস থেকে নামলাম আমি আর ইমন।

২।

শায়েস্তাগঞ্জ বাজার থেকে ৩০-৪০ মিনিটের পথ চুনারুঘাট বাজার। সেখান থেকে আরও কয়েক কিলো দূরে রেমা-কালেঙ্গা। বড়ো একটা গেটে বড়ো বড়ো করে লেখা Rema Kalenga Wildlife Sanctuary। গেটের বাইরে কয়েকটা চায়ের দোকান, আর লাসো ভাইয়ের বাড়ি। লাসো ভাই হলো এলাকার গাইড সাপ্লায়ার, প্লাস খুবই অতিথিপরায়ণ লোক।

লাসো ভাইয়ের ওখানে একটু ফ্রেশ হয়ে, একজন গাইডকে সাথে নিয়ে ঢু মারলাম জঙ্গলে। বিকালের জঙ্গল, পিকনিক পার্টি গান বাজাচ্ছে, অনেকটা বিরক্তিকর পরিবেশ। গেট থেকে প্রায় ২০-২৫ মিনিট দূরে একটা ওয়াচ টাওয়ার, ওয়াচ টাওয়ারের একপাশে ঘন জঙ্গল, একপাশে পুকুর। ওয়াচ টাওয়ারের নিচে পাতা তাটা পরিষ্কার করে তাঁবু খাটানো হলো।

আস্তে আস্তে সূর্য ডুবল। গলায় টুনটুন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এলাকার রাখাল ছেলে গরু নিয়ে গেল। বহুদূরে মানুষের কলরব থামল, পিকনিক পার্টির গান থামল।

রাত নামল রেমা কালেঙ্গার জঙ্গলে। আশেপাশে কয়েক কিলোর মধ্যে তখন আমরা দুজন।

আমি আর ইমন।

৩।

যারা তাঁবু জিনিসটা চিনেন না, তাদের বলি, তাঁবু হলো বাচ্চাদের মশারির মতো একটা জিনিস। ভেতরে ঢুকে চেইন টেনে দরজা বন্ধ করতে হয়। একপাশে ছোটো একটা জানালা আছে, খোলা রাখলে বাইরে দেখা যায়। রাতে তাবুতে ঢুকলে অবশ্যই বাতি নিভিয়ে ঢুকতে হবে, নাহলে রাজ্যের পোকামাকড় ঢুকে যাবে তাবুতে।

তাবুতে ঢুকে কিছুক্ষণ বই পড়ার ফিল নিলাম। চারপাশে ঘন জঙ্গল। ঝিঁঝি আর পোকামাকড়ের ডাকে মুখর। গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে ছোটো এক চিলতে আকাশ, সেখানে তারাদের রাজ্য। ওই তারা, রাতের জঙ্গল, আর হাতে ভূতের বই - সেই দুনিয়া অনেক অনেক দূরের, কংক্রিটের শহরে তাকে পাওয়া যাবে না।

৯ টার দিকে পেটে টান ধরল। রওনা দিলাম লাসো ভাইয়ের বাসায়। আমার সারি জীবনে দেখা সব জোনাকি ভিড় করল ওই ফেরার পথটায়। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল জঙ্গলের গেটে।

চায়ের দোকানে আড্ডা বসেছে তখন, জমেছে চিতাবাঘের গল্প। পাশে ত্রিপুরার জঙ্গল, চিতাবাঘ নাকি গরু মেরেছে সেখানে। ইমন একটু করে শোনে আর একটু করে মুষড়ে পড়ে। লাসো ভাইয়ের গরম গরম ভাত আর দেশি মুরগির মাংস তার মন ভালো করতে পারল না। বরং লাসো ভাইয়ের বনবিড়াল, বাঘডাশ আর শজারুর গল্প আরও ঘাবড়ে দিল তাকে।

ইমন তাবুতে ব্যাক করবে না। অ্যাট লিস্ট, একা একা তো কোনোভাবেই না। ওর আর্মি বড়ো ভাই আছে, তাকে ফোন করে বলবে গার্ড পাঠাতে। ওই গার্ড সারারাত বাইরে দাড়িয়ে থাকবে। শুনে আমি থ! বলে কী এই ছেলে! আর্মি ভাইকে ফোন দিলে সে এখুনি বলবে, "গো হোম"। অনেক কষ্টে বুঝায় শুনায় তাকে ফিরতে রাজি করানো হলো। লাসো ভাইও কথা দিল, একটু পরেই একটা লোক পাঠায় দিবে।

রাত ১১টা। জঙ্গলে ফিরছি আমি আর ইমন। জোনাকিরা সব গন। বাইরে দোকানপাঠ সব বন্ধ। ৫ মিনিট হাঁটার পর নেটওয়ার্কও গন। লাসো ভাইয়ের সাথে যোগাযোগের উপায় নেই। ইমনের কান্নাকাটি আরও বাড়ল।

গভীর রাতের রাতের জঙ্গলে তখন যোগ হয়েছে নতুন নতুন শব্দ। ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে ঘোঁত করে উঠল কী জানি। বুনো শুয়োর না কি?
একটু দূরে একটা ওয়াই। আসার সময় তো খেয়াল করিনি। ডানে যাব না বামে?
কী মনে করে ডানেই গেলাম। ওমা, সামনে আরেকটা ওয়াই। এবার? তাঁবু কোনদিকে?

বাইরে শুয়োরের ঘোঁতঘোঁত আরও বাড়ল। ইমনের চাপাচাপিতে লাইট অফ করলাম। ঘন কালো জঙ্গল আরও ভালভাবে চেপে বসলো।

সেই সময়, কী মনে করে জানি না, স্থানীয় একজন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সে আমাদের পথ দেখায় দিল। জানে কিছুটা পানি আসলো তাবুতে ফিরতে পেরে।
ইমন কিছুতেই তাঁবুতে ঢুকবে না, ওয়াচ টাওয়ারে রাত কাটাবে। ঘণ্টা খানেক পর লাসো ভাই এসে আমাদের খোঁজ নিয়ে যাওয়ার পর ইমনের কিছুটা সাহস হলো। সে তাঁবুতে ব্যাক করল।

৪।
রাতের জঙ্গল শব্দে মুখর। ঘোঁত ঘোঁত, ক্রিক ক্রিক, শিষের শব্দ, শেয়ালের ডাক, দূর থেকে ভেসে আসা জান্তব চিৎকার। কী জানি একটা মৃদু পায়ে তাঁবুর কাছ থেকে ঘুরে গেল। একটু পর পায়ে কে জানি আস্তে করে টোকা দিলো, পা গুটিয়ে নিলাম ভিতরে।

নিশুতি রাতে বের হয়েছে রাতের জন্তুরা। সজারু হয়তো হাঁটছে ঝমঝম করে, ঝোপের আড়ালে গন্ধগোকুলের চোখ জ্বলছে। উড়ন্ত কাঠবিড়ালি ডানা মেলে পালাচ্ছে ডাল থেকে ডালে, তাড়া করে ফিরছে বনবিড়াল আর বাঘডাশ। পাশের জঙ্গলে গোরু মেরেছে যে চিতাবাঘটা সে কি টের পেয়েছে নতুন শিকারের খবর? জানালার সামান্য ফাঁক দিয়ে দূরে যে স্থির জোনাকিটা দেখা যাচ্ছে সেটা কি আসলেই জোনাকি না কি অন্য কিছু?

৫।
খুব ভোরে, সূর্য ওঠার আগে ঘুম ভাঙল।
"জঙ্গলে ভোর হলো, আর নতুন প্রভাত এলো।"
ওয়াচ টাওয়ারে উঠলে দেখা যায় কুয়াশার চাদরে ঘেরা সবুজ বনভূমি জেগে উঠছে, পাখির ডাক আর হনুমানের হুপ হুপ শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে পাতায় পাতায়।

ঠিক ৬টার সময় লাসো ভাইয়ের গাইড আসলো। জঙ্গলে ঢুকলাম।

৬।

আমি আমাজান দেখিনি, রেমা কালেঙ্গা দেখেছি।

ঘন সবুজ সজীব বন। কোথাও একটা চিপসের প্যাকেট নাই, কাগজ নাই। বড়ো বড়ো গাছ, তার ফাঁকে ছোটো গাছ, তার ফাঁকে আগাছা। একটা ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা নাই।
দূরে গাছের মগডালে লম্বা লেজ ঝুলিয়ে হল্লা করছে হনুমানের দল। লাল লাল একদল বিরাট বিরাট পিঁপড়া পাতায় পাতায় সেলাই করে বাসা বানিয়েছে। পাখির ডাকে মুখর বনভূমি।

৩ ঘণ্টার ট্রেইল। এক ঘণ্টার মাথায় আকাশ অন্ধকার করে উঠল। দুলে উঠল চারপাশের বিরাট বিরাট কুন্তল গাছ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝমঝম করে নামল বৃষ্টি।

সে অভিজ্ঞতা অতুলনীয়। বড়ো একটা গাছের নিচে, বড়ো বড়ো পাতা দিয়ে বৃষ্টি ঢাকার চেষ্টা। ঘাড়ে একটা নন ওয়াটারপ্রুফ ক্যামেরা, সাথে একটা নরমাল ব্যাগ। আশেপাশে কয়েক কিলোর মধ্যে জনবসতি নাই।

বড় একটা পাতা দিয়ে ঢেকে কোনো রকমে ক্যামেরা বাঁচিয়ে আধ ঘণ্টা কাটানোর পর বৃষ্টি শেষ হলো। ট্রেইলে ব্যাক করলাম।

ট্রেইলের বাকি অংশে একটা বনমোরগ ছাড়া কিছু চোখে পড়েনি। আকাশের অবস্থা ভালো না, গাইড বারবার তাড়া দিচ্ছে। তিন ঘণ্টার ট্রেইল সাড়ে ৪ ঘণ্টায় শেষ করে তাঁবুতে ফিরলাম।

তাঁবুর কাছে পৌঁছানোর কয়েক মিনিটের মধ্যে শুরু হলো কালবৈশাখীর ঝড়। বাজ পড়ল করাত করাত করে। গাইড কোনোরকমে তাঁবু গুটিয়ে দৌড় দিল, আমি ব্যাগ ক্যামেরা নিয়ে কোনোরকমে পিছু পিছু।

মুষলধারে বৃষ্টি। ঝড়। একটা ছাতা নাই। পুরো জঙ্গলে কাঁদা, দৌড়ালে আছাড়। কাঁধে নন ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে ক্যামেরা।

সেই অন্ধকার জঙ্গলে কোনো রকমে হাঁটতে হাঁটতে কীভাবে যে গেটের কাছে গাইডের আত্মীয়ের বাসায় পৌঁছেছিলাম ঠিক মনে নাই। ওদের আতিথেয়তার কথা মনে আছে, থাকবে।

গাইড একটু পর তাঁর বাসা থেকে খাঁটি জংলা মধু আর চালের আটার রুটি এনে খাইয়েছিল। অমৃতসম ব্রেকফাস্ট।
গহীন জঙ্গলে বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে চালের আটার রুটি আর মধু।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১:
ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। প্রাণীদের ডিমের মধ্যে অক্সিজেন কোথা থেকে আসে?
(রুমানা আফরোজ)

উত্তর:
ডিমে ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকে। সেগুলো দিয়ে ভেতরে বাতাস প্রবেশ করতে পারে। যখন পাখি ডিম পাড়ে, ডিম কিছুটা ওয়ার্ম থাকে। আস্তে আস্তে ডিম ঠান্ডা হলে ডিমের ভেতরের মেমব্রেনটা একটু সংকুচিত হয়ে বাইরের মেমব্রেনের সাথে একটা থলির ন্যায় জায়গা করে নেয়। যেখানে বাতাস আটকে থাকতে পারে।
ডিমের অসংখ্য ছোটো ছোটো ছিদ্র দিয়ে এই বাতাস প্রবেশ করে এবং ভেতরে ব্রেথিং চলতে থাকে।
অক্সিজেন ইনহেল হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সহেল হয়ে ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে চলে যায়।

"How Do Baby Birds Breathe Inside Their Eggs?| Mental Floss" https://www.mentalfloss.com/article/31049/how-do-baby-birds-breathe-inside-their-eggs
(তাজ আহমেদ)

প্রশ্ন ২:
এ্যান্টিবায়োটিক অসুখ সারার পরেও খেয়ে যেতে হয় কেন?
(সাদ বিন এ.আর.ডি)

উত্তর:
অসুখ সারে না। ব্যাক্টেরিয়া পপুলেশন কমে যায়। তাই শরীরে তাদের প্রভাব আর দেখা যায় না।
তবে কমে গেলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ রয়ে যায়, সেগুলো যাতে বংশবৃদ্ধি না করতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে মেরে ফেলার জন্য কোর্স কমপ্লিট করতে হয় এন্টিবায়োটিক এর।
(মনিফ শাহ চৌধুরী)

প্রশ্ন ৩:

সিলেটের সাত রঙের চায়ে লেয়ার কীভাবে তৈরি করে?

(জিল্লুর রহমান আরিফ)

উত্তর:

ব্যাপারটা খুব ই সহজ। একটা পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের তরল রাখা হলে লেয়ার হয়ে যায়, কারণ তারা একে অপরের সাথে মিশতে পারে না।

নিচের ছবিটা দেখুন। এটা ওই চায়ের উপকরণ না। ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের তরল দিলে কিরকম হয় এটা দেখে ক্লিয়ার হবেন। বাড়িতেই এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন। খেতে যাবেন না আবার! (এগুলাতে রং অ্যাড করেছে ভালো করে বোঝার জন্য)

(নুপুর দেব)

প্রশ্ন ৪:

সূর্যে যদি ঐ মৌল ছাড়া হয় যেটা হাইড্রোজেনের সাথে মিলে কঠিন পদার্থ অথবা যে-কোনো বন্ধন তৈরি করে সেটা যথেষ্ট পরিমানে প্রয়োগ করা হয় তাহলে কী হবে? আই মিন, বন্ধনের পর সূর্য কি ইন্তেকাল করবে?

(নুর-এ নাঈম শান্ত)

উত্তর:

হ্যা, ইন্তেকাল করবে। সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন ফিউশন করে। এভাবে প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছরে সূর্যের সব হাইড্রোজেন (১.৯৮৯ × ১০^২৭ টন) শেষ হবে।

এই পরিমাণ হাইড্রোজেনকে হজম করে সোডিয়াম হাইড্রাইড বানাতে ২২.৯৮৯ × ১.৯৮৯ × ১০^২৭ টন সোডিয়াম লাগবে।

পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২ × ১০^২১ টন।

অর্থাৎ পৃথিবী যদি ১০০% সোডিয়াম দিয়ে বানানো হতো, তাহলে ৭৬৫৬৫৮৪২০০০টা সেই রকম পৃথিবী লাগতো সূর্যের ফিউশন বন্ধ করতে।

(জাভেদ ইকবাল)

প্রশ্ন ৫:

মানুষ কি একমাত্র প্রানী যে কথা বলতে পারে? বাকি বিবর্তন হওয়া প্রানীগুলো কথা বলতে পারে না কেন?

(মুহাম্মদ মুক্তাকিম হোসাঈন)

উত্তর:

সবাই-ই তো কথা বলে। মানুষের ভোকাবুলারি বেটার, এই আরকি। এই বেটার কমুনিকেশন স্কিলের কারনেই হোমো স্যাপিয়েন্স টিকে গেছে, বিলুপ্ত হয়নি।

আমি অনুরোধ করব, ১৫ মিনিট সময় নিয়ে হারারির স্যাপিয়েন্স বইয়ের ভাষা বিষয়ক এই চ্যাপ্টারটা পড়ে ফেলতে https://manusheritihas.com/2018/02/19/chapter-02bn/

(জহিরুল ইসলাম)

প্রশ্ন ৬:

Artificial intelligence কে কি Living creature বলা যায়?

(মুসা খন্দকার)

উত্তর:

না, AI জীবিত নয়, কারণ জীবনের বৈশিষ্ট্য ফুলফিল করে না। জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিবর্তনের মূল কারণ মিউটেশন হয় না AI তো তাই AI কে জীবিত বলার কারণ নেই।

https://ai.stackexchange.com/questions/2111/is-ai-living-or-non-living#:~:text=However%2C%20in%20scientific%20terms%20(and, to%20life%20but%20not%20living.

https://mindmatters.ai/2019/05/scientists-definition-of-life-excludes-ai-but-includes-embryos/

(*সায়ন খান)*

প্রশ্ন ৭:

এখনকার বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মার চেয়ে বেশি লম্বা হয় কেন?

ইনফ্যাক্ট আমার ফ্রেন্ড সার্কেল এর সবাই।

(*ইহতেসাম সামি)*

উত্তর:

আগের চাইতে পুষ্টিকর খাবার পেটে যাচ্ছে, তাই। তার পরেও অবস্থা উন্নত দেশের চাইতে বেশ খারাপ। ২য় লিংকে হাইট বাড়ার গ্রাফ দেখা যাবে (বাংলাদেশ দিয়ে সার্চ করা লাগবে)।

প্রথম লিংকে বিশ্বের সাথে আমাদের তুলনা আছে, এবং আমরা যে পুষ্টিকর খাবারের অভাবে উন্নত দেশগুলির চাইতে পিছিয়ে আছি তার উপরে একটা রিপোর্ট আছে।

https://www.imperial.ac.uk/news/207893/poor-nutrition-school-years-have-created/

https://www.ncdrisc.org/height-mean-line.html

(জাভেদ ইকবাল)

প্রশ্ন ৮:

প্রস্রাবের সময় মাঝে মাঝে শরীর কাপুনি দিয়ে ওঠে, এটা কেন হয়?

(সোহেল রানা)

উত্তর:

দুটো তত্ত্ব প্রচলিত আছে এটা নিয়ে:

১। Sensation of the drop in temperature

২। Mixed signals in the autonomic nervous system and peripheral nervous system

১। Sensation of the drop in temperature:

প্রস্রাব করলে শরীরের উষ্ণ তরল বের হয়ে শরীর কিছু তাপ হারায় যাকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে শরীরে একটু
ঝাকুনি সৃষ্টি হয় যাতে ঝাকুনির ফলে শরীর একটু উষ্ণ হয়।

২। Mixed signals in the autonomic nervous system and peripheral nervous system:

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বা
Autonomic nervous system(ANS) মূত্রত্যাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ANS এর দুইটি শাখা।

১। The Sympathetic Nervous System - প্রতিবর্তী ক্রিয়া (যেমন - চোখে পোকা ঢুকার আগে তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করা, ভয় পেলে লোম দাঁড়ানো, প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক সাড়াদান ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে।

২। The Parasympathetic Nervous system (PNS) - এটা rest, digestion সিস্টেমের জন্য দায়ী।

যখন আপনার মূত্রথলী পূর্ণ হয়ে যায় তখন মূত্রথলি থেকে spinal cord (মেরুদন্ডের মেরুরজ্জু যেখান দিয়ে স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্কে গমন করে) - সেখানে থাকা sacral nerves কে সক্রিয় করে। এর ফলে parasympathetic nervous system প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এর অ্যাকশনের ফলে মূত্রথলীর দেয়াল মূত্র বাহিরে বের করতে প্রস্তুত হতে থাকে।
আবার, সাথে সাথেই মূত্র বের হওয়ার সময় এর প্রতিক্রিয়ায় রক্তচাপ ড্রপ করে।

তারপর sympathetic nervous system কমে যাওয়া ব্লাডপ্রেশার আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে Catecholamine নামক নিউরো-ট্রান্সমিটার শরীরে প্রবাহ করে।

অর্থাৎ মূত্রত্যাগে দুই নার্ভাস সিস্টেমে সিগন্যাল তৈরি করে যার ফলশ্রুতিতে এই দুই রেসপেন্সে পাশাপাশি interaction (মিথস্ক্রিয়া) হওয়ায় নার্ভাস সিস্টেমে

confusion গোলমেলে অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় আমাদের দেহে অনৈচ্ছিক কাঁপুনি সৃষ্টি হয়।
বসে প্রস্রাব করলে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা থেকে ব্লাড প্রেশার করার চেয়ে কিছুটা কম ব্লাড প্রেশার ড্রপ করবে। ফলে মেয়েদের তেমন কাপুনি সৃষ্টি হয় না এ কারণে মনে করা হচ্ছে।

যাহোক, এটা নিয়ে আরো গবেষণা চলছে বিজ্ঞান মহলে। তাই শেষে বলা হয়েছে:

"more scientific research is needed into the subject."
https://www.google.com/amp/s/www.thesun.co.uk/fabulous/2947303/why-people-shiver-when-they-pee-urinate/amp/

https://www.healthline.com/health/pee-shivers
(আবু রায়হান)

প্রশ্ন ৯:
আমরা যারা গ্রামে থাকি অনেকেই দেখেছি যে মুরগি হাঁসের বাচ্চা নিয়ে ঘুরছে। কারণ মুরগিই তা দিয়ে হাঁসের বাচ্চা গুলাকে ফুটিয়েছে। এখন কথা হচ্ছে মুরগি কি বোঝেনা যে এটা তার নিজের ডিমের বাচ্চা না?
(অবেলার অতিথি)

উত্তর:
ডিম ফোটানোর প্রসেস অলমোস্ট সব পাখিরই সেম। কিন্তু মুরগির প্যারেন্টিং ভালো বলে সে হাঁসের ডিমকেও ফুটিয়ে ফেলে। একইরকম দেখতে হয় বলে হাসের বাচ্চাকেও নিজের বাচ্চাই ধরে নেয়।

আর গৃহপালিত হাঁসের প্যারেন্টিং ভালো হয় না কারণ গৃহপালিত হওয়ার পর এদের দৈহিক পরিবর্তন আসে। (তবুও তারা বাচ্চা করতে পারে।) কিন্তু মুরগির ভালো প্যারেন্টিং এর ফলে সর্বোচ্চ লাভবান হওয়া যায়।
তাই ইকোনোমিক্যালি সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যায়।
(*সাজির আহমেদ*)

প্রশ্ন ৬০ :

মানুষের মস্তিষ্কে যদি ডলফিন বা তিমির নিউরন প্রবেশ করানো হয়, তাহলে কি সে আরও বুদ্ধিমান মানুষে পরিণত হবে? না কি অন্য কিছু ঘটবে?

(নুপুর দেব)

উত্তর:

১। বুদ্ধি নিউরনে থাকে না, থাকে নিউরনগুলো মিলিয়ে ব্রেইনে,

২। তিমি, ডলফিন এদের নিউরন মানুষের চেয়ে আলাদা নয়,

৩। এদের ব্রেইন মানুষের চেয়ে কম বুদ্ধিমান,

৪। সব নিউরন ফেলে দিয়ে তিমির ব্রেইন লাগালে তুমিও তিমি হয়ে যাবা।

(নাঈম হোসেন ফারুকী)

তথ্যসূত্র

বাঘকথন

Royal Bengal Tiger-Wikipedia
Royal Bengal Tiger-Big cats India
Royal Bengal Tiger-The naional animal of Bangladesh-Steemit
রয়েল বেঙ্গল টাইগার-Roar

মেছোবাঘ/মেছোবিড়াল

"Fishing cat - Wikipedia"
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fishing_cat#:~:text=The%20fishing%20cat%20
https://wildcatconservation.org/wild-cats/asia/f
The Fishing Cat: a feline fisher hunting by the night in wetlands"
https://india.mongabay.com/2018/11/the-fishing-cat-a-feline-fisher-hunting-by-the-night-in-wetlands/

রাজ শকুন

ছবি- https://www.cms.int/en/species/sarcogyps-calvus

চালতা

https://en.wikipedia.org/wiki/Dillenia_indica

লজ্জাবতী বানর

1. "Bengal slow loris - Wikipedia" https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bengal_slow_loris
2. "The plight and future of Bengal slow loris in Bangladesh | The Business Standard" https://tbsnews.net/environment/nature/plight-and-future-bengal-slow-loris-bangladesh-147856?amp
3. "Bengal Slow Loris – Endangered Primate Rescue Center" https://www.eprc.asia/bengal-slow-loris/

ছবি- https://www.eprc.asia/bengal-slow-loris/

কুকসিমা

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanthillium_cinereum

2. https://bn.wikipedia.org/wiki/কুকসিমা

পাদুরি লতা (গন্ধভাদালি লতা)

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Paederia_foetida

2. https://inaturalist.ca/taxa/126581-Paederia-foetida/browse_photos

3.https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF_%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE

4. https://www.jugantor.com/todays-paper/features/nature-life/220331/%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A7%81-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87

5. https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/1703279542

6. https://www.newsone24.com/https://www.newsone24.com/গন্ধভাদালি-লতার-উপকারিতা/6297/6297

নাম তার ফুলঝুরি

বাংলাদেশের পাখি- শরীফ খান

1.https://www.womennews24.com/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BF-%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%C2%A0/7394

2. https://bangla.bdnews24.com/kidz/article754031.bdnews

দাঁতরাঙা

Wikipedia

রোদ্দুরে

ফুলগুলি যেন কথা বলে, দ্বিজেন শর্মা, বাংলা একাডেমি।

বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

উদ্ভিদকোষ, শেখ সাদী, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

সিলভার ফিশ

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Silverfish
2.https://www.researchgate.net/publication/317091110_Silverfish_If_they_are_not_fish_and_they_are_not_really_silver_what_are_they

শালুক কথন

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nymphaea_nouchali
2.https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE
3.http://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_details/%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8%E0%A7%AC/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%98/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BF%20%E0%A6%93%20%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE
4.https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%95

পিঁপড়া না কি মাকড়সা?

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Myrmaplata_plataleoides
Mimicry -https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mimicry
Video-https://youtu.be/368W5cR3RSg

গন্ধগোকুল

1.https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2
2. https://m.banglanews24.com/climate-nature/news/bd/665169.deteils
3.https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80_%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2
স্থানীয় মানুষ ও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ

আলকুশি/বিলাই খামচি

https://en.wikipedia.org/wiki/Mucuna_pruriens

লাল কদম

https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2017/09/18/543998

প্রজাপতি

1. https://www.thoughtco.com/fascinating-facts-about-caterpillars-1968169
2. https://www.britannica.com/animal/butterfly-insect
3. https://ansp.org/exhibits/online-exhibits/butterflies/lifecycle/
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly
5. https://www.joyfulbutterfly.com/life-cycle-of-a-butterfly/
6. Most important: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0001736
7. From YouTube: "What's inside a caterpillar's 'cocoon' "

দীপ্ত লুচি পাতা

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peperomia_pellucida
2. https://www.drugs.com/npp/peperomia-pellucida.html
3. http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Peperomia+pellucida
4.https://grathor.com/%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%AB%E0%A7%87/

গুইসাপ

১. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Monitor_lizard
২. www.banglainsider.com/bangladesh/16166

সুপারফুড সজনে

1. https://tinyurl.com/vrmgt89
2. https://tinyurl.com/y2leguef
3. https://tinyurl.com/y3ygwso8
4. https://tinyurl.com/yytmh9jf

ভারতীয় ধূসর নকুল

1.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/group/mongooses/&ved=2ahUKEwjt5PqH8vvrAhWalbcAHaT2D5EQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3CYjCtD1a9to7V4uuGt_wG

2.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.livescience.com/amp/52565-mongoose.html&ved=2ahUKEwi_seWI4PrrAhXlQ3wKHc2cAvUQFjANegQIAxAB&usg=AOvVaw3U5e-QbbqfSA6DoUwSK3be&cf=1&cshid=1600709129811

3.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indian_grey_mongoose&ved=2ahUKEwji-7_p3_rrAhURheYKHYHDDZwQFjALegQIBBAB&usg=AOvVaw3FrYScHhNVhvoOTIVOvZ7C&cshid=1600709237067

4.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://everywherewild.com/mongoose-facts/&ved=2ahUKEwjzuYL7qvfrAhUhyosBHfsoB-wQFjAaegQIFxAi&usg=AOvVaw2bLJLxnhFVaebpqutcCzFc

বেগুনি ধান

1.https://bn.observerbd.com/details.php?id=26868

2.https://agricare24.com/

3.www.kalerkantho.com/online/country-news/2019/04/08/756417

ভাটফুল

1. www.dailyjanakantha.com/details/article/113456/

2. www.floraofbangladesh.com/2016/04/bhat-ghetu-clerodendrum-viscosum.html?m=1

3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Clerodendrum_infortunatum

শুষনি শাক

1.www.roddure.com/bio/plant/grass/uses-of-marsilea-minuta/

2.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marsilea_minuta

3.www.newsbangladesh.com/news/81740/

বহুরঙা উড়ন্ত কাঠবিড়ালী

১.https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%99%E0%A6%BE_%E0%A6%89%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A7%8D

%E0%A6%A4_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A1%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF

২.https://www.researchgate.net/publication/333669918_POPULATION_STATUS_OF_PARTICOLORED_FLYING_SQUIRREL_HYLOPETES_ALBONIGER_IN_FOUR_FOREST_PATCHES_OF_NORTHEAST_BANGLADESH

৩.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flying_squirrel

বেঙ্গল ফ্লোরিকেন

উইকিপিডিয়া,

হরেক রকম পাখি সিরিজ :২ (আলী ইমাম)

নীলগাই

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%87

বিলিম্বি

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF

শুশুক

https://en.m.wikipedia.org/wiki/South_Asian_river_dolphin

https://www.worldwildlife.org/species/ganges-river-dolphin

https://animaldiversity.org/accounts/Platanista_gangetica/

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Passiflora_foetida?wprov=sfla1

2.https://en.wikipedia.org/wiki/Passiflora_edulis?wprov=sfla1

3.https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2

গন্ডার: এক দুঃখবহ স্মৃতি

১. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros

২. https://www.prothomalo.com/amp/story/opinion/column/%E2%80%98%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE%E2%80%99-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2
৩. https://m.daily-bangladesh.com/colorful-life/207463
৪. https://www.banglanews24.com/cat/news/bd/447578.details

ডুমুর ফুলে পরাগায়ন

Fig wasp | insect | Britannica
BBC - Earth - A tale of loyalty and betrayal, starring figs and wasps
Study: Trees retaliate when fig wasps don't service them | Cornell Chronicle

চশমা পরা বানর

https://animaldiversity.org/accounts/Trachypithecus_phayrei/#132cdbb0b7a8ff4aab8c8a4ad88df01f
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Phayre%27s_leaf_monkey

কুমির

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Crocodile
http://www.fri.gov.bd/site/page/0de4ceb4-ab76-4d4b-9a9f-43041dabf3a5/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Saltwater_crocodile
https://en.m.wikipedia.org/wiki/American_crocodile

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nile_crocodile

ভোঁদড়

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Otter
https://api.nationalgeographic.com/distribution/public/amp/animals/mammals/group/otters
https://www.britannica.com/animal/otter

ভোঁদড়ের মাছ শিকার:

https://roadsandkingdoms.com/2015/the-fishing-otters-of-bangladesh/
https://www.bd-pratidin.com/features/2014/03/22/49970

ভোঁদড়ের ছবি আঁকা:

https://www.thenationalnews.com/arts-culture/dubai-s-amazing-painting-arty-otters-1.646520
https://www.thedubaiaquarium.com/experiences/animal-encounters/otter-encounter/

বিশেষজ্ঞদের মতামত:

https://wildlife.ca.gov/Science-Institute/Featured-Scientist/Tag/sea-otter
https://www.bbc.com/news/amp/science-environment-39339424
https://www.pri.org/stories/2012-09-20/scientist-discover-critical-role-sea-otter-play-climate-change
https://www.dw.com/bn/%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A7%9C/a-17516911

বনরুই

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pangolin

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%87

https://youtu.be/gz4HXyxcess

https://www.jugantor.com/todays-paper/features/nature-life/236551/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF

বিন্টুরং

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Binturong

https://www.wired.com/2013/10/the-creature-feature-10-fun-facts-about-the-binturong-or-how-can-it-binturong-when-it-feels-so-right/

https://animals.sandiegozoo.org/animals/binturong

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%82

●ছবিঃ ইন্টারনেট

অল এবাউট ডেথ

মৃত্যু নিয়ে এ কী বলল উইকিপিডিয়া! দেখুন ভিডিও ছাড়া!- https://en.wikipedia.org/wiki/Death

Near Death experience proof. বিশাল আর্টিকেল।

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6172100/

সাইকোলজিক্যাল আর ফিজিওলজিক্যাল দুটো ব্যাখাই পাবেন Near death experience এর- https://en.wikipedia.org/wiki/Near-death_experience#Explanatory_models

লাশের পচন- https://www.aftermath.com/content/human-decomposition/

আরেকটু পচন- https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2015/may/05/life-after-death

মৃত্যুর সময় নির্ধারণ। এটা সায়েন্স আর্টিকেলের লিংক। বেশ ভাল- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK54986

মৃতদেহ নিয়ে কী করবেন? এই চ্যানেলটা ভালোই, ভিডিও লিংক এটা- https://www.youtube.com/watch?v=rXQWU17FAvE

মৃত্যু থেকে ফিরে আসা- https://www.medicalnewstoday.com/articles/317645

মৃত্যু নিয়ে একলাইনের চমৎকার কিছু তথ্য- https://www.msn.com/en-in/health/medical/the-most-interesting-facts-about-death/ss-AAuqBQv#image=4

জোনাকি

1.https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%80

2.https://www.prothomalo.com/amp/story/life/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF

3. https://m.bdnews24.com/amp/bn/detail/science/1720588

4. https://www.kalerkantho.com/print-edition/education/2019/08/05/800257

গুজব খন্ডন

https://academic.oup.com/jcem/article/85/10/3653/2852706?login=true

(গ্রোথ হরমোনের ওপর স্টাডি)

https://www.facebook.com/groups/bcb.science/permalink/3659943240755985/

(হাইট কতদিন বাড়ে, কি করলে কোন লাভ হয় না, সেটার ওপর নাঈমের লেখা)

https://www.stylecraze.com/articles/homeopathic-medicines-help-increase-height/

লাইফ অফ প্রোটন

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Proton_decay

http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/sk/pdecay-e.html

http://www.johnagowan.org/proton.html

https://physics.stackexchange.com/questions/93938/the-life-of-proton

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Particles/proton.html

https://www.symmetrymagazine.org/article/do-protons-decay

https://www.quantamagazine.org/no-proton-decay-means-grand-unification-must-wait-20161215/

ব্যাঙের ছাতার রসায়ন

https://www.scienceinschool.org/content/natural-experiments-chemistry-mushrooms

DOI: 10.1016/B978-0-444-63601-0.00009-0

https://www.scienceinschool.org/content/natural-experiments-chemistry-mushrooms

https://www.chemistrylearner.com/biuret-test.html

DOI: 10.1016/B978-0-444-63601-0.00009-0

ছাগলের জাত ব্ল্যাক বেঙ্গল

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Bengal_goat?wprov=sfla1

https://www-thedailystar-net.cdn.ampproject.org/v/s/www.thedailystar.net/city/news/black-bengal-goats-genome-decoded-1790050?amp_js_v=a6&_gsa=1&&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16154622070663&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.thedailystar.net%2Fcity%2Fnews%2Fblack-bengal-goats-genome-decoded-1790050

http://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_details/%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8%E0%A7%A9/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2%20%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B2%20%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A8

https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE

তালিপাম

১.https://www.kalerkantho.com/print-edition/oboshore/2019/10/19/828272

২.https://m.bdnews24.com/amp/bn/detail/environment/1691951

৩.https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%B6%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%AC%E0%A7%87-

%E2%80%98%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2%E2%80%99
৪.https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AE
৫.https://www.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/environment/%E0%A6%B6%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2%E2%80%99

কাঁঠাল

১.
http://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_details/%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8%E0%A7%AB/%E0%A6%86%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9D/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%20%E0%A6%93%20%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BE
২. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jackfruit

ইলিশ মাছ

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6

পিঁপড়ার রাজ্য

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%81%E0%A6%AA%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE?wprov=sfla1
http://poygam.com/2016/10/09/%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%81%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF-

%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%BE-%E0%A7%A7/
বাংলার কীটপতঙ্গ -গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

নিম

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE#:~:text=%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%20

http://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_details/%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8%E0%A7%A8/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%98/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%20%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%80%20%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%20%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B6%20%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%9C%20%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
https://neempedia.com/neem-tree-of-the-21-century/#:~:text=Neem%20has%20been%20declared%20the,Nations%2C%20and%20not%20without%20reason.&text=The%20neem%20tree%20

Devil's Finger

https://ultimate-mushroom.com/edible/9-clathrus-archeri.html
https://www.first-nature.com/fungi/clathrus-archeri.php
https://www.inverse.com/article/45894-clathrus-archeri-fungus-devil-s-fingers/amp
https://www.kew.org/read-and-watch/top-13-spookiest-plants-and-fungi

ড্রাগনের নতুন প্রজাতির সন্ধান:

http://www.sci-news.com/news/biology

কিউট Puff Ball:

https://grocycle.com/puffball-mushrooms-guide/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lycoperdon_perlatum
https://www.mssf.org/cookbook/puffballs.html

একটি পর্দাশীল, লাজুক মাশরুমের গল্পো

https://www.quora.com/What-is-the-net-thing-that-comes-out-of-some-types-of-mushrooms-after-blooming

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Phallus_indusiatus

ঢাকাই ব্যাং

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://archive1.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/2016/03/05/106084.html&ved=2ahUKEwie4c6f04DwAhXVfn0KHRZ_CmEQFjAWegQIFhAC&usg=AOvVaw0pw5RDsoOmgRlKkEzqWZ41

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%25E0%25A6%25A2%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2595%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2587%25E0%25A6%25AF%25E0%25A6%25BC%25E0%25A6%25BE_%25E0%25A6%25AC%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25AF%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2599&ved=2ahUKEwie4c6f04DwAhXVfn0KHRZ_CmEQFjAOegQIIRAC&usg=AOvVaw0MDdC5mskTVgXxrTBow2w4

শাপলা-শালুক-পদ্ম

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nymphaea_pubescens&

http://www.floraofbangladesh.com/2017/09/shapla-water-lily-nymphaea-nouchalli.html?m=1&

http://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_details/%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8%E0%A7%AC/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%98/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BF%20%E0%A6%93%20%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE&

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nelumbo_nucifera&

https://www.illinoiswildflowers.info/wetland/plants/sacred_lotus.htm&

http://www.floraofbangladesh.com/2016/05/poddo-sacred-lotus-nelumbo-nucifera.html?m=1&

ব্যাঙের ছাতা

উইকিপিডিয়া, ব্রিটানিকা

জাতীয় পাখি দোয়েল

https://en.wikipedia.org/wiki/Oriental_magpie-robin?wprov=sfla1
https://www.biodiversitylibrary.org/page/48182822#page/265/mode/1up
https://www.iucnredlist.org/species/103893432/111178145
https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A7%A9-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-216381
https://www.pettract.com/2020/11/oriental-magpie-robin-details.html?m=1
https://www.bd-pratidin.com/last-page/2015/12/22/116485

শুধু খাওয়াই যার কাজ!

https://www.thoughtco.com/fascinating-facts-about
https://www.kqed.org/.../why-is-the-very-hungry

ঝিঁঝিঁ

Wikipedia

আমন্ত্রণে আত্মরক্ষা আর এক নির্মম মৃত্যু- শিম গাছের অভিনব ডিফেন্স মেকানিজম

Absurd Creature of the Week: The Wasp That Lays Eggs Inside Caterpillars and Turns Them Into Slaves | WIRED
PLANTS CALL WASPS TO THE RESCUE WITH AN AROMA THE INSECTS LOVE - The Washington Post

লাইরিডস উল্কাবৃষ্টি

১. Gary W. Kronk, Meteor Showers, Springer International Publishing (2014)
২. Jonathan Powell, Cosmic Debris, Springer International Publishing (2017)
৩. শাহনাজ পান্না, পুরাণ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান, বাতিঘর প্রকাশনী (২০২০)

ভেসে আসা নীল পথিক

https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2021/04/11/1022693
https://www.dawn.com/news/1581325
https://www.google.com/amp/s/m.bdnews24.com/amp/samagrabangladesh/detail/home/1878547
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bryde%27s_whale
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2882820971960727&id=2207727172803447

IUCN Red List

https://en.m.wikipedia.org/wiki/IUCN_Red_List
https://www.britannica.com/topic/IUCN-Red-List-of-Threatened-Species
https://www.iucn.org/resources/conservation-tools/iucn-red-list-threatened-species#RL_users
https://www.iucnredlist.org/resources/classification-schemes
https://www.iucnredlist.org/about/faqs
https://iucngreenlist.org/about/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_mammals_of_Bangladesh
https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A7%A9%E0%A7%A7-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%80

বিকেল বেলার গল্প

★https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophytum_comosum?wprov=sfla1
★https://m.fnp.com/article/spider-plant-benefits-that-will-make-your-jaw-drop
★https://homeguides.sfgate.com/cats-aloe-plants-49084.html

মায়াবন বিহারিনী হরিণী

গাছের কথা ফুলের কথা -দ্বিজেন শর্মা
বাংলার বনফুল ১ম ও ২য় স্তবক -নওয়াজেশ আহমেদ
উইকিপিডিয়া
ফ্লোরা অফ বাংলাদেশ

ছবি কৃতজ্ঞতা:

১-গার্ডেনিয়া

২-পিন্টারেস্ট

৩-ফ্লাওয়ারস অফ ইন্ডিয়া

৪-৭ ফ্লোরা অফ বাংলাদেশ

রাক্ষস খোক্ষস এবং ভোক্ষস

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Drosera
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Drosera_spatulata
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pitcher_plant
https://www.britannica.com/plant/pitcher-plant
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Venus_flytrap
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Utricularia

পাতা ব্যাং/ লাল-চোখ ব্যাং

Nature Study Society of Bangladesh http://www.naturestudysociety.org/amphibians-of-bd
https://en.wikipedia.org/wiki/Leptobrachium_smithi
https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Megophryidae/Leptobrachiinae/Leptobrachium/Leptobrachium-smithi
https://www.indianamphibians.org/#!/tx/64-Leptobrachium
https://www.gbif.org/species/2424675

ট্রি ফার্ণের নতুন প্রজাতি?

http://www.theplantlist.org/browse/P/Cyatheaceae/Cyathea/
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tree+fern+Bangladesh&btnG=
http://en.banglapedia.org/index.php/Fern
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tree_fern
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fern#:~:text=Ferns%20are%20vascular%20plants%20differing,they%20lack%20flowers%20and%20seeds.
ছবির রেফারেন্স:
Cyathea gigantea
http://v3.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=648491
http://www.nbrienvis.nic.in/WriteReadData/CMS/Cyathea%20gigantea.pdf
Angiopteris_evecta

http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:17021890-1

https://www.wikiwand.com/en/Angiopteris_evecta